Chaya Darshan by Sunil Gangopadhyay

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছায়া দর্শন

...হি-লা নগর থেকে ঢালু পথে হিউয়েন সাঙ নেমে এলেন অনেকখানি। একটি উদ্যানের পাশে তাঁকে থামতে হল। এখান থেকে দুটি পথ গেছে দু'দিকে। অপেক্ষাকৃত সরুপথটি নেমে গেছে আরও নিচের উপত্যকার দিকে। অন্য পথটি উঠেছে সম্মুখবর্তী পর্বতে। অনেক উঁচু দিয়ে গিরিপথ পার হতে হবে। লেগে যাবে কয়েকটি দিন।

এই উদ্যানে কিছু মানুষ সমবেত হয়েছে বিখ্যাত এই শ্রমণকে বিদায় জানাতে। যথারীতি এখানেও কয়েকজন তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে লাগল আরও কিছুদিন এখানে অবস্থান করার জন্য। হিউয়েন সাঙ বিনীতভাবে তাদের জানালেন যে ফেরার পথে তিনি এমন সুরম্য একটি স্থানে অবশ্যই বিশ্রাম নেবেন। এখন তাঁকে যেতে হবে। যেতে হবে তাঁর আরাধ্য দেবতার সন্ধানে...

কিংবদন্তি পর্যটকের জীবন অবলম্বনে এক মর্মস্পর্শী কাহিনি ছায়া দর্শন।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

সূচি

ছায়া দর্শন

উঁচু পাহাড়ের শিখরের কাছে অনেকখানি অংশ প্রায় সমতল। সেখানেই গড়ে উঠেছে একটি ক্ষুদ্র নগর, নাম হি-লা। এ নগরটি বড়ই মনোহর, বড় বড় সব বৃক্ষরাজি ফুল-ফলে সজ্জিত। তির তির করে বয়ে চলেছে একাধিক গিরি-ঝরনা। এখানকার অধিবাসীদের বাড়িগুলি ছোট ছোট, সবই গাছ-পালার আড়ালে ঢাকা। একটু উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়ালে দেখা যায় আদিগন্ত ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতন পর্বতের সারি।

অভিযাত্রী জুয়ান জ্যাঙ এই হি-লা'তে কাটাবেন তিন দিন। তাঁর পরিশ্রান্ত শরীর একেবারে জুড়িয়ে গেল। আরও কয়েকদিন বিশ্রাম নিতেও শরীর চায়। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই চিনযাত্রী বৌদ্ধ, তারাও জুয়ান জ্যাঙকে এখানেই অন্তত বর্ষাকালটা থেকে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে বারবার।

কিন্তু অভিযাত্রীকে তো থাকলে চলে না। তাঁকে পৌঁছতেই হবে গন্তব্যে। অলক্ষে ঘনায়মান মেঘের দিকে তাঁর দৃষ্টি চলে যায় বারবার। এ অঞ্চলের বর্ষা অতি সাঙ্ঘাতিক, একবার বর্ষণ শুরু হলে অবিরাম হতেই থাকে দিনের পর দিন, প্রবল ধারে। এই বর্ষা শুরু হবার আগেই সামনের দুর্গম গিরিসঙ্কট পার হয়ে যেতে হবে তাঁকে। সে পথ অতিক্রম করতেই অন্তত সাত দিন লেগে যাবে।

সকালবেলা যাত্রা শুরু হল, পাহাড়ি ঢালু পথ দিয়ে সদলবলে নামতে

লাগলেন শ্রমণ জুয়াং জ্যাঙ। আপাতত তিনি নিজস্ব ঘোড়ার পাশাপাশি হেঁটেই চলেছেন।

পথের ধারে ধারে স্থানীয় কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে সাতজনের একটি দল, ঘোড়া ও খচ্চরের পিঠে প্রচুর রেশমের বস্ত্র, খাদ্যসম্ভার ও পানীয় জল ভর্তি পাত্র, আসার পথে কয়েকটি রাজ্যের রাজারা তাঁকে দিয়েছেন নানান উপহার। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ধর্মশাস্ত্র জ্ঞানের খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে দিকে দিকে। অনেক প্রবুদ্ধ, জ্ঞানী ব্যক্তিও তাঁকে আচার্যের সম্মান দিয়ে মেনে নিয়েছেন।

শ্রমণ জুয়ান জ্যাঙের কিন্তু বয়েস বেশি নয়, তিরিশের কাছাকাছি হবে। বেশ সবল, মজবুত শরীর। প্রায় তিন বছর আগে চিনের চ্যাঙান অঞ্চল থেকে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন একা। শুধু একা নয়, পলাতক।

কৈশোর বয়স থেকেই তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন কনফুসিয়াসের অনুগামী। কিন্তু জুয়ান অল্প বয়স থেকেই ঝুঁকে পড়েন বৌদ্ধ ধর্মের দিকে, শাস্ত্রপাঠের সময় তাঁর স্মৃতিশক্তি দেখে সকলেই চমৎকৃত হতেন। কুড়ি-বাইশ বছর বয়েসের মধ্যেই তাঁর অধ্যয়নের উপযোগী গ্রন্থ বিশেষ বাকি ছিল না।

এই সময়ই তাঁর উপলব্ধি হয় যে, যে-সব বৌদ্ধশাস্ত্র বিভিন্ন সময় চিনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অনেক গরমিল ও ভুল আছে। ভুল শিক্ষাদান হচ্ছে অনেক মঠে। প্রকৃত জ্ঞান আহরণের জন্য এই ধর্মের যে জন্মস্থান, সেখানে একবার যেতে পারলে ভালো হয়। বিভিন্ন প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে তিনি শুনলেন যে ভারতের নালন্দা নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদান হয়, যদিও তাঁরা কেউ নালন্দা স্বচক্ষে দেখেননি।

তখনই জুয়ান ঠিক করেন, তাঁকে একবার নালন্দা যেতেই হবে। এই সংকল্প প্রকাশ করা মাত্র তাঁর অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন ঘোর আপত্তি জানাতে লাগলেন। নালন্দা—এই নামটি কল্পনা করতেই ভালো লাগে, কারণ সে যে প্রায় স্বর্গের মতোই দূরে। সুদীর্ঘ, বিপদসঙ্কুল পথ, অনেকের সেই যাত্রাপথেই মৃত্যু হয়। পার হতে হবে ভয়ংকর তাকলামাকান মরুভূমি, আবার পাহাড়ের পর পাহাড়, হিমবাহ, দিনের পর দিন জনুষ্যের দেখা পাওয়া যাবে না।

এসব যতই শোনেন, ততই তাঁর ভ্রমণ-বাসনা দৃঢ় হয়। তাঁকে যেতেই হবে। দিনের পর দিন অতৃপ্ত জ্ঞান-তৃষ্ণা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে দুর্গম পথে

মৃত্যুর ঝুঁকি নেওয়াও কাম্য।

নিজেকে তিনি প্রস্তুত করতে লাগলেন। নিজে নিজে শিক্ষা করলেন সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষা না জানলে ব্রাহ্মণ্য দেশে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না। ভাষা শিক্ষার একটা সহজাত প্রতিভা আছে তাঁর, এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার কী ভাবে তফাত হয়, তা বুঝে নিতে পারেন বলে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের পৃথক ভাষা অল্প দিনেই আয়ত্ত করে নিতে তাঁর অসুবিধে হয় না।

সঙ্গী-সাথী তো পাওয়াই যাবে না, তার চেয়েও বড় বাধা সম্রাটের ঘোষণা। সম্প্রতি রাজবংশের বদলি হয়েছে, নতুন সম্রাট আদেশ দিয়েছেন যে, কোনো নাগরিক এখন দেশের বাইরে যেতে পারবে না। বিশেষত পশ্চিম দেশে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।

জুয়ান জ্যাঙ বিশেষ অনুমতির জন্য দু-দু'বার আবেদন জানালেন সরকারি দফতরে। দু'বারই তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হল। তখন তিনি অবৈধভাবেই গোপনে যাত্রা শুরু করেন একদিন।

পথ তো একটাই। সেই পথে কিছু দূর অন্তর অন্তর রয়েছে সরকারের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি। সশস্ত্র পাহারাদাররা সেখানে সব সময় নজর রাখেন। জুয়ান জ্যাঙ দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকেন, হাঁটতে শুরু করেন রাত্রির অন্ধকারে। প্রহরীরা ছাড়াও হিংস্র জীব-জন্তুর ভয়ও আছে, সেসব এড়িয়ে গেলেও পানীয় জলের অভাবে থামতেই হয়। আর জলের ব্যবস্থা আছে শুধু প্রহরীদের ঘাঁটিতে।

গভীর রাত্রিতে সামান্য তস্করের মতো এই অভিযাত্রীটি এক-একটি ঘাঁটি থেকে তাঁর পাত্রে জল ভরে নেন তিন-চারদিন চলার মতো। একটা ঘাঁটিতে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে তির উড়ে এল তাঁর দিকে। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন জুয়ান জ্যাঙ।

তাঁকে ধরে নিয়ে আসা হল সেই ঘাঁটির অধিনায়কের কাছে। তিনি একটুক্ষণ জেরা করলেন এই বন্দিকে, তারপরই তাঁকে প্রণতি জানালেন।

এই অধিনায়ক কিছুদিন আগেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন এবং তিনি জুয়ান জ্যাঙের শাস্ত্রজ্ঞানের খ্যাতির কথা জানেন। তিনি অকুতোভয় মানুষটির দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা শুনে তাঁর ওপর সরকারি নিয়মের বাধা আরোপ করলেন না। বরং তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন সম্মুখের যাত্রাপথে কোথায় কোথায় বাধা

পাবেন, কোন কোন ঘাঁটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে হবে, আর কোন কোন ঘাঁটির সর্দারের কাছ থেকে তিনি সাহায্য পাবেন। সেরকম কয়েক জনের নামে চিঠি লিখে দিলেন তিনি এবং সঙ্গে দিলেন কয়েকটি পানীয় জল ভর্তি-পাত্র, কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং এক জন পথ প্রদর্শক।

জুয়ান জ্যাঙ একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি বহু পরিশ্রম ও কয়েকবার ব্যর্থতার পর সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করেছেন। ঘুম ভাঙার পর তাঁর মনে হয়েছিল, সেই সুমেরু পর্বতই নালন্দা। সেখানে পৌঁছবার জন্য সব বাধাই তাঁকে জয় করতে হবে।

চিন সাম্রাজ্যের সীমান্তের কাছে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য। সেই রকম কোনো কোনো রাজারা তাঁকে খাতির-যত্ন ও সাহায্য করেছেন, কেউ কেউ অবশ্য তেমন আগ্রহ দেখাননি, তবে বিশেষ বাধারও সৃষ্টি করেননি।

সবচেয়ে বড় বাধা এসেছিল তুরফান রাজ্য থেকে। জুয়ান জ্যাঙের অভিযান প্রায় বাতিল হয়ে যাবার উপক্রম। সে-দেশের রাজা ও রানি দারুণ অত্যাচার করেছিলেন তাঁর ওপর, স্নেহের অত্যাচার, চোখের জলের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

তরুণ সন্ন্যাসীর স্থান হল রাজপ্রসাদে, সেবার জন্য নিযুক্ত হল কয়েকজন খোজা। রাজা-রানি পরম ধার্মিক, জাতে চিনা এবং মহাযানী। রাজ্যে কিছু হীনযানীও রয়েছে, এই দুই পন্থীদের মধ্যে প্রায়ই রেষারেষি ও সংঘর্ষ হয়।

রাজা কুঁ্য ওয়েন এক বিশাল ধর্মসভার আয়োজন করলেন। সেখানে এই নবাগত শ্রমণ বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করবেন। প্রচুর জনসমাগম হল, সকলে তো বটেই, এমনকী রাজার সভাপণ্ডিতরা পর্যন্ত মুগ্ধ।

এইভাবে চলল কয়েক দিন। এত শ্রদ্ধা ও যত্ন জুয়ান জ্যাঙ আর কোথাও পাননি। রাজা ও রানি যেমন বিনীত, বেশির ভাগ মানুষই সে রকম ভক্তিনম্র।

দিন সাতেক বাদে জুয়ান জ্যাঙ বললেন, রাজা, আমাকে এবার বিদায় দিন। আমাকে এবার এগিয়ে যেতে হবে।

রাজা অবাক হয়ে বললেন, এখনই কী! আরও কিছুদিন থাকুন।

কেটে গেল আরও দু'দিন। জুয়ান জ্যাঙ আবার সেই প্রস্তাব তুলতেই রাজা প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, না, না এখনি আপনার যাওয়া হবে না। কেন, আপনার এখানে কোনো অসুবিধে হচ্ছে?

জুয়ান বললেন, অসুবিধের তো প্রশ্নই নেই, বরং এত আরামে কখনো থাকিনি। কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে।

রাজা বললেন, কেন আর অত কষ্ট করে যাবেন? আপনি এই রাজ্যেই থেকে যান। আপনি হবেন এখানকার আচার্য। আপনার জন্যই আমার রাজ্য গৌরবান্বিত হবে।

ক্রমে দেশবাসীরা এবং সভার-পণ্ডিতরাও একই অনুরোধ করতে লাগলেন বারবার।

একদিন জুয়ান বিনীত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললেন, রাজা, আমি একটা সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছি। আমাকে যে যেতেই হবে। ভাবছি, আগামিকালই।

রাজাও দৃঢ়ভাবে বললেন, আপনাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। আমার কথা শুনুন। যদি পামির পর্বতমালাও উল্টে যায়, তবু আমার কথার ব্যত্যয় হবে না। আপনি কী করে যান, অমি দেখব।

জুয়ান পড়লেন মহা বিপদে। এত উপকারী রাজা, জোর-জবরদস্তি করে যাওয়া যায় না, চুপি চুপি পালিয়ে যেতেও বিবেকে সায় দেয় না। কিন্তু এ রকম একটি রাজ্যে সুখভোগ করার জন্য তো তিনি এই দুস্তর পথ পেরিয়ে আসেননি, তাঁর স্বপ্ন পূরণ না করে থেমে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই।

এই উভয় সঙ্কটে তরুণ শ্রমণের দু'চক্ষু দিয়ে নেমে এল জলের ধারা। রাজা-রানিও কাঁদতে শুরু করলেন।

এরপর জুয়ান জ্যাঙ প্রায়োপবেশনে স্থির হয়ে রইলেন। খাদ্য-পানীয় কিছুই গ্রহণ করেন না, নিদ্রাও ত্যাগ করলেন। দিনের পর দিন। রাজা স্বয়ং তাঁর মুখের সামনে ভোজ্যদ্রব্য সমেত পাত্র এনে ধরেন, তবু জুয়ান কিছুতেই মুখ খোলেন না। ক্রমশ তাঁর শরীর শীর্ণ হয়ে এল, শ্বাসপ্রশ্বাস হয়ে এল মৃদু।

আচার্যের জীবন সঙ্কট হতে পারে মনে করে ব্যাকুল হয়ে গেলেন রানি। শেষপর্যন্ত রাজা এসে হাত জোড় করে বললেন, ঠিক আছে, আপনার কথাই ঠিক থাকবে। আমি সকলের সামনে শপথ করছি, আপনাকে আর বাধা দেব না। তবে আপনাকেও কথা দিতে হবে, আপনার স্বপ্ন সার্থক করার পর যখন এই পথেই ফিরবেন, তখন আপনি এ রাজ্যে থাকবেন অন্তত তিন বছর।

প্রচুর উপঢৌকন আর অন্য রাজাদের প্রতি সুপারিশ পত্র লিখে দিলেন তিনি। কয়েকদিন পরই এক বিশাল সমাবেশে সংবর্ধনা জানাবার পর বিদায় জানানো হল তাঁকে। সঙ্গে দেওয়া হল কয়েকজন ভারবাহী অনুচর।

এরপর পথে আরও অনেক রকম বাধা বিঘ্ন এসেছে কিন্তু ভালোবাসার অত্যাচার আর সহ্য করতে হয়নি।

ক্রমে ক্রমে নানা রাজ্য পেরিয়ে এগিয়ে চলল এই অভিযাত্রীদল। আবার তাকলামাকান মরুভূমির এক পাশ দিয়ে গিয়ে কিছু পথে অতিক্রম করতে হল তিয়েনশান পর্বতমালা। সেখানে অনন্ত তুষারপ্রদেশ। তারপর তাসখন্দ, আরও কয়েকদিনের পথের শেষে বামিয়ান রাজ্য। এই রাজ্যে রয়েছে অনেকগুলি বিহার, স্তূপ এবং দুই বিশাল বুদ্ধমূর্তি। বামিয়ানের মতো এত বড় বুদ্ধমূর্তি আর কোথাও দেখা যায়নি। এখানকার মানুষজন শুদ্ধশীল ও ভক্তিপরায়ণ, রাজাও জুয়ান জ্যাঙকে সাদরে স্থান দিলেন রাজপ্রাসাদে।

কপিলা রাজ্যে উপস্থিত হয়েই জুয়ান জ্যাঙ প্রথম অনুভব করলেন যে, তিনি যেন তাঁর অভীষ্ট পুণ্যভূমির মধ্যে এসে গেছেন। যদিও এখান থেকেও নালন্দার দূরত্ব অনেক। কিন্তু এ অঞ্চলের ভাষায় রয়েছে সংস্কৃতের গন্ধ। কিছু কিছু মানুষের নামও অন্যরকম। চিনাদের সংখ্যা অনেক কম।

এই কপিলা এক কালে ছিল প্রখ্যাত সম্রাট কনিষ্কের অধিকারের অন্তর্গত। গৌতম বুদ্ধও এককালে এখানে পরিভ্রমণে এসেছিলেন, তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তার চিহ্নও রয়ে গেছে কিছু কিছু। কোথাও আছে তাঁর পদচিহ্ন, কোনো বিহারে তাঁর অস্থি কিংবা কেশ। এর প্রায় সবই কাল্পনিক, শ্রমণ জুয়ান বুঝতে পারেন, সাধারণ মানুষ এই ভাবেই তথাগতের স্মৃতি-হৃদয়ে জাগিয়ে রাখতে ভালোবাসে। এমনকী একটি বিহার সম্পর্কে কথিত আছে যে, বুদ্ধ আকাশ পথে একবার সেখানে এসেছিলেন। জুয়ান মানুষের এইসব অলৌকিক বিশ্বাসকেও অশ্রদ্ধা করেন না, মন দিয়ে শোনেন।

এই সব অঞ্চলের সঙ্ঘারাম থেকে অনবরত ধ্বনিত হচ্ছে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং গচ্ছামি। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

তিনি সকৌতুকে আরও আরও লক্ষ করলেন, এই অঞ্চলের মানুষ বহু নাম সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। তারা জুয়ান জ্যাঙের পরিবর্তে বলে হিউয়েন সাঙ। তিনিও সেই নাম মেনে নিয়েছেন।

দুই

হি-লা নগর থেকে ঢালু পথে হিউয়েন সাঙ নেমে এলেন অনেকখানি। একটি উদ্যানের পাশে তাঁকে থামতে হল। এখান থেকে দুটি পথ গেছে দু'দিকে। অপেক্ষাকৃত সরু পথটি নেমে গেছে আরও নীচের উপত্যকার দিকে। অন্য

পথটি উঠেছে সম্মুখবর্তী পর্বতে, অনেক উঁচু দিয়ে গিরিপথ পার হতে হবে, লেগে যাবে কয়েকটি দিন।

এই উদ্যানে কিছু মানুষ সমবেত হয়েছে এই বিখ্যাত শ্রমণকে বিদায় জানাতে। যথারীতি এখানেও কয়েকজন তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে লাগল, আরও কিছুদিন এখানে অবস্থান করার জন্য। হিউয়েন সাঙ বিনীত ভাবে তাদের জানালেন যে, ফেরার পথে তিনি এমন সুরম্য একটি স্থানে অবশ্যই থেমে বিশ্রাম নেবেন। এখন অবশ্যই তাকে যেতে হবে।

তখন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে ভদন্ত, আমার একটি প্রশ্ন আছে। একটি সংশয়। যদি অনুগ্রহ করে...

হিউয়েন সাঙ তাঁর দিকে তাকালেন।

বৃদ্ধ বললেন, আমার পিতার আমল থেকে আমরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। আমরা যথাসাধ্য ধর্মাচরণ করি। কিন্তু এ দেশে শীত কেমন প্রবল, তা আপনি জানেন। শীতের সময় পশুমাংস ভক্ষণ না করলে শরীরে উত্তাপের অভাব হয়। বিশেষত কিশোর ও যুবাদের মাংস ব্যতীত অন্য আহার্যে রুচি হয় না। অথচ আমরা জানি, আমাদের পবিত্র ধর্মে অহিংসার স্থানই সর্বোচ্চে। তা বলে কি জীবহত্যা ও মাংসাদি আহার করে আমরা অনবরত পাপ করে বসেছি? আপনি আমাদের সত্য উপদেশ দিন।

হিউয়েন সাঙ হেসে বললেন, এ প্রশ্ন আমি আগেও অনেকবার শুনেছি। আমি আর কী উপদেশ দিতে পারি? তবে, এ বিষয়ে স্বয়ং বুদ্ধ কী বলেছিলেন তা আপনারা শুনুন। আপনারা জানেন, পরম কারুণিক শাক্য কখনও কারওর প্রতি জোর করে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন না। তাঁর জীবৎকালে বৈশালীতেও এই প্রশ্ন উঠেছিল। বৈশালীর এক অভিজাত সামন্ত বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরেও নিজের মাংস বিক্রির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কিছু কিছু ভক্তও সেই মাংস আহার করতেন। তাই নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ হয় এবং স্বয়ং বুদ্ধের কাছে তাঁরা সালিশি করতে আসেন। বুদ্ধ তখন সব শিষ্যদের এক স্থানে সমবেত করে বলেন, কারওর পক্ষেই প্রাণী হত্যা না করা শ্রেয়। তবে অন্যরা যদি প্রাণী হত্যা করে, তা নিবারণ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। যদি শিষ্যদের মধ্যে কেউ কোনো প্রাণী হত্যা স্বচক্ষে দেখে কিংবা তার জন্যই কোনো প্রাণী হত্যা করা হয়েছে এমন শোনে কিংবা তাঁর আতিথেয়তার জন্যই কোনো প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছে, এমন সন্দেহও হয়,

তা হলে স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সেইসব প্রাণী-মাংস ভক্ষণ না করাই উচিত হবে। আর অদৃশ্য, অশ্রুত এবং সন্দেহাতীত কোনো মাংস কেউ তার অভিরুচি অনুযায়ী আহার করতেই পারে।

জনতার মধ্য থেকে একজন জানতে চাইল, তা হলে পশু শিকার যাদের জীবিকা, তারা যদি বাজারে মাংস বিক্রয় করতে আসে, সেই মাংস গ্রহণ করা যেতে পারে?

হিউয়েন সাঙ দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

আর একটি অল্প বয়েসি যুবা জিজ্ঞেস করলেন, আচার্য, আপনি নিজে কখনও আমিষ ভক্ষণ করেছেন?

স্মিত হাস্যে আচার্য উত্তর দিলেন, আমি বাল্যকাল থেকেই নিরামিষাশী। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও সে জন্য আমার শরীরে উত্তাপের অভাব হয় না।

অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে আর এক ব্যক্তি বললেন, আপনি যখন চলেই যাবেন, আপনার যাত্রাপথ যাতে নির্বিঘ্ন হয়, আমরা সেই প্রার্থনা করব। মানুষের জীবন-যাপন যাতে সার্থক হয়, আপনি সে-সম্পর্কে আমাদের কিছু বলে যান।

হিউয়েন সাঙ বললেন, নতুন কথা আর কী বলব, প্রত্যেক মানুষ তার বিবেকের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী চলবে, এইটাই তো ঠিক পথ। নিজের আত্মাকে যদি প্রদীপের মতো করে তোলা যায়, তা হলে সেই প্রদীপের আলোই সব সময় পথ দেখাবে।

আর দেরি করা যায় না, এবার যাত্রা শুরু করতেই হবে।

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করার পর হিউয়েন সাঙ কৌতূহলভরে একজনকে প্রশ্ন করলেন, আমরা তো যাব উচ্চ পাহাড়ের পথে, আর যে-পথটা উপত্যকার দিকে নেমে গেছে, সেদিকে কী আছে?

এক প্রবীণ ব্যক্তি বললেন, ওদিকে কেউ যায় না। বেশ কিছুটা দূরে এক স্রোতময় তেজি নদী, তার ওপারে রাজা গোপালের ছায়াগুহা।

হিউয়েন সাঙ জিজ্ঞেস করলেন, ছায়াগুহা মানে?

সেই ব্যক্তি বলল, বহুকাল আগে নাগরাজ গোপালের সঙ্গে ওই প্রশস্ত গুহার অভ্যন্তরে গৌতম বুদ্ধের তর্কযুদ্ধ হয়। কয়েকদিন ধরে তা চলেছিল। অবশেষে রাজা গোপাল পরাজয় স্বীকার করে বুদ্ধের পাদবন্দনা করেন। বুদ্ধও সেই রাজাকে উপহার হিসেবে নিজের ছায়াটি দান করে যান। ওই গুহার প্রাচীরে সেই ছায়া আজও বিদ্যমান।

হিউয়েন সাঙ সবিস্ময়ে মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী বললেন! ছায়াটি এখনও বিদ্যমান?

অন্য একজন বলল, হ্যাঁ আচার্য, ছায়াটি আছে। সেইজন্যই ওর নাম ছায়া গুহা।

হিউয়েন সাঙ কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন। বাস্তব বুদ্ধিতে এই কাহিনিকে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। ভগবান বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেছেন দ্বাদশ শতাব্দী আগে, এতদিন পরেও তাঁর ছায়া কোথাও থাকতে পারে? তাছাড়া, মানুষের ছায়া তো তাঁর দেহের সঙ্গে সঙ্গেই যায়। কেউ কাউকে তার ছায়া দান করে পশ্চাতে রেখে যেতে পারে নাকি?

তবে, মহাপুরুষদের পক্ষে হয়তো সবই সম্ভব। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তার কতটুকু বিচার করতে পারি? হিউয়েন সাঙ ভাবলেন, এই কাহিনি কতটা কাল্পনিক, তার সত্যতা কিছুমাত্র আছে কি না তা যাচাই করা দরকার।

তিনি উচ্চস্বরে বললেন, এখানে এমন কেউ কি আছেন, যিনি স্বচক্ষে সেই পবিত্র ছায়া দেখেছেন?

দু'জন অশীতিপর বৃদ্ধ হাত তুললেন।

হিউয়েন সাঙ আবার জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি আপনারা নিজের চোখে সেই ছায়া দর্শন করেছেন?

এ কথা বলেই তিনি লজ্জা পেয়ে গেলেন।

এইসব সরল পার্বত্য মানুষ মিথ্যা বলতেই জানে না। যে-কারণে শহরে মানুষ মিথ্যা কথা বলেন, অর্থাৎ অপরকে প্রতারণা, সে কারণটিই এখানে অনুপস্থিত।

তিনি দুই বৃদ্ধের কাছেই তাঁদের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলেন।

দু'জনেই জানালেন যে, তাঁরা তাদের পিতার সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের বয়স দশ বৎসরের বেশি নয়। অর্থাৎ বহু বৎসর আগেকার কথা। তারপর আর কেউ সেই গুহায় যায়নি কেন?

হিউয়েন সাঙ শুনলেন যে এক সময় ভূমিকম্পে ওই দিকের পাহাড়ে নানারকম পরিবর্তন হয়। পথ নষ্ট হয়ে যায়, নদী হয়ে যায় জলপ্রপাত, একটা যে ক্ষুদ্র জনপদ ছিল তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর থেকে ওদিকে আর কেউ যায় না।

হিউয়েন সাঙ বললেন, তিনি যাবেন। গৌতম বুদ্ধের অনেক মূর্তি আছে

চতুর্দিকে। সেগুলির সঙ্গে প্রকৃত মানুষটির অবয়বের মিল কতখানি, তা ঠিক বলা যায় না। তথাগতের জীবদ্দশায় কোনো মূর্তি গড়া হয়নি, পরবর্তীকালের শিল্পীরা অবশ্যই নিজেদের কল্পনা মিলিয়েছেন। ছায়ার সঙ্গে অবিকল মিল থাকবেই। সুতরাং সেই ছায়া দর্শনের সুযোগ যদি পাওয়া যায়, কিংবা প্রকৃতই তাঁর ছায়া আজও আছে কি না, তা মিলিয়ে না দেখে এখান থেকে চলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যতদিন লাগে লাগুক, তাঁকে যেতেই হবে।

তখন একটা কলরব শুরু হল। সকলেই ওই উপত্যকার পথে নাগরাজ গোপালের ছায়া গুহার দিকে যাত্রা নিবারণ করতে চান। ও পথে এখন বিপদের শেষ নেই। প্রথম কথা, ও পথ দিয়ে অশ্বারোহণে বেশি দূর যাওয়া যাবে না, পদব্রজেও খুব কষ্টকর। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা পদে পদে। তাছাড়া, ওদিকে এখন আর কেউ যায় না বলে দস্যু-তস্কররা নিজেদের বাসস্থান বানিয়ে নিয়েছে। ব্যাঘ্র এবং ভল্লুকেরও খুব উপদ্রব। কিছুদিন আগেও দু'জন অতিরিক্ত সাহসী শিকারি ওই দিকে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে এক জনের ক্ষত-বিক্ষত দেহ নদীর মনে ভেসে এসেছে, আর একজনের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। অতএব মহাজ্ঞানী এই পর্যটকের ওই পথে যাওয়া একেবারেই উচিত হবে না। তাছাড়া বর্ষা নেমে গেলে, ওদিক থেকে ফিরে এসে এদিকের নির্দিষ্ট গিরিপথ দিয়ে যাত্রাও দুষ্কর হবে।

সকলের অনুরোধ-উপরোধ নীরবে শুনে নিলেন হিউয়েন সাঙ। তাঁর ওষ্ঠে লেখা রইল মৃদু হাস্য। হাজার বিপদের ভয় দেখিয়েও যে তাঁকে নিবৃত্ত করা যাবে না, তা এরা জানবে কী করে? তিনি একা মরুভূমি পার হয়েছেন, তার মধ্যে দু'বার তাঁর মৃত্যু ছিল প্রায় অনিবার্য। দিনের পর দিন ধরে অতিক্রম করেছেন হিমবাহ, তাঁর সঙ্গের অতিরিক্ত বস্ত্রাদি সব হারিয়ে গিয়েছিল, রাত্রে শুয়ে থাকতে হয়েছে স্রেফ বরফের ওপরে। একবার ডাকাতদের পাল্লায়ও পড়েছেন, একবার এক রাজ্যের সৈনিকরা তাঁকে বন্দি করে।

তাঁকে যেতেই হবে।

এবারে মাল বাহকরা আপত্তি শুরু করল। তাঁরা অনর্থক ওই বিপদের পথে যেতে চায় না। তাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা, বৃষ্টির আগে গিরিপথ পার হতে হবে। শ্রমণ মহাশয় যদি দেরি করতে চান, তা হলে তিনি তাদের ছুটি দিন।

হিউয়েন সাঙ এতেও বিস্মিত হলেন না। এ রকম আগেও ঘটেছে। এক

এক জন রাজা তাঁকে নানারকম উপহার দ্রব্য দিয়ে কয়েকজন মালবাহককেও তাঁর সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন। এদের সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকার কথা। কিন্তু নিজেদের রাজ্যসীমানা পেরোবার সময়ই তারা অস্থির হয়ে ওঠে, নানা ছুতোয় আর এগোতে চায় না।

এটাও স্বাভাবিক। অধিকাংশ মানুষই তাদের নিজস্ব চেনাগণ্ডির মধ্যে স্বস্তি বোধ করে। সেখানেই জীবনটা কাটিয়ে দেয়। মাত্র দু'চারজন মানুষই চেনা গণ্ডির সীমান্ত লঙ্ঘন করে অজানার দিকে এগিয়ে যেতে চায়। সেইসব মানুষই এই পৃথিবীতে মানুষের পরিসীমা অনবরত বাড়িয়ে চলে।

আচার্য হিউয়েন সাঙ তাদের কিছুই বোঝাবার চেষ্টা করলেন না, বিরক্তিও প্রকাশ করলেন না।

তিনি শান্তভাবে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার যার ইচ্ছে, এগিয়ে যেতে পারো সামনের গিরিপথে, আমি পরে এসে তোমাদের সঙ্গে যোগদান করব। আর কেউ কেউ যদি আর এগোতে না চাও, তারা ফিরে যেতে পারো। পশম বস্ত্র ও অন্যান্য সম্পদ যা অছে, তাও ভাগাভাগি করে নিতে পারো নিজেদের মধ্যে। আমার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। তবে, ভাগাভাগির সময় নিজেদের মধ্যে বিবাদ কোরো না।

তারপরই হঠাৎই আর বাক্য বৃদ্ধি না করে হিউয়েন সাঙ অশ্বচালনা শুরু করে দিলেন উপত্যকার পথে।

নদীর ধার দিয়ে দিয়ে পথ। নদীতে মৃদু স্রোত আছে, কিন্তু গভীরতা খুবই কম, তলার সব নুড়ি-পাথর দেখা যায়। এখন গ্রীষ্মকাল বলে নদীর এই রূপ, এর পর বর্ষা শুরু হলেই এই শিশু-প্রায় নদীটিই বন্য যুবতীর রূপ ধারণ করবে। এমনও হয়েছে হিউয়েন সাঙ তেমনই কোনো খরস্রোতা নদীর ধারে দিনের পর দিন বসে থেকেছেন, পার হতে পারেননি।

দু'পাশে নানান জাতের বৃক্ষরাজি। কোথাও কোথাও খাড়া দেওয়ালের মতো পাহাড়। এই পথটি যে ইদানীং ব্যবহৃতই হয় না, তার প্রমাণ কোথাও কোথাও জমে আছে শুষ্ক বৃক্ষের ডাল, কিংবা উপর থেকে খসে পড়া পাথর।

এই ঋতুতে অনেক পাখির ডাকও শোনা যায়। বর্ষা শেষ হতে না হতেই এসে যায় শীত, বৃষ্টিপাতের বদলে তুষার বর্ষণ। তখন এই সব পাখি ও অন্য জীবজন্তু নেমে যায় নীচের দিকে। মাসের পর মাস চতুর্দিকে শুধু জমে থাকা বরফ, একমাত্র মানুষই তা সহ্য করতে পারে।

খানিক বাদে হিউয়েন সাঙ পেছন দিকে জলের ওপর একটা ছপ ছপ শব্দ পেলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি দেখলেন, একটি নয়-দশ বৎসরের বালক সেই নদীর উপর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। বিস্মিত হয়ে তিনি থেমে দাঁড়ালেন সেখানে।

সে কি কোনো জরুরি বার্তা নিয়ে আসছে?

একেবারে কাছে আসার পর সে কিন্তু কিছু বলল না, লাজুক লাজুক মুখ করে রইল।

হিউয়েন সাঙ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী জন্য এসেছ বৎস?

বালকটি চুপ করে রইল।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কে তোমাকে পাঠিয়েছে?

এবারেও সে কোনো কথা না বলে তাঁর গা ঘেষে দাঁড়াল।

হিউয়েন সাঙ তার ধূলিমলিন চুলে স্নেহের হস্ত সঞ্চালন করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

এবারে সে উত্তর দিল, গাংগি!

এই নাম শুনে হিউয়েন সাঙ বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এই শব্দটি তাঁর চেনা মনে হল। খুব সম্ভবত পশ্চিমের ব্রাহ্মণ্যদেশের পবিত্র নদী গঙ্গার সঙ্গে মিল আছে। শাক্যমুনির জীবনীতে কতবার পড়েছেন এই নদীর নাম। এই নদীতীরেই প্রসিদ্ধ নগর কাশী, তার অদূরেই সারনাথ, সমস্ত বৌদ্ধদের তীর্থস্থান। নালন্দায় পৌঁছে অধ্যয়ন করার সময় অবশ্যই তিনি একবার দর্শন করতে যাবেন বোধিবৃক্ষ, তারপর যথাসম্ভব অন্যান্য তীর্থস্থানেও কিছু কিছু দিন কাটাবেন।

যদিও এখনো দু'তিনটি পর্বত পার হতে হবে, সহজভাবে গেলেও অতিক্রান্ত হবে প্রায় এক বৎসর কাল, তবু হিউয়েন সাঙ এই বালকটির নামের মধ্যেই তাঁর আবাল্য আকাঙ্ক্ষিত দেশের সৌরভ পেলেন।

তিনি গাংগির স্কন্ধে হাত রেখে বললেন, তুমি আমার কাছে কী চাও, বাছা?

সে বলল, আমি আপনার সঙ্গে যাব?

তিনি জানতে চাইলন, কেন?

সে আবার শুধু বলল, যাব!

অর্থাৎ কোনো প্রয়োজন বা যুক্তির প্রশ্ন নেই, সে শুধু সঙ্গে যেতে চায়।

কিছুক্ষণ আগে অতগুলি মানুষ নানা রূপ ভাবে তাঁকে নিষেধ করছিল এবং ভয় দেখাছিল, কেউ সাহায্য করার কিংবা সঙ্গে আসার সাহস দেখায়নি। শুধু এই বালকটি এসেছে। যারা সীমা লঙ্ঘন করতে চায়, এই বয়েস থেকেই তাদের সেই স্পৃহা জাগে।

একে তিনি কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

শুধু তিনি বললেন, গাংগি, আমি কোথায় যাচ্ছি, তুমি জানো?

বালক ঘাড় হেলিয়ে বলল, জানি। ছায়াগুহা।

সেখানে যাবার পথে অনেক বিপদ হতে পারে, তাও তুমি জানো?

বিপদ কাকে বলে?

তোমার যখন পনেরো বৎসর বয়েস হবে, তখন তুমি বুঝবে, বিপদ কী আর কতখানি আর বিপদকে জয় করার কতখানি ক্ষমতা তোমার আছে। সেইজন্য, এখনও তো তুমি ছোট, তাই তুমি আমার সঙ্গে যাবে বটে, কিন্তু আমার সব কথা শুনতে হবে। ঠিক?"

সে বাধ্য বালকের মতো মাথা হেলাল।

শ্রমণ তখন গাংগিকে অশ্বে তুলে নিলেন।

গাংগি অবশ্য শীর্ণকায় নয়, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। দু'জনকে বহন করা অশ্বটির পক্ষে কষ্টকর। তার গতি কমে এল।

গাংগিও পায়ে হেঁটেই যেতে চায়। হিউয়েন সাঙও নেমে পড়ে পদব্রজেই চললেন। দু'জনে এগোতে লাগলেন গল্প করতে করতে। মাথার ওপরে নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ, নদীর কুলুকুলু ধ্বনি ও পক্ষিকূজন সমেত এক অপরূপ সকাল। পথ দুর্গম হলেও অগম্য নয়। যেখানে যেখানে ধস নেমেছে বড় বড় পাথরের, সেইসব স্থান নদীর অন্য পার দিয়ে কোনোক্রমে যাওয়া যায়।

বালকেরা তো সোজা পথে যেতে জানে না। মাঝে মাঝেই গাংগি হিউয়েন সাঙের পাশ ছেড়ে নেমে পড়ে নদীতে, খেলাচ্ছলে জল মথিত করে। নদীতে রয়েছে অখণ্ড ছোট-বড় পাথর। হিউয়েন সাঙের আশঙ্কা হয়, যদি বালকটির হঠাৎ পদস্খলন হয়, তাহলে মাথায় জোর আঘাত লাগতে পারে। এ পাথরগুলি খুব পিচ্ছিলও বটে।

তিনি বারবার গাংগিকে ডাকাডাকি করে ফিরিয়ে আনেন নিজের কাছে। সে আসে বটে, কিন্তু মোটেই সুস্থির থাকার পাত্র নয়। একটু পরে পরেই যে কোনো ভাসমান ফুল কিংবা কষ্ঠখণ্ড দেখে আবার ছুটে যায় জলে। এক

এক সময় সে ডাক শুনেও কাছে আসে না, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ধরার ছলে খেলা করে, হিউয়েন সাঙকে তখন জলে নেমে তার হাত ধরে টেনে আনতে হয়।

পাথর ছাড়াও আরও একটি ভয়ের চিন্তা আছে। হিউয়েন সাঙ শুনে এসেছেন যে এই ক্ষুদ্র নদীই ক্রমশ স্ফীত হয়ে হঠাৎ কোনো এক স্থানে জলপ্রপাত হয়ে গেছে। সে-সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে। কারণ জলপ্রপাতের কাছাকাছি এলেই আর টানের বেগ সামলানো যাবে না, জলধারার সঙ্গে নীচে পতিত জল, মৃত্যুর সম্ভাবনা খুব প্রবল।

গাংগিকে বারবার সাবধান করার পরও এক সময় দেখা গেল, হিউয়েন সাঙ নিজেও নদীতে নেমে সেই বালকের সঙ্গে জলখেলায় মেতে গেছেন। বয়সে তরুণ হলেও সেই জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ যেন ফিরে গেছেন ওই বালকের বয়সে। তিনি দৌড় প্রতিযোগিতা দিচ্ছেন গাংগির সঙ্গে, তাঁর পোশাক একেবারে ভিজে গেছে। সেই জল অতি স্নিগ্ধ শীতল, একবার পা দিলে উঠতে ইচ্ছে করে না।

দু'জনের হাসির শব্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

এখানে সচরাচর মানুষই আসে না, মানুষের এমন হাস্যময় আনন্দের ধ্বনি এখানকার গাছপালা, প্রস্তরখণ্ডগুলিও শোনেনি বহুদিন, তারাও যেন ব্যগ্র হয়ে দেখছে এই অসমবয়েসী দুই ক্রীড়ারতকে।

হিউয়েন সাঙ এমন খোলা মনে অনেকদিন হাসেননি, অনেক দিন এমন হাত-পা ছড়াননি। কোনো বালকের সঙ্গেও এমন মাতামাতি করেননি কতকাল। এই সময়ে কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না, মাথা থেকে জ্ঞান ও মেধার বোঝা কিছুক্ষণের জন্য নামিয়ে রাখা যায়। শুদ্ধ, নির্মল হয় মন।

কিন্তু এই আনন্দ আর বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

অকস্মাৎ ওপরের দিকে চোখ পড়তেই হিউয়েন সাঙ দেখলেন, সামনেই অতিকায় এক কূর্মপৃষ্ঠের মতো পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন মানুষ। এদের সম্পূর্ণ শরীর কালো রঙের আলখাল্লায় ঢাকা, কপালে একটা লাল ফেট্টি বাঁধা, কোমরবন্ধে ঝুলছে তলোয়ার।

মুহূর্তমধ্যে হিউয়েন সাঙের বাস্তব-বুদ্ধি ফিরে এল। তিনি বালকটিকে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

সেই ঢালু পাথর দিয়ে লোকগুলি নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল।

বহু রকমের মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা আছে হিউয়েন সাঙের। এদের মুখ চোখ দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, এই মানুষগুলি খুবই হিংস্র প্রকৃতির। এমনকী শিশুদের প্রতিও এদের মায়া-দয়া নেই। তিনি শুনেছেন, বয়স্কদের কাছ থেকে কথা বার করার জন্য, কিছু কিছু দস্যুদল পিতা-মাতার সামনেই শিশুদের ওপর অত্যাচার করে। এমনকী হাতপা-ও কেটে দেয়।

তিনি নিচু গলায় বললেন, গাংগি, এবার তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে। তুমি পিছন ফিরে দৌড়তে থাকো। যত জোরে পারো। কেউ যেন তোমায় ধরতে না পারে। এক দৌড়ে নিজ গৃহে চলে যাবে। সেখানে গিয়ে, এখানে কী ঘটেছে, তা একেবারেই বলবে না। এটা তোমার আর আমার মধ্যে গোপন থাকবে, কেমন? আমি ফিরে এসে তোমার সঙ্গেই আবার দেখা করব। নাও, দৌড়ও! দৌড়ও!

ওপরের লোকগুলি নেমে আসার আগেই গাংগি দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হিউয়েন সাঙ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লোকগুলি সংখ্যায় পাঁচজন। তাদের দলপতিকে অনায়াসেই চেনা যায়। তার শরীরের আকার যেমন অন্যদের চেয়ে বেশি, মুখের ভঙ্গিতেও আধিপত্যের ছায়া।

হিউয়েন সাঙের একেবারে কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দলপতিটি কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এই, তুমি কে হে?

হিউয়েন সাঙ শান্তভাবে বললেন, আমি একজন পর্যটক।

দলপতিটি আবার জিজ্ঞেস করল, পর্যটক তো এদিকে কোথায় চলেছিল? এই পথ ধরে তো বেশি দূর যাওয়া যায় না।

হিউয়েন সাঙ বললেন, এই দিকে নাগরাজ গোপালের ছায়াগুহা আছে। আমি সেটা দেখতে যাচ্ছি!

দলপতি ভ্রু-কুঞ্চিত করে বলল, হ্যাঁ, ছায়াগুহা একটা আছে বটে। তা এ পথে যে অনেক বিপদ হতে পারে, তা তুই শুনিসনি?

হিউয়েন সাঙ বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি। এ দিকে অনেক হিংস্র-জন্তুজানোয়ার আছে। কিন্তু তোমরা তো মানুষ, মানুষের কাছে আর মানুষের বিপদ কী হবে?

প্রচণ্ড অট্টহাস্য করে দলপতি বলল, তোরা অনেক লেখা-পড়া করিস বটে, আসলে তোরা মূর্খ। মানুষের কাছ থেকেই তো মানুষের ভয় বেশি!

হিউয়েন সাঙও হাসি মুখে বললেন, এই দ্যাখো, আমার সঙ্গে রয়েছে

একটি জলপাত্র আর একটি পেটিকায় কয়েকটি পিষ্টক আর সূক্ষ্ম ফল। এগুলি যদি তোমাদের কাজে লাগে তো নাও। তারপরেও আমাকে তোমরা মারবে কেন? অনেকে পশু শিকার করে তার মাংস খাবার জন্য। মানুষ তো মানুষের মাংস খায় না, তবু কেন মানুষ মারে? সে তো মাংসের অপচয়। আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও তো!

দলপতি বলল, খুব চালাক চালাক কথা শিখেছিস, তাই না? আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর দিই না। উত্তর দেওয়ার বদলে এক কোপে তোর গলাটা কেটে ফেলতে পারি, সেটা অনেক সহজ।

হিউয়েন সাঙ বললেন, তাতে যদি তোমার আনন্দ হয়, তা হলে কাটো।

এবারে অন্য এক দস্যু বলল, সর্দার, ওই গুহায় কেউ যায় না। এই লোকটা একা একা থাকে, ও কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পায়নি তো?

দলপতি জিজ্ঞেস করল, কী রে, তুই কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিস নাকি?

হিউয়েন সাঙ বললেন, হ্যাঁ পেয়েছি। তবে কে কোন জিনিসকে গুপ্তধন মনে করে, তা তার ওপর নির্ভর করে। আমি শুনেছি, ওখানে ভগবান বুদ্ধের ছায়া রয়ে গেছে। আমি যদি সেই ছায়ার দর্শন পাই, তবে তা হবে আমার কাছে কোনো সম্রাটের রত্নাগারের চেয়েও বেশি।

দলপতি এবারে খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, বুদ্ধের ছায়া? বুদ্ধের তো অনেকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে, তাই না?

হিউয়েন সাঙ বললেন, তিনি প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী আগে দেহরক্ষা করেছেন।

ওসব শতাব্দী-টতাব্দী আমি বুঝি না। ঠিক কতদিন আগে বুঝিয়ে দে!

মনে করো, তোমার পিতা, তাঁর পিতা, তাঁর পিতা, তাঁর পিতা, এরকম প্রায় পঞ্চাশ পুরুষ আগে।

অতদিন আগে যে মানুষটার মৃত্যু হয়েছে, তার ছায়া রয়ে গেছে আজও? ওরে তোরা শুনেছিস, একজন মরা মানুষেরও নাকি ছায়া থাকে?

এবারে সবাই হাসতে লাগল।

দলপতি বলল, মানুষের দেহেরই শুধু ছায়া থাকে। মানুষ যেখানে যায়, ছায়াও সঙ্গে যায়। একটার বেশি দুটো ছায়াও হয় না। এই তো, দ্যাখ না, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমার ছায়া পড়েছে। এই আমি সরে এলাম, আমার ছায়াও সঙ্গে এল। আমি কি হাজার চেষ্টা করেও আমার ছায়াটাকে

আগের জায়গায় রেখে আসতে পারব?

হিউয়েন সাঙ সমান দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, না, তুমি তা পারবে না। কারণ, তুমি গৌতম বুদ্ধ নও। আমরা সাধারণ মানুষ, কেউ পারব না। কিন্তু মহাপুরুষরা এমন অনেক কিছু পারেন, যা সাধারণ মানুষের অসাধ্য। সে জন্যই তাঁরা মহাপুরুষ।

দলপতি এবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ওরে, তোরা কেউ একজন ওকে বাঁধ তো। এ লোকটা অনবরত বাজে কথা বলছে। এর নিশ্চয়ই অন্য মতলব আছে। ওকে গুহাটায় নিয়ে দেখি, কী করে।

দু'জন দস্যু তরতরিয়ে নেমে এসে হিউয়েন সাঙের হাত দুটি পশ্চাতে নিয়ে গিয়ে দড়ি দিয়ে দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলল।

হিউয়েন সাঙ মনে মনে বলতে লাগলেন, নালন্দা, নালন্দা, নালন্দা। এটাই তাঁর বীজমন্ত্র। তাঁকে সেখানে যেতেই হবে, দস্যুরা যতই বাধা দিক।

তারপর দস্যুরা তাঁকে টেনে টেনে নিয়ে চলল সামনের দিকে।

হিউয়েন সাঙ ভাবলেন, ভালোই হল। তাঁর আর পথ হারাবার সম্ভাবনা রইল না। এরা কি তাঁকে যথাস্থানে নিয়ে যাবে।

পথ ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল।

হিউয়েন সাঙের অশ্বটিকে দস্যুরাই বেঁধে রাখল একটি গাছের সঙ্গে, কারণ অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হওয়ার আর কোনো উপায়ই নেই। এই দিকে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু গৃহের ধ্বংসস্তূপ, ভূমিকম্পের চিহ্ন প্রকট। দু'একটি বন্যপ্রাণীর ডাকও শোনা যাচ্ছে।

নদীটি ক্রমশ চওড়া হয়ে যেখানে জলপ্রপাতের রূপ নিয়েছে, সেখানে পাশের পথটিও চাপা পড়ে গেছে বড় বড় পাথরে। অপর পারেও খাড়া পাহাড়। এখানে গাছের ডালে শক্ত রজ্জু বন্ধন করে তা ধরে জলপ্রপাতের মধ্যে দিয়েই ঝুলে ঝুলে নামা ছাড়া গতি নেই।

এখানে হিউয়েন সাঙের হাতের বন্ধনও খুলে দিতে হল। তিনি অন্যদের তো রজ্জু ধরেই নামলেন।

উদ্দীষ্ট গুহামুখে পৌঁছতে পৌঁছতে অপরাহ্ণ হয়ে গেল।

গুহামুখটি বেশ প্রশস্ত। ওপরের দিকে প্রায় বিলীন খানিকটা কারুকার্য দেখে মনে হয়, মানুষের হাতের স্পর্শ ছিল। এক উচ্চ পর্বতগাত্রে সেই গুহা, বিপরীত দিকে ঘন জঙ্গল। গুহার ভিতরটি মনে হয় যেন এক মস্তবড় কক্ষের

মতো, অন্তত তিরিশ-চল্লিশজন মানুষ সেখানে আসন গ্রহণ করতে পারে।

গুহাটি রাজা গোপালের নামাঙ্কিত, সুতরাং পুরাকালে নিশ্চয়ই এখানে কিছু মানুষের বসবাস ছিল। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ এক সময়ে এখানে এসেছিলেন, একথা ভাবলেই রোমাঞ্চ হয়। হিউয়েন সাঙের সর্বাঙ্গে সেই শিহরন।

দস্যুর দল গুহার অভ্যন্তরে ঢুকে সর্বত্র উকি-ঝুঁকি মারতে লাগল।

হিউয়েন সাঙ দুই বৃদ্ধের মুখে শুনে এসেছিলেন যে, গুহামুখ থেকে পঞ্চাশ পা সোজা হেঁটে গেলে একটি চওড়া প্রস্তর-প্রাচীরের সামনে পৌঁছনো যাবে, সেখান থেকে পূর্বদিকে তাকালেই দেখা যাবে সেই ছায়া। হিউয়েন সাঙ ঠিক সেই ভাবেই হেঁটে গেলেন পঞ্চাশ পা, প্রাচীরও পেলেন, মুখ ফেরালেন পূর্বে।

বলাই বাহুল্য, সেখানে কোনো ছায়া নেই।

দস্যু দলপতি বক্রভাবে বলল, ওহে সন্নেসী, কোথায় তোর সেই মহাপুরুষের ছায়া? যদি তা দেখাতে না পারিস, তা হলে তোমার নিজের ছায়াও আর থাকবে না। অথবা কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ, তা সত্যি করে বল।

হিউয়েন সাঙ অবিচলিতভাবে বললেন, আমি ছায়া দর্শন করতেই এসেছি। তার চেয়ে আর বেশি কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থাকতেই পারে না।

দলপতি বলল, তুই পুঁথি-পত্তর পড়েছিস, ধর্মের কথা জানিস, অথচ তোর মগজে এইটুকু ঢুকল না যে কোথাও মৃত মানুষের ছায়া পড়ে থাকতে পারে না।

হিউয়েন সাঙ বললেন, আমি দু'জন প্রবীণের মুখে শুনেছি, তাঁরা স্বচক্ষে এই ছায়া দেখেছেন। তবে সে ছায়া প্রাতে না অপরাহ্নে দেখা যায়, তা জিজ্ঞেস করিনি।

দলপতি ধমক দিয়ে বলল, আবার তুই কথা ঘোরাচ্ছিস! ওরে তঞ্চক, এ ছায়া কি ইচ্ছে মতো আসে আর যায় নাকি!

হিউয়েন সাঙ বললেন, আমি তার বিচার করতে সক্ষম নই। আমি প্রভাতের অপেক্ষায় এখানে বসে থাকব।

দলপতি বলল, তা হলে আমরাও রাতটা কাটাব এখানেই।

সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি রে, তোরা রাজি?

সঙ্গীদের সবাই সম্মতি জানাল। একজন বলল, আমরা কয়েকবছর আগে এ গুহায় একবার থেকেছি। তখনো কিছুই দেখিনি।

হিউয়েন সাঙ সেই পাথরের দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে সজীব বুদ্ধকে কল্পনায় দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন আর জপ করতে লাগলেন 'শ্রীমালা দেবী সিংহনাদ শাস্ত্র' থেকে শ্লোক।

এইসব পার্বত্যদেশে অকস্মাৎ নেমে আসে সন্ধ্যা। সূর্যদেব বড় বড় শৃঙ্গের আড়ালে ঢাকা পড়ে যান।

দস্যুদল তাদের খাদ্য-পানীয় নিয়ে বসল গোল হয়ে। হিউয়েন সাঙ নিঃসাড় হয়ে রইলেন, যেন তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধও লুপ্ত হয়ে গেছে।

কিছু পরে গুহার বাইরে কিসের যেন দাপাদাপি শোনা গেল।

দু-তিনজন দস্যু প্রবেশ মুখের কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। একজন বলল, এই রে, এ যে দেখি গোটা কয়েক ভল্লুক! ওরা নিশ্চই এই গুহাটায় আস্তানা বানিয়েছিল, আমরা তা দখল করে নিয়েছি।

অন্য একজন বলল, রাত্তিরে যদি ভেতরে এসে উৎপাত করে?

দলপতি বলল, আমরা পাঁচজন আছি, ভয় কী! কিছু পাথরের টুকরো সংগ্রহ কর, তারপর নিশানা করে মার। যদি ভল্লুকদের নাকে লাগাতে পারিস, তাহলেই ওরা ভেগে পড়বে। ওরা নাকের ব্যাপারে বড় শৌখিন।

এরপর কিছুক্ষণ ভল্লুকদের সঙ্গে দস্যুদের যুদ্ধ চলল। কোলাহল ও ক্রুদ্ধ ডাকে ছিন্নভিন্ন হল নীরবতা। তারপর ভল্লুকেরা বাধ্য হল পশ্চাৎ অপসারণে।

হিউয়েন সাঙ যেন কিছু শুনতেই পেলেন না, আগাগোড়া নিথর, নিঃস্পন্দের মতন রইলেন।

একসময় ভোর হল। পরিষ্কার, উজ্জ্বল প্রভাত। গুহার ভিতরটা আলোয় ভরে গেল। কিন্তু কোথায় সেই ছায়া? দেখলেই বোঝা যায়, এখানে এই সময় কোনো কিছুর ছায়া পড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

হিউয়েন সাঙ একইভাবে চক্ষু বুজে আছেন। সর্দার তাঁর কাছে গিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, ওহে সন্নেসী, কোথায় গেল তোমার সেই ছায়া? আমরা না হয় পাপী-তাপী, তাই মহাপুরুষের ছায়া দেখতে পেলাম না। তোমার কী হল? তুমি শুধু শুধু এতদূর এলে—

হিউয়েন সাঙ চক্ষু না খুলেই বললেন, হয়তো মনের অগোচরে আমিও কখনো কিছু পাপ করেছি, তাই আমারও সেই সৌভাগ্য হল না।

তুমি এখন কী করবে?

আমি এখানেই অপেক্ষা করতে চাই।

তোমার জন্য বৃথা আমরা এত দূর এসেছি। এজন্য তোমার কিছু শাস্তি প্রাপ্য।

দিন।

একজন দস্যু বলল, সর্দার আমাদের গান্ধার রাজ্যের দিকে যাওয়ার কথা। এখানে আর শুধু শুধু অপেক্ষা করে লাভ কী? এ ব্যক্তিটি একটা উন্মাদ।

সর্দার বলল, উন্মাদই বটে।

অবশিষ্ট যে-সব খাদ্যদ্রব্য তাদের ছিল, সেইগুলি তারা শেষ করতে বসে গেল। গুছিয়ে নিল পোঁটলা-পুঁটলি।

একটি হরিণের শুকনো ঠ্যাঙ চর্বণ করতে করতে সর্দার হিউয়েন সাঙের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার সঙ্গীদের বলল, আচ্ছা, ওই যে লোকটা কাল সন্ধ্যাবেলা থেকে এই পর্যন্ত ওই একই জায়গায় ঠায় বসে আছে, একবারও ওঠেনি, এক গণ্ডুষ জলও খায়নি, এটা কি ওর ভড়ং, না মানুষ সত্যিই এ-রকম পারে।

এক সঙ্গী বলল, ভড়ং বলেই বোধ হয়। দেখব নাকি একবার তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে?

সর্দার অন্যমনস্কভাবে বলল, থাক।

আর একজন সঙ্গী বলল, দ্যাখো, দ্যাখো কাণ্ড, এই ছিল রোদ্দুর, এখন আবার আকাশ মেঘে ভরে গেল?

বিস্ময়ের কিছু নেই। এমনই তো হয় পার্বত্যদেশে, ভরা বর্ষার আগেই কখনো কখনো হঠাৎ মেঘ জমে, প্রবল বর্ষণ হয়।

শুরু হল বাতাসের শন শন, তারপরেই বজ্রগর্জন। বৃষ্টি শুরু হল বলে। এই সময় নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন ছাড়া কেউ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরোয় না।

সর্দার বলল, মনে হয় এ বৃষ্টি বেশিক্ষণ চলবে না। একটু অপেক্ষা করা যাক। এই মরসুমে খাইবার গিরিপথ দিয়ে তীর্থযাত্রী যায়। তাদের গোটা কতককে ধরতে হবে।

অন্য একজন বলল, ওই গিরিপথের ঠিক ভিতরেই একটু দূরে, এই রকম একটা গুহা, আর একটু ছোট, আছে। সেখানে ঘাপটি মেরে থাকার খুব সুবিধে।

আর একজন বলল, গত বৎসর, মনে আছে, এক বৃদ্ধ, তার কী কাকুতি-মিনতি, কত বার পায়ে ধরল। আরে বাপু, তোর বয়েস তিনকাল

গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, তবু বেঁচে থাকায় এত আহিক্কে কেন?

এইরূপ বিশ্রম্ভালাপ চলল কিছুক্ষণ।

এবং কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি, যেমন অকস্মাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনই হঠাৎ সম্পূর্ণ থেমেও গেল। অপসৃয়মান মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসছে আলো। কোথাও কোথাও সেই আলোকে মনে হয় জ্যোতির মতো।

দলপতি এবার বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, আচমকা দারুণ উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করে বলে উঠল, সন্নেসী, সন্নেসী, চক্ষু মেলো, চেয়ে দ্যাখো।

মেঘ ভেদ করে আলোর মাঝখানে বুঝি পড়েছে কোনো পাহাড় চূড়ার আড়াল, তারই ছায়া পড়েছে দেয়ালে, আস্তে আস্তে সেই ছায়ার মধ্যে ফুটে উঠছে মনুষ্যের অবয়ব।

বিস্ফারিত চক্ষু মেলে হিউয়েন সাঙ তাকিয়ে রইলেন সেই দৃশ্যের দিকে। তাঁর দুটি হাত যুক্ত, ওষ্ঠে অস্ফুট মন্ত্র।

ক্রমে সেই ছায়া পরিপূর্ণ হল। পরিষ্কার পদ্মাসনে বসা ধ্যানমগ্ন ভগবান বুদ্ধের মূর্তি। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেরই এ মূর্তি চেনা।

সকলেই মোহাবিষ্টের মতো দেখতে লাগল সেই ছায়া। এখন রোদ্দুরের রং সোনার মতন, ঝকঝক করছে সেই ছায়াকে ঘিরে।

বেশিক্ষণ নয়, আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যেতে লাগল সেই ছায়া। আকাশের মেঘে যেমন কত রকম স্থাপত্য দেখা যায়, আবার মিলিয়েও যায়, সেইভাবে এই ছায়াও অদৃশ্য হয়ে গেল।

হিউয়েন সাঙের চক্ষু থেকে বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। তার মধ্যেই এক তরুণ দস্যু বলল, এ তো মেঘ অর রোদ্দুরের খেলা। এর মধ্যে অলৌকিক কী আছে? এরকম তো কতই হয়।

দলপতি তাকে ধমক দিয়ে বলল, উল্লুক, মেঘ আর রোদ্দুরের খেলায় যদি কোনো মহাপুরুষের মূর্তি ফুটে ওঠে, সেইটি অলৌকিক। আমরা মরে গেলে আমাদের চেহারা ওভাবে ফুটবে কখনো?

হিউয়েন সাঙ বিস্মিতভাবে দলপতির দিকে তাকালেন। তারপর তার কাছে এসে তাকে স্পর্শ করে বললেন, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি মিছে চক্ষু বুজে জপ করছিলাম, তুমিই তো আমাকে জাগালে!

অন্য একজন দস্যু বলল, যাই হোক, সর্দার, দেখা তো হল। এবার চলো, আমরা যাই।

সর্দার বলল, হ্যাঁ, যাব, যাব। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কী যেন হচ্ছে! ঠিক বুঝতে পারছি না।

সঙ্গীটি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, সে কী সর্দার, তোমার শরীর খারাপ? ঠিক কী হচ্ছে বলো তো?

সর্দার বলল, কী হচ্ছে, তাও জানি না। একবার মনে হচ্ছে ঝরঝর করে ঝরনার জল পড়ছে বুকের মধ্যে, আবার যেন শুনতে পাচ্ছি, টুং টাং ঘণ্টার শব্দ, আবার খুব ঠান্ডা বাতাস, এত আরাম, চক্ষু বুজে আসছে। এ রকম আমার হয়নি কখনো। ওগো সন্ন্যাসী, তুমিই বলো না, আমার এ কী হল?

হিউয়েন সাঙ বললেন, তোমার বুকের মধ্যে যা হচ্ছে, তা হল শান্তির বোধ। তুমি দস্যু-তস্করের কাজ করে অনেক কিছু পেতে পারো, লুঠপাট, খুন, অত্যাচার করে অনেক ধনসম্পদ আর প্রভূত ক্ষমতারও অধিকারী হতে পারো, কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই পাবে না, শত-সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও পাবে না। তার নাম শান্তি। এখন মহাপুরুষ দর্শনের পুণ্যে তোমার ক্ষণিকের তরে সেই শান্তিবোধ হয়েছে। আবার তুমি তোমার কর্মে প্রবৃত্ত হও, ওই বোধ চলে যাবে।

সঙ্গীরা ব্যস্ত হয়ে বলল, চলো, সর্দার, চলো।

সর্দার বলল, না, তোরা যা। আমি যাব না। এই শান্তির বোধ কী অপূর্ব! আমি তা হলে এখন কী করব? আমি... আমি এই শ্রমণের সঙ্গে যাব।

হিউয়েন সাঙ হেসে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাবে? আমি যাব বহুদূরে।

সর্দার তবু জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ, যাব। তোমার সঙ্গে যাব। যতদূর পর্যন্ত যেতে পারি। তুমি আমাকে দীক্ষা দাও। দীক্ষা দাও!

সে বসে পড়ল হিউয়েন সাঙের পায়ের কাছে।

কীর্তিনাশার এপারে ওপারে

দিনমানে ঝড়-বাদলের কোনো আভাস ছিল না। নীল আকাশের বহু উঁচে বিন্দু বিন্দু কালো রঙের চিল। নীচের দিকে বকের পঙ্‌ক্তি। ফাল্গুনের শেষ উত্তুরে বাতাস আর বয় না, তবে গ্রীষ্মের দাহ এখনও শুরু হয়নি।

অগ্র-পশ্চাতে ছয়জন বর্শাধারী পাহারাদার ও একজন বন্দুকধারী সিপাহি সমেত একটি শিবিকা যাত্রা করেছিল শ্রীপুর থেকে। গন্তব্য তালছিরি গ্রাম, আড়াই-তিন ঘণ্টার পথ। শিবিকাটির দু'দিকেই পর্দা দিয়ে ঢাকা।

অর্ধেক পথ বিনা বিঘ্নেই পার হওয়া গেল। বিঘ্ন ঘটার কোনো কারণও নেই। বর্তমান বঙ্গে দস্যু-তস্করের উপদ্রব খুব বেশি হলেও সাতজন সশস্ত্র রক্ষী, তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আছে আগ্নেয়াস্ত্র, তা দেখেও কাছ ঘেঁষবে, এমন বুকের পাটা কোনো দস্যুদলেরই নেই।

শিবিকা-বাহকরা দৌড়ে দৌড়ে চলে, তাতেই তারা অভ্যস্ত, এক প্রহরকালও তারা ওইভাবে পার হতে পারে, কিন্তু সঙ্গের প্রহরীর তাল রক্ষা করতে পারে না, রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়ে। তাই মাঝেমধ্যে থেমে জিরিয়ে নিতে হয়।

একদিকে জনপদ বিশেষ নেই। অদূরেই পদ্মা নদী। কিছু কিছু ভগ্নদশা বাড়িঘর দেখে বোঝা যায় এককালে বসতি ছিল, কোনো মহামারীতে মানুষজন সব ছারখার হয়ে গেছে। নদী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে ফিরিঙ্গি বোম্বেটেরা এককালে যখন-তখন জাহাজে চেপে এসে লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ করত,

সেই উৎপাতেও নদীর কাছাকাছি গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে গেছে। ইদানীং অবশ্য ফিরিঙ্গি বোম্বেটেরা আর এদিকে আসে না, তারা সব জড়ো হয়েছে সন্দ্বীপে।

ফাঁকা মাঠের মধ্যে বিশাল ডালপালা ছড়ানো একটা অশ্বত্থগাছ, তার পাশে তিনটে তালগাছ। সেখানে নামানো হল শিবিকা। বাহকেরা কোমরের গামছা খুলে মুছতে লাগল ঘর্মসিক্ত শরীর। কেউ কেউ নিকটবর্তী একটি প্রায় শুষ্ক পুষ্করিণীতে প্রথমে উপুড় হয়ে জলপান করে নিল, তারপর প্রক্ষালন করতে লাগল হাত-পা।

শিবিকার মধ্যে রয়েছেন দুই রমণী। একজন সম্ভ্রান্ত যুবতী, অন্যজন তাঁর মধ্যবয়স্কা দাসী। যুবতীটির সর্বাঙ্গ অলঙ্কারবিহীন, শুভ্র বসন, সিঁথিতে সিন্দুরচিহ্ন নেই। তাঁর গাত্রবর্ণ স্বর্ণপ্রভ, সেইজন্য জন্মের পরই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল স্বর্ণময়ী। তিনি অসূর্যম্পশ্যা।

একটি কলসিতে আনা হয়েছে পানীয় জল ও কিছু ফলমূল। বিশ্রামের সময় তিনি শুধু জলপান করলেন, তারপর দাসীর পীড়াপীড়িতে একটি মিষ্ট পিষ্টক মুখে দিলেন।

অকস্মাৎ শোনা গেল বজ্রনির্ঘোষ।

কখন যে আকাশে মেঘ ছড়িয়ে গেছে, কেউ খেয়ালই করেনি। আকাশ ছেয়ে গেছে পাতলা মেঘে, তার থেকেই এই বজ্রগর্জন। যেদিকে তাকানো যায় আদিগন্ত প্রান্তর, তাই শব্দের জোরও বেশি। বুকে কাঁপন ধরে।

বন্দুকধারীটিই এই যাত্রীদলের নায়ক। তার নাম বল্লভরাম, তার মুখমণ্ডলে মোচটিই প্রধান দ্রষ্টব্য। নাসিকার তলা থেকে দুই কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত। একালে গুম্ফের আকার-প্রকারেই ব্যক্তিত্বের তারতম্য বোঝায়।

সে উঠে দাঁড়িয়ে দিক নির্ণয় করতে লাগল।

এই প্রান্তরটি যে শুধু জনবসতিহীন তাই-ই নয়, বৃক্ষবিরলও বটে। কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে একটি মন্দিরের চূড়া। ওই মন্দিরটিও যে ভগ্ন ও পরিত্যক্ত তা বল্লভরাম জানে। তবে ওরই পাশ দিয়ে আরও কিছু দূর গেলে তালছিরি গ্রামের পথ পাওয়া যাবে। সেদিকের আকাশের মেঘের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ওই জাতীয় মেঘই বজ্রগর্ভ হয়, বৃষ্টিও ওদিকেই হবে। এখন মাঝে মাঝে বিদ্যুৎঝলকও দেখা যাচ্ছে। সুতরাং এখন এই গাছতলায় অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

কিন্তু মেঘের চরিত্র নির্ণয় করা দুষ্কর। আকাশে কখন যে কী ঘটে, তা আজও মানুষের বুদ্ধির অগম্য। প্রবল বর্ষণে নগর-গ্রাম প্লাবিত হয়ে যায়, নদী

উত্তাল হয়ে ওঠে, বন্যায় বিনষ্ট হয় ফসলের খেত। আবার বৃষ্টির অভাবেও দগ্ধ হয় ফসল, দুর্ভিক্ষে বহু মানুষের প্রাণ যায়। সবই ঈশ্বরের লীলা।

প্রথম কিছুক্ষণ একেবারে নিবাত, নিস্কম্প, গাছের একটি পাতাও নড়ে না। তারপর দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে ভেসে আসে ঠান্ডা বাতাস। মন্দিরটি আর দৃষ্টিগোচর নয়, ওদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

আরও অল্পক্ষণ পরেই শুরু হল ঝড়, এই মনে হচ্ছিল বাতাসের অস্তিত্বই নেই, এখন এত বাতাস কোথা থেকে আসে? বাতাসের এত শক্তি যে, ঝড়ের রূপ ধরে ভেঙে ফেলে মোটা মোটা গাছের ডাল! মানুষরাও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মনে হয় যেন বাতাস তাদেরও উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এত ঘন ঘন বজ্রপাত শুরু হল যে, কান পাতা দায়। অশ্বত্থগাছটিতে অনেক ক্ষুদ্র পশু ও পক্ষীদের বাসা, তারা শুরু করে দিল আর্ত চিৎকার। একটা মস্ত বড় ডাল মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ছে, তাড়াতাড়ি শিবিকাটিকে সরিয়ে আনা হল উন্মুক্ত স্থানে।

দিগন্তের কালো মেঘটি ঝড়ের দাপটে চলে আসছে এদিকে। শুরু হল বড় বড় ফোঁটায় বর্ষণ। শিলাখণ্ড এসে পড়ছে গায়ে মাথায়। এরই মধ্যে একজন প্রাণপণ বিকট শব্দ করে উঠল।

প্রথমে বোঝা গেল না ঠিক কী হয়েছে, কে অমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল? তারপরই দু'-তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, বাজ! বাজ! মুলুকচাঁদ গেছে!

মুলুকচাঁদ নামে পাহারাদারটি বৃষ্টি থেকে মস্তক রক্ষা করার জন্য দাঁড়িয়েছিল একটা তালগাছের তলায়। তার মাথায় বাজ পড়েছে। সে বসে পড়েছে, শরীরটা দোমড়ানো। দেখলেই বোঝা যায়, প্রাণ নেই।

সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল কিন্তু কেউ খুব কাছে গেল না। মৃতদেহ থেকে এখনও একটু একটু ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে।

বাজ জিনিসটা কী, তা কেউ জানে না। আকাশ থেকে আগুনের গোলা নেমে আসে? মেঘের মধ্যে আগুন থাকতে পারে? মেঘ থেকেই তো বৃষ্টি নামে, সেখানে আগুন থাকবে কী করে? আগুন আর জল এক সঙ্গে?

মুলুকচাঁদ যে এইভাবে মরল, এটা নিশ্চয়ই তার নিয়তিতে ছিল। নিয়তির হাত থেকে তো কেউ কারওকে বাঁচাতে পারে না। ওকে এখন এখান থেকে নিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। থাক পড়ে এখানেই।

এখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে। আবার যদি বাজ পড়ে? গাছতলায়

দাঁড়ালেও বাজের হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। ফাঁকা জায়গাতেও বাজ পড়ে। এরকম মৃত্যু সবাই আগে দেখেছে। প্রত্যেক বছরই কয়েকজন বজ্রাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই কয়েকজন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করল। পড়ে রইল শিবিকাটি।

একমাত্র বল্লভরাম প্রকৃত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। সে পলায়ন করতে পারে না। একজন পলায়নপর শিবিকাবাহকের ঘাড় ধরে ফেলে বলল, শুয়ার, রানিদিদিকে ফেলে কোথায় পালাচ্ছিস, এরপর তোর গর্দান থাকবে?

বল্লভরাম নিজে আর সেই লোকটি মিলেই শিবিকাটি তুলে নিল। তারপর ছুটল ভাঙা মন্দির লক্ষ্য করে। বন্দুকটি তার সঙ্গে রইল বটে, কিন্তু টোটা আর বারুদ সব বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেল একেবারে।

সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে অতি কষ্টে শিবিকাটি বহন করে তারা দু'জনে পৌঁছল উদ্দীষ্ট ভগ্ন মন্দিরের অভ্যন্তরে। তাদের দেখাদেখি দলের আরও দু'একজন আশ্রয় নিল এই মন্দিরে। দলের বাকিরা কোথায় গেল কে জানে!

একদা এটি শিবমন্দির ছিল। এখন এর দশা দেখে মনে হয়, প্রকৃতি নয়, মানুষই এর এমন অঙ্গহানি করেছে। শিবলিঙ্গটিও নিশ্চিহ্ন। শোনা যায়, কালাপাহাড় নামে এক অত্যাচারী সেনাপতি এ অঞ্চলের বহু মন্দিরের ধ্বংসসাধন করেছে।

শিবিকার ভিতরের দুই রমণী এখনও পর্যন্ত কোনো রকম উদ্বেগ প্রকাশ করেনি। তাঁরা জানেন, প্রহরী ও বাহকদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা যথাযথ দায়িত্ব পালন করবে। এরকম ব্যবহার পেতেই তাঁরা অভ্যস্ত। কর্তব্যে বিচ্যুতির জন্য এইসব অন্নদাসদের যখন-তখন মৃত্যুদণ্ডের মতন কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

কিছু পরে ঝড় প্রশমিত হল, বৃষ্টির তেজ রইল আরও কিছুক্ষণ। তারপর প্রায়ান্ধকার মন্দিরের মধ্যে আলো প্রবেশ করতেই বোঝা গেল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

এর মধ্যে পলাতকদের আরও কয়েকজন ফিরে এসেছে। বল্লভরামের নির্দেশে তারা শিবিকা উত্তোলন করে বেরিয়ে এল বাইরে। এত বৃষ্টির ফলে বাতাসে একটা শিরশিরানির ভাব এসেছে। এক সঙ্গে ডাকছে অনেক পাখি, সেই ডাকের মধ্যে বিপদমুক্তি ও আনন্দের সুরটি ঠিক বোঝা যায়।

মন্দির সংলগ্ন আরও কয়েকটি কোঠা রয়েছে একই রকম ভাঙা অবস্থায়। তার একটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ-ছ'জন পুরুষ। সম্ভবত তারাও ঝঞ্ঝা-বজ্রের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য এখানে আশ্রয় নিয়েছিল।

তাদের মধ্যে একজন বল্লভরামের দিকে চেয়ে হেঁকে বলল, কোন দিকে যাবেন গো কত্তা? উফ্, কী দুর্যোগই না গেল, বাপরে বাপ।

অচেনা মানুষদের গন্তব্যস্থান জানাতে নেই। তাই বল্লভরাম গম্ভীরভাবে বলল, যাব পশ্চিম দিক পানে।

লোকটি বলল, আমরাও তো ওই দিকেই যাব। চলেন না এক সঙ্গে যাই। দিনকাল ভালো না।

এই সব গ্রাম্য লোকদের কথা বলার উপযুক্ত বোধ করে না বল্লভরাম। সে গম্ভীরভাবে বলল, আমরা রাজার সেপাই, আমাদের সঙ্গী লাগে না। তোমরা নিজেদের পথ দেখো।

কাছেই একটা গাছে বাঁধা রয়েছে একটা ঘোড়া। তার দু'দিকে ঝুলছে দু'টি লম্বা পেটিকা। ঘোড়াদের গায়ে কি বাজ পড়ে না? বজ্রপাতে মানুষ মরতে দেখা গেছে। গরু-ঘোড়া মরতে তো সচরাচর দেখা যায় না!

সেই লোকটি এক লম্ফে অশ্বটির পৃষ্ঠে আরোহণ করে এদিকেই এসে বলল, রাগ করেন কেন কত্তা? ভালো কথাই তো বলেছি। সবাই মিলে এক সঙ্গে গেলে জোর বাড়ে। কয়দিন আগেই তো গাবাইয়ার মাঠে একটা ডাকাইতি হয়ে গেল।

অশ্বারোহী আর পদাতিকের মধ্যে একটা বড় প্রভেদ থাকেই। পদাতিককে ওপরের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হয়, তাতেই যেন সে হীন হয়ে যায়। বল্লভরামের অনেক দিনের সাধ রাজার অশ্বারোহী বাহিনীতে উন্নীত হওয়ার। কিন্তু কেউ একজন কলকাঠি নাড়ছে তাই সে ছোট কুমারের নেকনজরে পড়তে পারছে না।

কোনো উত্তর না দিয়ে সে তার বন্দুকে একটি আঙুল স্পর্শ করল। কোনো ডাকাত দলেরই এখনও আগ্নেয়াস্ত্র নেই।

অশ্বারোহীটি বক্রভাবে হেসে বলল, সেপাইজি, এই বৃষ্টিতে আপনি পাঁঠাভেজা ভিজেছেন দেখছি। টোটা-বারুদ সামলে রেখেছেন তো? ওই সামনের গাছে দেখেন দু'টি পক্ষী বসে আছে। পরীক্ষা করে দেখেন না, একটারেও মারতে পারেন কি না।

এই প্রগল্‌ভতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বল্লভরাম জোর গলায় বলল, সামনে থেকে সরে দাঁড়া, আমরা যাব।

শিবিকাবাহকদের ধমক দিয়ে বলল, তোরা হাঁ করে দেখছিস কী? চল, চল, বেলা পড়ে এল।

অশ্বারোহী বলল, খাড়ান, খাড়ান। এত তাড়া কীসের? আপনারে দেখে তো মনে হয় মানী লোক। কুটুমবাড়ি যাচ্ছেন নাকি? সঙ্গে মণ্ডা-মেঠাই কিছু আছে? বড় ভুখ লেগেছে আমার।

বল্লভরাম বলল, না, ওসব কিছু নাই। তোর সাহস তো কম নয়, তুই আমাদের দেরি করিয়ে দিতেছিস।

লোকটি এবার কৃত্রিম করুণ গলায় বলল, বড় ভুখ লেগেছে যে। কিছু তো দেবেন!

এবার শিবিকার পর্দাটা একটু ফাঁক হল, সেখান থেকে একটি হাত বেরিয়ে বাইরে ছুড়ে দিল একছড়া কলা।

লোকটি আবার হা-হা করে হেসে বলল, কলা? আমাদের কি বান্দর ঠাউরেছেন নাকি?

তার অন্য সঙ্গীরাও এখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাদের দিকে তাকিয়ে লোকটি হুকুমের সুরে বলল, ওরে দেখ না, ওই পালকির মধ্যে কী আছে?

বল্লভরাম বলল, এই বেয়াদপ! সাবধান।

লোকগুলি বল্লভরামের তর্জন গ্রাহ্যই করল না। তাদের দু'জন এগিয়ে গেল শিবিকার দিকে। এখন শিবিকাবাহকদের মধ্যে ছ'জন বর্শাধারী, তারা রুখে দাঁড়াল।

ঘোড়াটির দু'দিকে যে দু'টি পেটিকা ঝুলছিল, অন্য লোকগুলি সেই পেটিকা খুলে বার করল কয়েকটি ছুরিকা, খঞ্জর আর দু'টি তলোয়ার। একটি তলোয়ার উঠে এল অশ্বারোহীর হাতে।

বল্লভরাম বন্দুক উঁচিয়েও তা ব্যবহার করতে পারল না। বারুদ একেবারে কাদা হয়ে গেছে।

অশ্বপৃষ্ঠে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা তলোয়ারধারীটি অনায়াসেই বল্লভরামকে হত্যা করতে পারত। কিন্তু তার বদলে কৌতুকছলে সে বল্লভরামের চতুর্দিকে ঘোড়াটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার ঘাড়ে ও কোমরে

তলোয়ারের অগ্রভাগ স্পর্শমাত্র দিয়েই সরে যেতে লাগল, সেই সঙ্গে হা-হা অট্টহাস্য। তারপর বর্শাধারী প্রহরীদের বলল, ওহে নিধিরামের ভাইয়েরা, বাড়ির বউদের যদি বিধবা করতে না চাও, তা হলে একপাশে সরে দাঁড়াও।

প্রহরীদের মধ্যে একজন এই শাসানিতে ভয় পেল না, সে বর্শা তুলে শিবিকা রক্ষা করা জন্য অটল রইল। একজন দস্যু তার কাছাকাছি আসতেই সে বর্শাফলক ঢুকিয়ে দিল তার এক উরুতে।

অশ্বারোহীটি এবার তার কাছে এসে ভয়ানক মুখভঙ্গি করে বলল, অরে পুঙ্গির পুত, দেখি তোর ঘেঁটিখান কত শক্ত!

সে মারল সেই বর্শাধারীর ঘাড়ে এক তলোয়ারের কোপ। আঘাতটি ঠিক নরহত্যার মতন জোরালো না হলেও লোকটি আহত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আর বাধা দেওয়ার কেউ রইল না।

দু'জন দস্যু এক টানে সরিয়ে দিল শিবিকার পর্দা।

ওরা ঠিকই অনুমান করেছিল, শিবিকার মধ্যে দুই রমণী ছাড়াও রয়েছে কয়েকটি মাটির পাত্র ভর্তি নানাবিধ উত্তম মিষ্ট দ্রব্য, আতপ চাল, দু'টি কোরা ধুতি ও ফলমূল ইত্যাদি। এঁরা যাচ্ছেন একটি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে, এই সব দ্রব্য সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই প্রথা।

দস্যুদল মহা উল্লাসে তখুনি একটি মাটির পাত্রের ঢাকনা খুলে পাতক্ষীর খেতে লাগল বুভুক্ষুর মতন। তাদের নাক-মুখ সেই মিষ্টান্নে মাখামাখি হল। এমনকী একজন এক খাবলা তুলে নিয়ে রুদ্ধবাক বল্লভরামের মুখেও জোর করে ভরে দিল।

অশ্বারোহীটি বলল, গয়নাগাঁটি কী আছে দেখ। স্ত্রীলোক দু'টিকে টেনে বার কর।

বল্লভরাম হাত জোড় করে কম্পিত কণ্ঠে বলল, ভাই, জিনিসপত্র যা নেবার নেও, অনুগ্রহ করে আমাদের রানিদিদির মান নষ্ট কোরো না। তোমার পায়ে ধরি। এইটুকু দয়া কর...

অশ্বারোহী ভুরু কুঁচকে বল্লভরামের অনুরোধ শুনল। তারপর দলের লোকদের বলল, বার কর। বার কর!

একজন দস্যু স্বর্ণময়ীর হাত ধরতেই তার দাসী কেঁদে উঠে বলল, ওনারে ধরবেন না, ধরবেন না। আমাগো সঙ্গে আর কিছু নাই।

দস্যুটি দাসীর কান্না অগ্রাহ্য করে স্বর্ণময়ীকে টেনে বার করতে যেতেই

বল্লভরাম ছুটে এসে লোকটিকে জাপটে ধরে বলল, ছাড়, ছাড়, তোগো ধর্মভয় নাই? বিধবার গায়ে হাত দ্যাস!

সে লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লভরামের পেটে একটি ছুরি বসিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে বেরলো রক্ত, বল্লভরাম পড়ে গেল মাটিতে।

অন্য দু'জন দস্যু স্বর্ণময়ীকে টেনে এনে দাঁড় করাল বাইরে। তিনি এর মধ্যে ঘোমটায় ঢেকে ফেলেছেন সম্পূর্ণ মুখ। একটি শব্দও উচ্চারণ করছেন না। তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে চিন্তাদাসী।

অশ্বারোহীটি বলল, ওরে, কেউ ঘোমটাটা টেনে খুলে দে। চন্দ্রবদনখানি একবার দেখি।

স্বর্ণময়ী একটুও বাধা দিলেন না, প্রস্তরমূর্তির মতন স্থির রইলেন। তার মুখের আবরণ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

অশ্বারোহী বিস্মায়িত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সেই বিদ্যুল্লতার দিকে।

তারপর সে চরম আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, চন্দ্রবদন কী বলেছি, এ যে চাঁদের চেয়েও সুন্দর। আজ সকালে ঠাকুরকে পুজো দিয়ে বেরিয়েছি। ঠাকুর দয়া করেছেন। এমন রমণীরত্ন পেলে আর সব কিছু তুচ্ছ!

চিন্তাদাসী এবার হাত জোড় করে বলতে লাগল, হে ভগবান, রক্ষা করো। আমাদের মান বাঁচাও। এই পাপীদের তুমি শাস্তি দাও! ভগবান—

কান্নায় তার গলা চিরে গেল।

লুণ্ঠনকারী এবং লুণ্ঠিত, এই দু'পক্ষই ঠাকুরকে স্মরণ করছে।

অশ্বারোহী এবর বলল, ওরে দনু, ওরে ফাগু, এই স্ত্রীলোকটাকে তোর আমার ঘোড়ায় তুলে দে। আমার আর কিছু চাই না। বাকি যা আছে, তোরা সব ভাগ করে নে।

স্বর্ণময়ী এবারেও কোনো বাধা দিলেন না। তাঁর দু'চক্ষু দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিঃশব্দ অশ্রু। চিন্তাদাসী তাকে জোর করে ধরে রাখতে চাইল, অন্য দু'জন টানাটানি লাগিয়ে দিল।

এক বিগ্রহহীন ভগ্ন মন্দির। জনশূন্য প্রান্তর। কিছু দূরে একসার বৃক্ষ, বেশ ঘন। এত বর্ষণের পর সব দিকে একটা স্নিগ্ধ ভাব। যেন পৃথিবীতে এই মুহূর্তে কোথাও কোনো অশান্তি নেই।

বৃক্ষশ্রেণি ভেদ করে বেরিয়ে এল দু'জন অশ্বারোহী। দু'জনেরই যুবা বয়স,

উত্তম পোশাকে সজ্জিত। একজন কিছুটা স্থূলকায়, মস্তক কেশবিরল, অন্যজন মেদহীন, সুদৃঢ়, যেন ইস্পাতে গড়া। দু'জনেরই মুখে চাপা দাড়ি।

ধীরগতিতে অশ্বচালনা করে এরা কথোপকথনে রত। মন্দিরের দিকে নয়, এরা চলেছে বিপরীত দিকে। এমন সময় নানা কণ্ঠস্বর, বিশেষত একজন স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি তাদের কানে এল।

স্থূলকায় ব্যক্তিটির নাম দায়ুদ, অন্যজনের নাম ইশা। দায়ুদ বলল, ওইখানে আবার কীসের গোলযোগ, ওই মন্দিরে তো কেউ পূজাটুজা দিতে আসে না!

ইশা বলল, আমি এই পথ দিয়ে যাতায়াত করি, কোনোদিন জনমনুষ্য দেখি না।

দায়ুদ বলল, চলো, একবার দেখে আসবে নাকি?

ইশা বলল, প্রয়োজন কী! আমাকে গোলাবাড়ি যেতে হবে অবিলম্বে।

এই সময় দূরাগত রমণীকণ্ঠের ক্রন্দনরোল আরও তীব্র হওয়ায় দায়ুদ বলল, না, চলো, একবার দেখেই আসি!

দুই দস্যু চিন্তাবাসীকে এর মধ্যে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। তারপর তারা স্বর্ণময়ীকে তোলার চেষ্টা করছে অশ্বপৃষ্ঠে। অশ্বারোহীটি এক হাত বাড়িয়ে ধরেছে স্বর্ণময়ীকে।

কাছে এসেই নাবাগত অশ্বারোহীদ্বয় বুঝে গেল কী কাণ্ড চলছে এখানে।

দায়ুদ হুংকার দিয়ে বলল, এই থাম, থাম! যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তো...

অশ্বরোহী দস্যুটি স্বর্ণময়ীকে পাওয়ার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে ওই সাবধানবাণী গ্রাহ্যই করল না। নারীটিকে অশ্বপৃষ্ঠে তোলার জন্যই ব্যস্ত রইল।

চিন্তাদাসীর শরীর একজন দস্যু পা দিয়ে চেপে রেখেছে, সেই অবস্থাতেইও সে আগন্তুক অশ্বারোহীদের দেখে কেঁদে উঠল, বাঁচান, বাঁচান।

দায়ুদ ও ইশা দুজনেই তরবারি কোষমুক্ত করল।

এবার শুরু হয়ে গেল লড়াই।

দস্যুদের মধ্যে অশ্বারোহীটিই অসিচালনা জানে, কিন্তু ইশার দক্ষতার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। অত্যল্পকালের মধ্যেই ইশা ওর অস্ত্র ধরা হাতটির ওপর এমন আঘাত করল যে, দু'টি আঙুল কর্তিত হল এবং সে খসে পড়ল মাটিতে।

দায়ুদ অন্যদের সামলাচ্ছিল, হঠাৎ দস্যুদের মধ্যে একজন ইশাকে চিনতে পেরে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, উরিব্বাস রে, কার পাল্লায় পড়েছিস রে পবন, এ যে স্বয়ং যমদূত! পালা, পালা, পালা—। চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা।

সঙ্গে সঙ্গেই তারা কোনো কিছু না নিয়েই পিঠটান দিল।

দায়ুদ আর ইশা এবার অশ্ব থেকে নামল মাটিতে।

এই দলে নিহত হয়নি কেউ, আহত হয়েছে দু'জন। যারা সুস্থ অথচ ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ছিল, তারা এবার এই দুই অপরিচিতকে ঘিরে ধরে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল প্রাণভরে।

দায়ুদ ও ইশা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাস্য করল। দায়ুদ বলল, লড়াই তো জমলই না। যত সব কাপুরুষের দল। ওদের আরও শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। তোমার মুখ দেখেই ভয়ে পালাল।

স্বর্ণময়ী নিথরভাবে দণ্ডায়মান। চিন্তাদাসী উঠে এই দু'জনের কাছে এসে বলল, ভগবান আপনাদের পাঠিয়েছেন। আমার প্রার্থনা বৃথা যায়নি। আপনারা দেবদূত! ভগবানের আশীর্বাদে আপনারা ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ করবেন।

কৌরবসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের অসম্মানের সময় কৃষ্ণ এসে তাঁর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন। সম্ভবত সেই ছবিটিই চিন্তাদাসীর মনে ভাসছে। এক্ষেত্রে অবশ্য কৃষ্ণের বদলে যারা এসেছে তারা মুসলমান। ভগবান যে কখন কোন রূপে তাঁর দূতদের পাঠান, তা কে বলতে পারে!

এই সব প্রশংসা ও স্তুতিকে পাশ কাটিয়ে ইশা জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাচ্ছিলেন?

বল্লভরাম ক্ষতস্থান চেপে ধরে কোনোক্রমে উঠে এসেছে। সে বলল, হুজুর, আমরা আসছি শ্রীপুরের রাজবাড়ি থেকে। এই রমণী রাজা চাঁদ রায়ের কন্যা, অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। ওঁকে আমরা ওঁর শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলাম। ওঁর শ্বশুর এতকাল বেঁচেছিলেন, সদ্য গত হয়েছেন। খুব ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ উৎসব হচ্ছে। সেখানে যোগ দিয়ে দশ দিন পর আমাদের ফিরে আসার কথা। এমন ঝড়বৃষ্টি না হলে এই ডাকাতদল আমাদের কিছুই করতে পারত না।

চিন্তাদাসী স্বর্ণময়ী বিস্রস্ত শাড়ি ঠিক করে দিয়ে মুখমণ্ডল ঘোমটা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। তার ঠিক আগেই ইশা দেখলেন রমণীটিকে। সে একটি কথাও বলেনি। কৃতজ্ঞতাও জানায়নি। কিন্তু তার দৃষ্টিতে অনেক ভাষা আছে, সেই ভাষাতেও অনেক জাদু আছে, সেই জাদুতেও যেন রয়েছে গহন অরণ্যের রহস্য।

ইশা একবার ভাবল, সে যদি নিজে থেকে কিছু বলে, তবু কি এই রমণী

উত্তর দেবে না?

সে বলল, আপনার আর কোনো ভয় নেই। শিবিকায় গিয়ে বসুন।

এবারেও সেই রমণী একটিও শব্দ উচ্চারণ করল না।

বল্লভরাম অতি কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, হুজুর, আপনারা কে? এমন মহদুপকারীর পরিচয় জানতে পারি কী?

দায়ুদ বলল, তেমন কিছু পরিচয় নেই। আমরা এমনিই পথিক। তোমরা এবার যাত্রা করো। তুমি হাঁটবে কী করে? ওই তস্করগুলো তাদের ঘোড়াটা ফেলে গেছে। তুমি বরং ওর ওপরেই কোনোক্রমে যাও।

বল্লভরাম কাঁচুমাচু ভাবে বলল, হুজুর, আর একটা নিবেদন আছে। আমাদের রানিদিদি উচ্চ বংশের হিন্দু কন্যা। এবং বিধবা। হিন্দু বিধবাকে যদি কোনো পরপুরুষ স্পর্শ করে, তবে তার জাত যায়। আজিকার ঘটনা যদি কেউ জানতে পারে, অর্থাৎ, আপনাকে আর কী বলব...

ইশা বলল, বুঝেছি। কেউ জানবে না। তোমরা নিশ্চিন্তে যাও।

দায়ুদ আর ইশা অপেক্ষা না করে নিজস্ব পথ ধরল। খানিক পথ যাওয়ার পর ইশা বলল, দায়ুদ, হিন্দু নারী বিধবা হলে কি তারা আর শ্বশুরালয়ে যায়? আমি তো শুনেছিলাম, সব সম্পর্ক ঘুচে যায়।

দায়ুদ বলল, কী জানি। হিন্দুদের নানান নিয়মপ্রথা আমার জানা নাই।

একটু থেমে, মৃদু হাস্য করে সে আবার বলল, দোস্ত, ওই যে রমণীর মুখখানি দেখলে, ওই মুখ যদি তোমার পরানে গেঁথে যায়, তা হলে কিন্তু তোমার সুখ-শান্তি সব নষ্ট হবে। যত শীঘ্র সম্ভব ভুলে যাও। সামনে আমাদের অনেক কাজ...।

দুই

গৌড়বঙ্গে হিন্দু রাজবংশের পতনের পর পাঠান সুলতানগণ রাজত্ব করেছে দীর্ঘদিন। তারপর মোগলরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আসে। পাঠান ও মোগলদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে বেশ কিছু বছর। হুমায়ুন বাদশার মৃত্যুর পর আকবর নামে তাঁর বালক পুত্র দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে, তার আমলেই মোগল শাসন সারা ভারতের অনেক স্থানে বিস্তৃত হয়।

বঙ্গে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা মোটেই সহজ হয়নি। মোগলদের সৈন্যবাহিনী

অনেক শক্তিশালী, কিন্তু পাঠানরা এক একবার যুদ্ধে পরাজিত হলেও সম্পূর্ণ হার মানেনি। তারা ওড়িশার দিকে পলায়ন করে পাহাড়-জঙ্গলে কিছুকাল ঘাপটি মেরে বসে থেকে আবার হঠাৎ হঠাৎ মোগলদের ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ করেছে। মোগলরা এক স্থানে দুর্গ বানিয়ে বসে থাকলেও এই অজস্র নদী-নালার দেশ তাদের কাছে অপরিচিত। কিছু কিছু নদীর চরিত্রও অতি সাংঘাতিক, গ্রীষ্মকালে মৃতবৎ পড়ে থাকে, অনায়াসে পারাপার করা যায়। আবার বর্ষার সময় এমন প্রবল সংহার মূর্তি ধারণ করে যে, মোগল সৈন্যরা পালাতেও সময় পায় না। শত্রপক্ষ ব্যবহার করে নৌবাহিনী, মোগল অশ্বারোহীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবনেও অক্ষম। এইসব নদী যেন গ্রীষ্মকালে ছদ্মবেশ ধরে থাকে।

এই নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ, লুঠতরাজ, বিশ্বাসঘাতকতা, অতিশয় নির্মম গণহত্যার কারণে এই সুজলা-সুফলা দেশটিতে সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা চলছে। সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির কোনো নিরাপত্তা নেই। চতুর্দিকে এত হিংসা, সেই হিংসা ব্যক্তিগত স্তরেও নেমে আসে।

মোগল-পাঠানে যুদ্ধবিগ্রহ তো চলছেই, তা ছাড়াও আছে আরও অন্যান্য উপদ্রব। সুদূর সমুদ্র পেরিয়ে ফিরিঙ্গি পর্তুগিজরা এসে ঘাঁটি গেড়েছে চট্টগ্রামে, গ্রামবাংলাতেও তারা হামলা চালায়। আরাকানের রাজাও বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়েছে, তারও লোভ বঙ্গের কিছু কিছু অংশ নিজ রাজত্বের সঙ্গে যুক্ত করার। আরাকানের সৈন্যরা দুর্ধর্ষ, কখনও এরা এগিয়ে এসে চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে দিয়ে সন্দ্বীপ নামে সমৃদ্ধ অঞ্চলের দিকে হাত বাড়ায়। এরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, বৌদ্ধ। কিন্তু নিষ্ঠুরতায় এরা সেই মহান ধর্মে কলঙ্ক লেপন করেছে। এরা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের বন্দি করে নির্বিচারে বলি দেয়, শুধু ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকেই রেয়াত করে না। এবং শোনা যায়, নরবলি দিয়ে এরা সেই মাংস ভক্ষণও করে।

এই অরাজকতার সুযোগ নিয়ে এ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু জমিদারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নিজেদের জমিদারি এবং প্রজাদের ধন-প্রাণ রক্ষা করার জন্যই এরা নিজস্ব দুর্গ গড়ে নিয়েছে, নিজস্ব সৈন্যবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। মোগল-পাঠানদের তুলনায় এই সব জমিদারদের সৈন্যরা বাঙালি, এরা অনেকেই নৌচালনায় দক্ষ, তাই ছোট ছোট যুদ্ধজাহাজ গড়ে নিয়ে এরা পর্তুগিজদের যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গেও লড়াইয়ে টেক্কা দিতে পারে।

এই সব জমিদারদের প্রচলিত নাম বারোভুঁইয়া। ভুঁইয়া অর্থে ভৌমিক অথবা ভূমিদার। এদের সংখ্যা যে সবসময় বারো জন, তাও নয়, কখনও কম কখনও বেশি। এদের মধ্যে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। পূর্বে এরা রাজ্যশাসকদের কর ও নজরানা দিত। শাসনব্যবস্থা শিথিল হয়ে যাবার পর কিংবা তা প্রয়োগ করার কেউ না থাকায় এরা কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে স্বাধীন হয়ে গেল। এবং সেই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য এদের অনবরত যুদ্ধও করতে হয়েছে। অবশ্য, স্বাধীনতা শব্দটির যে-অর্থ হয়েছে পরবর্তীকালে, এদের সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না, সারা দেশের কথা এরা কখনও ভাবেনি, এই স্বাধীনতার অর্থ শুধু স্বার্থরক্ষা। এরা নিজেদের বলত রাজা।

বারোভুঁইয়াদের নিজেদের মধ্যেও কোনো ঐক্য ছিল না। ঐক্য বা একতা শব্দও তখন অজ্ঞাত। এরা নিজেদের মধ্যেও লড়ালড়ি করেছে অনেকবার, অপরের জমিদারির অংশ গ্রাস করার জন্যও লোলুপ হয়েছে। যুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে একপক্ষ সন্ধির জন্য ব্যগ্র হয়ে সাময়িক শান্তি অর্জন করেছে, আবার সেই সন্ধির শর্ত ভাঙতেও দেরি হয়নি।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলার ভুঁইয়াদের মধ্যে প্রধান ছিল তিনটি পক্ষ। যশোর অঞ্চলের প্রতাপাদিত্য, সোনার গাঁ ও ভাটি অঞ্চলের অধীশ্বর ইশা খাঁ এবং বিক্রমপুরের পিতা-পুত্র চাঁদ রায় ও কেদার রায়। প্রতাপাদিত্য তাঁর সৈন্যবাহিনী আর জমিদারির আয়তনে যথেষ্ট শক্তিমান ছিলেন ঠিকই, কিন্তু মানুষটি অতি নিষ্ঠুর, কর্কশভাষী ও আত্মম্ভরী বলে অন্য ভুঁইয়ারা তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। আর ইশা খাঁ সামান্য অবস্থা থেকে অতিদ্রুত অনেকখানি অঞ্চল অধিকার করে ফেলেছেন, তাই তাঁর খ্যাতি অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদ রায়ের বিক্রমপুরের রাজধানী খুবই সমৃদ্ধ নগর। সেখানকার উত্তম কার্পাস বস্ত্র চিন দেশেও রফতানি হয়। শ্রীপুরের কর্মকাররা বৃহৎ তোপ নির্মাণ করতে পারে। সেই তোপসজ্জিত যুদ্ধ জাহাজ অনেক স্থানীয় যুদ্ধে জয়ী হয়েছে।

চাঁদ রায় যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর অতীব স্নেহের কন্যা স্বর্ণময়ীর বেশ ভালো কায়স্থ বংশে, মালখা নগরের বিখ্যাত বসু পরিবারে বিবাহ হয়। মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই তার স্বামীর মৃত্যু হয় সর্পদংশনে, হতভাগিনী স্বর্ণময়ী ফিরে আসে পিত্রালয়ে। নয় বৎসরের কন্যার বৈধব্যবেশ দেখে চাঁদ রায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন মাটিতে। তারপর থেকে তাঁর শরীর আর পুরোপুরি

সুস্থ হয়নি। অধিকাংশ সময় শয্যাশায়ীই থাকেন। সেই স্বর্ণময়ী এখন পূর্ণ যুবতী, অতি শুদ্ধাচারে তিনি শুধু অন্তঃপুরেই থাকেন, পিতার সেবা করেন। হিন্দু বিধবাদের কৃত্য অনুযায়ী তিনি অন্নগ্রহণ করেন একবেলা, প্রতি রাত্রে উপবাস। কন্যার এই অবস্থা দেখে এখনও চাঁদ রায়ের বুকে হাহাকার হয়, আবার তার ব্রত-নিয়ম পালনে নিষ্ঠা দেখে গভীর তৃপ্তিও বোধ করেন। তিনিও রাত্রে কিছু আহার করেন না।

রাজ্য পরিচালনা করেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র কেদার রায়। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনিই প্রকৃতপক্ষে রাজা, কিন্তু পিতা এখনও জীবিত বলে প্রজারা তাঁকে কুমার সম্বোধন করে। স্বাস্থ্যবান ও রূপবান কেদার রায় যুদ্ধবিদ্যাতেও বেশ যশস্বী। লোকে তাঁর সঙ্গে ইশা খাঁর তুলনা করে। ইশা খাঁ কেদারের প্রায় সমবয়েসি, শরীর সম্বন্ধে ও ব্যক্তিত্বে তিনি কেদারেরই সমকক্ষ, শুধু অসি চালনায় তাঁর দক্ষতা অনেক বেশি, এ অঞ্চলে কেউ তাঁর সামনে দাঁড়াতেই পারে না। একবার এই ইশা খাঁ মোগল সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে তলোয়ার হাতে দ্বৈরথে মেতেছিলেন। সেই যুদ্ধে মানসিংহকেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

সেবারের ঘটনাটি এখনও লোকমুখে ঘোরে। উভয়পক্ষের যুদ্ধের মাঝখানে ইশা মানসিংহকে সম্মুখসমরে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মানসিংহের বীরত্বের খ্যাতি ভারতজোড়া। তিনি রাজি হবেন না কেন? অশ্বপৃষ্ঠে শুরু হয় দু'জনের অস্ত্র যুদ্ধ। একটু পরেই মানসিংহের হাত থেকে তরবারিটি খসে পড়ে যায়। যারা দর্শক ছিল, তারা ভয়ের শব্দ করে উঠেছিল। যুদ্ধে দয়া-মায়ার স্থান নেই, এই রকম অবস্থায় ইশা খাঁর তরবারির মানসিংহের বক্ষ ভেদ করাই স্বাভাবিক ছিল। ইশা খাঁ তা করলেন না, নিজের তরবারিটি মানসিংহের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, মহারাজ, এটা নিন। আমি আর একটি আনতে বলছি, আবার যুদ্ধ চলুক।

সে-প্রস্তাব শুনে অভিভূত মানসিংহ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে ছুটে এসে ইশা খাঁকে আলিঙ্গন করলেন। দু'পক্ষে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে তিনি এই মহান বীর যুবককে সসম্মানে আগ্রায় নিয়ে গেলেন সম্রাট আকবরকে দেখাবার জন্য। আকবরও ইশা খাঁকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করে নানা দ্রব্য উপহার দিয়েছিলেন।

এ ঘটনা কয়েক বৎসর আগেকার। এখন সেই সন্ধিচুক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কৃতজ্ঞতা, মানবতাবোধ এই যুদ্ধবিগ্রহের দিনে বেশি দিন মনে রাখলে

চলে না। সম্রাট আকবর দ্বিতীয়বার মানসিংহকে পাঠালেন সুবে বাংলায়, যাতে বিদ্রোহী, দুঃসাহসী এইসব ছোট ছোট জমিদারদের সম্পূর্ণ পরাভূত ও পদানত করা যায়। মানসিংহ বারোভূঁইয়াদের দমন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন, ইশা খাঁর রাজত্বও তাঁর গ্রাসের তালিকায় আছে।

ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের রাজ্য প্রায় পাশাপাশি বলা যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্তমানে প্রতিবেশীদের মধ্যে রেষারেষি, কলহ ও পরস্পরের জমি দখলের লড়াই নিরন্তর চললেও, এই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কোনোরূপ বিদ্বেষের সম্পর্ক নেই। কেদার ও ইশা খাঁর সম্পর্ক বন্ধুত্বের। এক জনের রাজ্য কোনো বহিঃশত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্য জন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আরাকান রাজার বাহিনীর বিরুদ্ধে কেদার ও ইশা খাঁ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের সময় ছাড়াও দুই বন্ধুর মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ ও হাস্য-পরিহাস বিনিময় হয়।

ইদানীংকালে দলে দলে হিন্দু ধর্মান্তরিত হচ্ছে, কিছুটা ভয়ে ও জোরজুলুমে, কিছুটা পাঠান-মোগল শাসক শক্তির অনুগ্রহ পাওয়ার আশায়, কিছুটা স্বধর্মেরই গোঁড়ামি, জাত-পাতের বিচার ও সমাজ শিরোমণিদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে। পাঠান শক্তি যখন প্রথম গৌড়বঙ্গে আসে, তখন মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল মুষ্টিমেয়, এখন তাদের সংখ্যা শত শত গুণ বৃদ্ধি হয়েছে, এখন গ্রামের পর গ্রাম মুসলমানপ্রধান। যে সমস্ত হিন্দু নিজেদের জাত ও সনাতন ধর্ম ত্যাগ করতে চায় না, তারা শঙ্কিত অবস্থায় দিন যাপন করে। হিন্দু রাজারা ক্রমশই ক্ষমতা হারাচ্ছে, তখন আর তাদের প্রজাদেরও ধর্মীয় নিরাপত্তা থাকে না।

বিক্রমপুর ও সোনার গাঁওয়ের পরিবেশ একেবারে অন্যরকম। রাজার আচরণের প্রতিফলন প্রজাদের মধ্যেও পড়ে। দুই রাজ্যের রাজা হিন্দু ও মুসলমান হলেও তাদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক দেখে প্রজারাও আর ধর্মবিদ্বেষ করে না। যে যার নিজের ধর্ম আচরণ করুক, তাতে কোনো বিরোধ নেই। মন্দির-টোল থাক, মসজিদ-মাদ্রাসাও থাক। কেউ যদি স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হতে চায়, তাতেও কেউ বাধা দেবে না। অবশ্য ধর্মান্তর শুধু একমুখী, হিন্দুরাই শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারে, মুসলমানের সে প্রশ্নই নেই। দৈবাৎ কোনো মুসলমান যদি হিন্দু হতেও চায়, হিন্দু সমাজ তাকে সে অধিকার দেবে না। এমনকী, কোনো হিন্দু যদি একবার মুসলমান হবার পর আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে চায়, সেও বিতাড়িত হবে। কোনো মুসলমানের গৃহে অন্নগ্রহণ

কিংবা কেউ যদি নিজের অজান্তে গোমাংস রন্ধনের ঘ্রাণও নিয়ে ফেলে, তাহলেও তার জাত যাবে। যে-জাতি এককালে উচ্চাঙ্গ বিদ্যা ও দর্শনে সমৃদ্ধ ছিল, বর্তমানে তার কী দশা! যুক্তিহীন কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, শ্রেণিবৈষম্য, উচ্চশ্রেণির অন্ধ স্বার্থপরতায় দীর্ণ হিন্দু সমাজে শুধু ভাঙনের পথই প্রশস্ত, সংস্কার কিংবা নতুন আদর্শ গ্রহণের কথা কেউ চিন্তা করে না।

সারা দেশে যখন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সংঘর্ষ চলছে, তখন বিক্রমপুর এবং সোনার গাঁওয়ের মতো দু'টি ক্ষুদ্র রাজ্যে এমন ধর্মীয় সদভাব ও মৈত্রী কতদিন বজায় থাকতে পারে?

সন্দ্বীপের অধিকারের জন্য বিভিন্ন পক্ষ কতবার যে যুদ্ধে মত্ত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কখনও এই দ্বীপের কর্তৃত্ব কেদার রায়ের, কখনও পর্তুগিজদের, কখনও আরাকান রাজের। পর্তুগিজরা এঁটে উঠতে পারছে না আরাকান সৈন্যদের সঙ্গে। পর্তুগিজ সেনাপতি কার্ভালো কয়েকটি রণতরী সঙ্গে নিয়ে এসে যোগ দিয়েছে কেদার রায়ের অধীনে।

ইশা খাঁ আর কেদার রায় দু'জনেই আরাকান রাজের ঘোর বিরোধী। আরাকান রাজ চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ অধিকার করার পর লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাংলার অন্য অঞ্চলের আরাকানি সৈন্যদের বলে মগ, এই মগদের নৃশংসতার কোনো সীমা নেই বলে সাধারণ মানুষও এদের খুবই ভয় পায়। ওদিকে ত্রিপুরা এবং কোচবিহারের রাজার সঙ্গেও আরাকানিদের শত্রুতা। দেশটা যাতে মগের মুল্লুক না হয়ে যায়, সেই জন্য পর্তুগিজ সেনাপতি কার্ভালোকে নিয়ে ইশা খাঁ আর কেদার রায় দু'জনেই সমরে প্রবৃত্ত হলেন। দু'জনের সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই সাধারণ বাঙালি। তারা লাঠি, তরবারি, কামান-বন্দুক চালনাতে কুশলী হয়ে উঠেছে, নদীপথে ও স্থলযুদ্ধে সমানভাবে সাহসের পরিচয় দেয়।

বাঙালির বিক্রমে মগ বাহিনী পিছু হটে গেল।

উৎফুল্ল মনে ফেরার পথে ইশা খাঁ কেদার রায়ের নিজস্ব জলযানে এসে যোগ দিলেন পানাহার উৎসবে। অন্যান্য জলযানগুলিতেও বিজয়ী সেনারা আনন্দে মহা কোলাহল জুড়ে দিয়েছে। এই জলযানে কয়েকজন দাঁড়ি-মাঝি আর পাচক-সেবক ছাড়া অন্য কেউ নেই। কেদার রায় বেশি লোকের সঙ্গে কথা কওয়া পছন্দ করেন না।

এই তরণীতে দু'টি সুসজ্জিত শয়নকক্ষ ও একটি প্রশস্ত বৈঠকখানা। এর

মেঝেতে মখমল বেছানো, তার ওপর রয়েছে কয়েকটা উপাধান।

দু'পাশের গবাক্ষ দিয়ে দেখা যায় নদীতীরের চলন্ত দৃশ্য। যুদ্ধজয়ের কাহিনি এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। বহু মানুষ ছুটে এসেছে বাঙালি বীরদের সংবর্ধনা জানাতে। ইশা খাঁ ও কেদার রায় কিছুক্ষণের জন্য মানুষের সেই উচ্ছ্বাস দর্শন করেছেন। এখন শেখ কালু, রঘুনন্দন রায়, নেয়ামৎ, মামুদ রব্বানি, কালিদাস ঢালী, রামরাজা সরদার, পর্তুগিজ ফ্রানসিস এই সব সেনানীরা অন্যান্য রণতরীতে লম্ফঝম্ফ করছে। পর্তুগিজ কার্ভালো অবশ্য এসবে মন দেয় না, সময় নষ্ট না করে মদ্যপানে প্রবৃত্ত হয়।

ইশা খাঁ খাঁটি মুসলমান, তিনি মদ্য স্পর্শ করেন না। কেদার রায় শাক্ত, পূজা-পার্বণে কারণবারি পান করেন বটে কিন্তু নেশাসক্ত নন। উভয়ের হাতেই এখন রৌপ্যপাত্রে সিদ্ধি ও বাদম মিশ্রিত সুস্বাদু পানীয়। প্রথমে কিছুক্ষণ এই যুদ্ধের দু'একটি ঘটনা পর্যালোচনার পর প্রসঙ্গ উঠল রাজা মানসিংহ সম্পর্কে। মানসিংহ এবারে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, তা এঁরা দু'জনেই জানেন। এবারে তাঁর সৈন্যবাহিনী বিশাল, সেই বাহিনীতে বেশ কিছু যুদ্ধজাহাজও আছে, অর্থাৎ মোগলরা এখন নৌযুদ্ধেও প্রস্তুত। মানসিংহ সঙ্গে এনেছেন তাঁর দুই ছাত্রকে, তারাও নিপুণ যোদ্ধা, অর্থাৎ মোগল সেনাপতি এ-যাত্রায় পুরোপুরি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি না করে ফিরবেন না।

সম্মুখসমরে মানসিংহকে প্রতিহত করার কোনো আশাই নেই। তা এঁরা দু'জনেই জানেন। এর মধ্যে বারোভূঁইয়াদের কয়েকজন বিনা যুদ্ধে মানসিংহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছেন, মহারাজ প্রতাপাদিত্যও মোগলদের মিত্রতা চান নিজের অনেকখানি অধিকার হারিয়ে। বিক্রমপুর ও সোনার গাঁও নিয়েই এখন মানসিংহের শিরঃপীড়া।

ইশা খাঁ ও কেদার রায় দু'জনেই কয়েকটা বছর অন্তত স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছেন। পাঠান বা মোগল, কোনো পক্ষকেই কর দেননি, কারও অনুজ্ঞা মেনে চলতে হয়নি। স্বাধীনতার স্বাদই আলাদা। একবার সেই স্বাদ পেলে আর অন্য কারও কাছে মাথ নিচু করতে মন চায় না।

দুই রাজাই জানেন, মানসিংহকে পরাভূত করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। তবে যুদ্ধ শুরুর অল্পকাল পরেই শক্তিক্ষয় না করে যদি পলায়নের ভান করা যায়, যেন ভয়ে ভয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করছে বাংলার সৈনিকরা তখন জয়ী মোগল বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবেই। তখন তাদের টেনে নিয়ে যেতে হবে

গভীর জঙ্গল ও ভাটি এলাকায়। কেদার ও ইশা খাঁ সসৈন্যে আত্মগোপন করে থাকবে সম্পূর্ণ দু'দিকের দু'টি দ্বীপে। খাঁড়ির কাছাকাছি নদী-নালায় যখন মোগল বাহিনী দিক্‌ভ্রান্ত হবে, সেই সময় দু'দিক থেকে দুই বারোভুঁইয়া মোগলদের নাস্তানাবুদ করবে। তা ছাড়া কিছুকালের মধ্যেই নেমে আসবে বর্ষা, এই অঞ্চলের বর্ষা প্রথম মাসেই অতি প্রবল হয় এবং তার ফলে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাঙালিদের সেই কষ্ট সহ্য করার অভ্যেস আছে, কিন্তু উত্তর ভারতীয় মোগল সৈন্যরা তটস্থ হয়ে যাবে। এবং ওই সব অঞ্চলে আছে প্রচুর হিংস্র ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর। এই অবস্থায় মোগলদের প্রচুর শক্তিক্ষয় হতে বাধ্য, বাকি সৈন্যরাও আর যুদ্ধ করতে চাইবে না, নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত হবে। আর তারা ফিরে আসতেও রাজি হবে না। একমাত্র এই উপায়ে মোগল বাহিনীকে বিতাড়ন করা সম্ভব। অন্তত কিছুকালের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কিছুক্ষণ চলল এইসব আলোচনা।

কথাপ্রসঙ্গে অন্য বিষয়ও চলে আসে। ইশা খাঁ বাল্যবয়সে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পাননি কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অগ্রগণ্য হয়েছেন। কেদার রায় বাল্য ও কৈশোরে আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা করেছেন, সংস্কৃতও কিছুটা জানেন। দু'জনের মধ্যে নানান কাহিনির বিনিময় হয়। ইশা খাঁ রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান শুনতে খুব ভালোবাসেন। রামায়ণে রামচন্দ্রের পরম ভক্ত যে মহাবীর হনুমান, তাকে ইশা খাঁর পছন্দ, বারবার শুনতে চান তার কথা।

আজ হঠাৎ কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই তিনি কেদার রায়কে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা, রামচন্দ্র যে বান্দরদের রাজা বালিকে হত্যা করলেন পিছন থেকে, সেটাকে আপনি অন্যায় বলেছিলেন কেন? যুদ্ধের সময় তো শত্রুপক্ষকে যে-যেমন খুশি ভাবে মারতে পারে। আমরাও তো পিছন থেকে মারি, আপনিও মারেন!

কেদার বললেন, সেকালে যুদ্ধের রীতিনীতি অন্য রকম ছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে নানা রকম শর্ত ঠিক করা হত। সবাই সম্মুখযুদ্ধ করবে, সন্ধ্যার পর কেউ আর কাউকে আক্রমণ করবে না। নারী ও শিশুরা অবধ্য। কয়েক জায়গায় শর্ত লঙ্ঘন করাও হয়েছে যদিও—।

ইশা খাঁ আবার প্রশ্ন করলেন, বালি বধের পর তার পত্নী তো বিধবা হয়ে গেল। তবু তাকে সুগ্রীব বিবাহ করল কী ভাবে? মহাধার্মিক হনুমানও

আপত্তি করল না। তখনকার দিনে হিন্দু বিধবাদের কি বিবাহ হত?

কেদার বললেন, ওরা বানর, ওরা হিন্দু ছিল না কী ছিল কে জানে?

ইশা খাঁ বললেন, ওরা কি সত্যিই বান্দর? তা হলে মানুষের মতন কথা বলে কী করে? কেউ কেউ বেশ বিজ্ঞও বটে। বান্দররা কি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করতে পারে?

কেদার বললেন, অল্প বয়সে এ প্রশ্ন আমারও মনে জেগেছিল। আমি প্রশ্ন করেছিলাম পণ্ডিতমশাইকে। তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, আমরা এখন গাছে গাছে যেসব বানর দেখি, ওরা মোটেই সে রকম ছিল না। ওদের ঘর-বাড়ি ছিল। ওরা ছিল অনার্য। বানর অর্থে যারা বনে থাকে, কেউ কেউ বলে বা-নর, অর্থাৎ কুৎসিত নর। ওই অনার্যদের গায়ের রং খুব কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাই শুভ্র বর্ণের আর্যরা তাদের কুৎসিত বলত। অনার্য হলেও ওদের কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি কম ছিল না।

তা হলে রায় মহাশয় একটা কথা বলি, যদি কিছু মনে না করেন। আপনারা তো আর্য, তাই না!

অবশ্যই। আপনারাও তাই। আমাদের ধর্ম পৃথক হতে পারে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সকলেই আর্য বংশীয়। আপনাদের ধর্ম এসেছে আরব দেশ থেকে। আরবের মানুষরা তো আর্য বটেই।

আপনারা ভারতের হিন্দু আর্য। আপনাদের তুলনায় সেকালের অনার্যরা তো অনেক উন্নত ছিল মনে হয়। তাদের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল। আমরা মুসলমান আর্য, আমাদের মধ্যেও বিধবা নারীদের পুনরায় বিবাহের কোনো বাধা নেই। স্বয়ং পয়গম্বর এক বিধবাকে শাদি করেছিলেন। আপনারা কেন বিধবা নারীদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগই দেন না? সারা জীবন তাদের নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এ কী রকম আপনাদের ধর্মের বিচার?

কে বলল, আমাদের বিধবাদের সারা জীবন নির্যাতন সহ্য করতে হয়? তারা শুদ্ধাচারী হয়ে পূজা-আচ্চায় নিমগ্ন থাকে। পিতৃগৃহে তারা শিশু থেকে বৃদ্ধ, সবার সেবার ভার নেয়। সকলে তাদের এ জন্য শ্রদ্ধা করে। সর্বপ্রকার আর্দশ পালন করে তারা পরের জন্মে সুখী হয়।

রাজা, হিন্দু বিধবা নারীরা সংসারে বন্দিনী হয়ে বাইরের আলো-বাতাসের স্বাদ পায় না। কোনো পরপুরুষের মুখদর্শন করে না, কাহারও সঙ্গে কথা বলা তো দূরস্থান। জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ, সুখভোগ থেকে তারা বঞ্চিত।

অনেক প্রকার খাদ্যই তাদের নিষিদ্ধ। দু'বেলা অন্ন গ্রহণ করতেও পারে না। রঙিন বস্ত্র বা অলঙ্কার পরতে পারে না, বাধ্য হয়ে সংসারের আর সবার জন্য খেটে খেটে মরে, একে আপনি বলছেন আদর্শ? এর নাম শুদ্ধাচার? কই, হিন্দু পুরুষরা তো পত্নীবিয়োগের পর এসব কিছুই মানে না?

কেদার রায় ঈষৎ উত্তপ্ত হয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। আমাদের সমাজ নিয়ে আপনাদের এরকম মস্তক ঘর্মাক্ত না করলেও চলবে। তবে, হিন্দু বিধবাদের সম্পর্কে আপনি এত কথা জানলেন কী করে?

ইশা খাঁ এবার উচ্চ হাস্য করে বললেন, জানব না কেন? আমার শরীরে যে হিন্দু রক্ত আছে!

অ্যাঁ? কী বললেন?

আপনি আমার পিতার নাম জানেন?

না। ও হ্যাঁ, অনেকদিন আগে শুনেছিলাম যেন, আপনি কাশেম খাঁর পুত্র।

না, তা ঠিক নয়। কাশেম খাঁ আমার পিতৃব্য। খুড়োমশাই। তাঁকে আমি পিতার মতনই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার জন্মদাতার নাম কালিদাস গজদানী। আমাদের পূর্বপুরুষ অযোধ্যার ক্ষত্রিয়। আমার পিতা একজন পণ্ডিত ও সুপুরুষ ছিলেন, আমি তাঁকে বাল্যবয়সেই হারিয়েছি, তাঁর কথা আমার বিশেষ স্মরণে নেই। হিন্দু পণ্ডিত হয়েও তিনি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর দু'রকম কাহিনি শুনেছি। এক হল, কোনো এক পাঠান সুলতানের কন্যা তাঁর রূপ দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে বিবাহ করতে চান। আমার পিতা প্রথমে তাতে রাজি হয়নি, তাঁকে নাকি জোর করে গোমাংস খাওয়ানো হয়, তারপর তিনি মুসলমান হয়ে ওই বিবাহ প্রস্তাব মেনে নেন। আর একটি হল, কালিদাস পণ্ডিত একবার মুসলমান মোমিনদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে তর্কযুদ্ধে হার মেনে স্বীকার করেন ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিজে ধর্মান্তরিত হন। আমাদের পরিবারে এই দ্বিতীয় কাহিনিটিই মান্য করা হয়। মোট কথা তিনি এক সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, এবং তাঁর নাম হয় সুলেমান খাঁ। সুলতানদের আমলে তাঁর অনেক পদোন্নতি হয়, এবং পাঠানদের পক্ষ নিয়ে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। আমি ও আমার ভাই তখন খুবই ছোট। আরও শুনতে চান?

হ্যাঁ, শুনি, শুনি। এসব কিছুই জানতাম না।

সেই যুদ্ধের তাণ্ডবের মধ্যে যখন যে-যার আপন প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত, তখন আমাদের দু'জনকে অনাথ হিন্দু বালক মনে করে কেউ একজন ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। আমরা চালান হয়ে যাই পারস্য দেশে। সেখানে ধনী ব্যক্তিদের গৃহে আমি কয়েক বছর খিদমদগারি করেছি। তারপর এখানে অবস্থাটা কিঞ্চিৎ শান্ত হলে আমার সহৃদয় খুড়োমশাই, তাঁকে আমি চাচাসাহেব বলে ডাকতাম, তিনি লোক পাঠিয়ে খোঁজ করে পারস্য দেশ থেকে আমাদের দু'ভাইকে ফিরিয়ে আনেন। আমার বড় ভাই ইসমাইল বেশিদিন বাঁচেনি। আমি তখন ভাগ্যক্রমে ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের অধীনস্থ সেনাদলে স্থান পাই। ত্রিপুরার পক্ষ নিয়ে লড়াই করে সেবারে আমি মোগল সেনাপতি শাহবাজ খানকে পরাস্ত করেছিলাম। মহারাজ অমরমাণিক্যের রানি খুশি হয়ে আমাকে সরাইল পরগনাটি দান করেন। আমি তাঁকে মাতৃ সম্বোধন করেছি, তিনিও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তাঁর কাছ থেকেই আমি মসনদ আলি খেতাব পাই আর নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়তে শুরু করি। শাহবাজ খান অপমান ভুলতে পারেনি, আমাকে বিভিন্ন স্থানে তাড়া করে বেরিয়েছে। আমি তাই সরাইল ছেড়ে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছি, সে রাজধানীও আপনি দেখেছেন।

কেদার রায় অতি বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, এ যেন রূপকথা! সামান্য ক্রীতদাসের অবস্থা থেকে আজ আপনি সমগ্র ভাটি অঞ্চলের অধীশ্বর। মোগলরাও আপনাকে সমীহ করে। উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পাননি, সবই আপনার বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে অর্জিত!

ইশা খাঁ বললেন, আমরা মাত্র এক পুরুষের ধর্মান্তরিত। আমার চাচাসাহেবও পূর্বে হিন্দু ছিলেন, তাঁর স্ত্রী আজও কিছু কিছু হিন্দুয়ানি বজায় রেখেছেন। পবিত্র কোরানের কিছু কিছু অংশ তিনি মুখস্থ বলতে পারেন, আবার কীসব ব্রতট্রতও পালন করেন। তাঁর কাছ থেকে হিন্দু পরিবারের গল্প শুনেছি, হিন্দু বিধবাদের অবস্থাও সেই ভাবেই জানি। একাদশীর উপবাসের সময় তাদের এক ফোঁটা পানিও খেতে দেওয়া হয় না।

কেদার রায় বললেন, তোমরাও তো রোজার মাসে সারা দিন পানি খাও না।

ইশা খাঁ এবার উঠে এসে কেদার রায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিনীত ভাবে বললেন, রায় রায়হান কেদার রাজ, আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।

কেদার রায় বললেন, ওকি, ওকি, আপনি এভাবে বলছেন কেন? উঠুন।

আমার কাছে আপনার কী প্রার্থনা থাকতে পারে?

ইশা খাঁ একই জায়গায় বসে বললেন, আমরা দু'জনেই মোগলের বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে অটুট সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে সেই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। এই সম্পর্ক স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় বৈবাহিক সম্পর্ক। আমি আপনার ভগিনীকে বিবাহ করতে চাই।

কেদার রায় এবারেও খুবই বিস্মিত হলেন, কিন্তু এ বিস্ময় যেন একটা আঘাতের মতন। তাঁর মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল।

তিনি বললেন, এ কী কথা বলছেন খাঁ সাহেব! আপনি আমার কাছে আর কিছু চাইতেন, তা আমার অদেয় ছিল না। এমনকী আমার রাজ্যের দু'-একখানা পরগনাও আপনার প্রয়োজন হলে দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু বিবাহ? আমরা বিক্রমপুরের কায়স্থ সমাজের কুলপতি, আমাদের বংশে কোনোদিন কোনো অশাস্ত্রীয় বিবাহ ঘটেনি। কোনো শূদ্র যদি রাজাও হয়, তার সঙ্গেও আমরা আমাদের কন্যার বিবাহ দিতে পারি না। মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কের তো প্রশ্নই ওঠে না।

ইশা খাঁ বললেন, রাজস্থানের রাজপুতরা তো মোগলদের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেয়।

কেদার রায় বললেন, রানা প্রতাপ কখনও দেননি। তিনি রাজ্য হারিয়েছেন, তবু জাত-ধর্ম বিসর্জন দেননি। অন্য রাজপুতরা মোগলদের কাছে বারবার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে। এখন মোগলদের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাদের হারেমে কন্যা পাঠায়। এই মানসিংহকেই দেখুন না, মোগলদের পদলেহী হয়ে সেনাপতিত্ব অর্জন করেছে। আমরা ক্ষুদ্র সামন্ত হতে পারি, কিন্তু কোনো প্রলোভনেই ধর্ম বিসর্জন দিতে রাজি নই। বরং প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। তা ছাড়া, আমার ভগিনী বিধবা। হিন্দু বিধবার বিবাহের প্রস্তাবের কথা শোনাও পাপ।

ইশা খাঁ হাত জোড় করে বললেন, মহারাজ, আপনার ভগিনীকে মুক্তি দিন। সব নারীই চায় স্বামীসঙ্গ। নিজের সন্তানের জন্ম দেওয়াতেই তার চরম সুখ। আপনার ভগিনী সেসব কিছুই পেলেন না। আপনি ইচ্ছা করলে...

কেদার রায় এবার গর্জন করে বললেন, রাজা ইশা খাঁ। আপনি এরকম কথা আর একবার উচ্চারণ করলে আমি জীবনে আর আপনার মুখদর্শন করব না। আমার ভগিনী অতি পূতঃচরিত্রময়ী, সে এ প্রকার কথা শুনলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ

বিসর্জন দেবে! আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আপনি পুনরায় যদি...

ইশা খাঁ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে বিচিত্র ভাবের খেলা চলছে।

তিনি বিনীতভাবে একটি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তার উত্তরে কেদার রায় তাঁর ওপরে তর্জনগর্জন করছেন। ইশা খাঁর অন্তরে একবার ক্রোধবহ্নি জ্বলে উঠলে তার পরিণতি কী হয়, তা এই হিন্দু রাজা জানেন না। এই মুহূর্তে তিনি তরবারি নিষ্কাশিত করে কেদার রায়ের ইহলীলা শেষ করে দিতে পারেন।

অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করে ইশা খাঁ উঠে গিয়ে এক গবাক্ষের সামনে দাঁড়ালেন। নদীতীর এখন জনবিরল। এই দিকটায় বেশ ঘন বনাঞ্চল। একটি ধীবর একাকী জাল ফেলে মাছ ধরছে। যে কোনো মুহূর্তে সে বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, তা কি সে জানে না!

মুখ ফিরিয়ে শান্তভাবে ইশা খাঁ বললেন, মহারাজ আপনার জাহাজটি এখানে ভেড়াতে বলুন। আমি এখানেই নামব। এই জঙ্গলটি একটি দুর্গ স্থাপনের উপযুক্ত মনে হচ্ছে। একবার ঘুরে দেখতে চাই।

কেদার রায় মাথা নিচু করে রইলেন। তিনিও ক্রোধ দমন করছেন।

তিন

ইশা খাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু দায়ুদ খান থাকেন গড়জরিপা শেরপুরে। তিনি ওই দুর্গের অধিপতি, মাঝে মাঝেই চলে আসেন জঙ্গলমহলে। বন্ধুর সঙ্গে দু'-একদিন বিশ্রম্ভালাপ করে কাটিয়ে যান। এবারে এসে তিনি ইশা খাঁ-র দেখাই পাচ্ছেন না।

মানসিংহ সসৈন্যে রাজমহলে অবস্থান করে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত পাঠানদের দমনকার্যে ব্যস্ত। পাঠানরা মোগলের চিরশত্রু, তারা গৌড়বঙ্গে অধিকার হারালেও একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েনি। কিছুদিন এদিক-ওদিক লুক্কায়িত থেকে আবার মোগলদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবারে মানসিংহ তাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প করেছেন। তিনি নিজে কিছুদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর নিজের দুই পুত্র ও অন্য সেনাধ্যক্ষদের পাঠিয়েছেন রণক্ষেত্রে। তাঁর ইচ্ছা, পাঠানদের নিশ্চিহ্ন করার পর প্রতাপাদিত্য ও অন্য বারোভুঁইয়াদের দমনে প্রবৃত্ত হবেন। সুতরাং এ অঞ্চলে আপাতত মোগল হামলার আশঙ্কা নেই।

বন্ধুর ডাকেও ইশা খাঁ সাড়া দিচ্ছেন না, বাইরেই আসছেন না অন্তঃপুর থেকে। বিস্মিত দায়ুদ খান এক অপরাহ্নে রাজবাটি সংলগ্ন এক উদ্যানে ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন, একটি ঝিলের পাশে ইশা খাঁ একাকী বসে আছেন, মনে হয় গভীর চিন্তামগ্ন। দায়ুদ তাঁর পাশে বসে একটুক্ষণ নিস্তব্ধ রইলেন।

খানিক পরে ইশা খাঁ একবার তাঁর দিকে মুখ ফেরাতেই তিনি বললেন, জানি, আমাকে এড়িয়ে চলতে চাইছ। আমি দেখা হলেই উপদেশ দিই। এখন আর কিছু বলব না।

ইশা খাঁ ধীর স্বরে বললেন, আমি আমার মনের সঙ্গে অনবরত তর্ক করে যাচ্ছি। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে মানাতে পারছি না। অনবরত অন্তরে দগ্ধ হচ্ছি।

দায়ুদ বললেন, তুমি যে জন্য কষ্ট পাচ্ছ তা কি রূপতৃষ্ণা, না প্রণয়? না প্রত্যাখানের অপমান?

ইশা খাঁ বললেন, শুধু রূপতৃষ্ণা কেন হবে? নারীর ওই রূপ কি আমি আগে দেখিনি? যথেষ্ট দেখেছি। অবশ্য কারও রূপই এক প্রকার নয়। আব প্রণয় কাকে বলে আমি জানি না। জানি শুধু যুদ্ধ আর ভোগ। ওই রমণীটি একবার মাত্র আমার দিকে চক্ষু তুলে তাকিয়েছিল। সে দৃষ্টিতে কী ছিল, তার মর্ম আমি এখনও বুঝতে পারছি না। শুধু সেই দৃষ্টিটাই মনে পড়ছে বারবার। আমি আর সব কিছু বিস্মৃত হচ্ছি।

দায়ুদ বললেন, চলো না, আমরা এক সঙ্গে শিকারে যাই। কিংবা একটা নগর লুণ্ঠন করি। তোমার মনকে অন্য দিকে ফেরাতেই হবে। নইলে সমূহ সর্বনাশ।

আর কিছুতেই যে আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছি না। শুধু ওই দৃষ্টিটার অর্থ বুঝতে চাই, আর একবার দেখতে চাই তাকে।

দোস্ত, তোমাকে আগে যে-কথা বলেছি, এখনও তা আবার না বলে পারছি না। ওই রমণীকে তুমি মস্তিষ্ক থেকে তাড়াও। কেদার রায় আর তোমার সৈন্যবল একত্র না হলে মোগলের হাত থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। হিন্দু আর মুসলমান সৈন্যরা যে এক সঙ্গে মিলেমিশে আছে, এও তো কম কথা নয়! একটি মেয়ের জন্য এই সব কিছু নষ্ট হবে? বৃহত্তর স্বার্থে দু'-একজনকে বিসর্জন দিতেই হয়। যদি চাও তো তোমার জন্য অন্য কোনো রমণীরত্ন এনে দিই!

দায়ুদ, তুমি যা বললে, তা কি আমি বুঝি না? কিন্তু আমার বারবার মনে হচ্ছে তার সঙ্গে আর একবার দেখা না হলে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

একেই কি প্রণয় বলে? মনে হচ্ছে, এর তুলনায় আর সব কিছু তুচ্ছ, আমার রাজ্য তুচ্ছ, যুদ্ধে জয়-পরাজয় তুচ্ছ, আমার আর কিছুই চাই না।

ইয়া আল্লা, এ তো প্রণয় নয়, এ যে এক মহারোগ। এর চিকিৎসা আছে, বলো তো ব্যবস্থা করি। শোনো, কেদার রায় তার বিধবা ভগিনীর সঙ্গে তোমার বিবাহে কিছুতেই সম্মত হবে না। এ দেশ থেকে হিন্দুদের ক্ষমতা একেবারে শেষ হতে চলেছে, একসময় তো দেশটা ওদেরই ছিল, এখন ওরা মুসলমানদের কৃপায় বেঁচে আছে, তবু ওরা অহংকার আর ধর্মীয় সংস্কার কিছুতেই ত্যাগ করতে চায় না। আর হিন্দু বিধবাদের মাথার মধ্যে এমনই কুসংস্কার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো বিধর্মী যদি তাদের যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতেও আসে, তা-ও তারা মেনে নেবে না। বরং আত্মঘাতী হতে পারে।

মনে আছে, সেদিন যে তস্কররা রমণীটিকে ধরে টানাটানি করছিল, আমরা ঠিক সময় উপস্থিত না হলে নিশ্চিত সঙ্গে নিয়েই যেত। সেই লোকটি হিন্দু না মুসলমান ছিল কে জানে? তার জন্য তো পরে আর কিছুই হয়নি।

সে কথা কি আর জানাজানি হয়েছে? জানাজানি না হলেই সাত খুন মাপ। হিন্দুরা যতই বিধবাদের শুদ্ধতার গর্ব করুক, আমরা তো জানি, অনেক বিধবাই অসহায় ভাবে কোনো না কোনো আত্মীয়স্বজনের শয্যায় যেতে বাধ্য হয়। গর্ভবতীও হয়ে পড়ে। সেসব চাপাচুপি দিয়ে দেয়, তাতে কেউ জাতিচ্যুত হয় না। অনেক সময় এই বিধবাদের মেরেও ফেলে।

ইশা খাঁ উঠে পড়ে ঝিলের জলে মুখ প্রক্ষালন করলেন, তারপরও কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন স্থির জলের দিকে। দেখলেন নিজের মুখচ্ছবি।

মুখ ফিরিয়ে বললেন, বন্ধু, আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই। তুমি থাকবে আমার সঙ্গে?

ইশা খাঁ এর মধ্যে চর মারফত স্বর্ণময়ী সম্পর্কে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছেন।

স্বর্ণময়ী পিত্রালয়েই থাকেন বটে, কিন্তু শ্বশুরালয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে। সম্প্রতি তাঁর শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। অতি স্বল্পকালীন স্বামীসঙ্গ করার সময় এই শাশুড়ি তাঁর সঙ্গে খুবই সুব্যবহার করেছিলেন। একেবারে মায়ের মতন। তাই শ্বশুরের শ্রাদ্ধ উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন স্বর্ণময়ী। সেখানে মাত্র দশ দিন অবস্থান করার কথা ছিল। কিন্তু মাতৃসম শাশুড়িও এর মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন খুবই, সেই অবস্থায় স্বর্ণময়ী চলে আসতে পারেননি।

প্রায় দু'মাস বাদে এখন তিনি ফিরছেন।

আজ আর ঝড়বৃষ্টি নেই, সঙ্গে দ্বাদশজন প্রহরী। বল্লভরামের ক্ষত তেমন মারাত্মক হয়নি, চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে সেও সঙ্গে আছে। আজ আর কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই, আবহাওয়াও প্রসন্ন।

সেই ভাঙা মন্দিরটার কাছে আসার পর চিত্তাদাসী শিবিকার পর্দা সরিয়ে মুখ বার করে বলল, ওগো, রানিদিদি বলছেন, এখানে কিছুক্ষণ থামো। এখানে বিশ্রাম নাও সবাই।

বল্লভরাম এগিয়ে এসে বলল, চিত্তে রানিদিদিকে বলো, এ স্থানটি অপয়া। কত বিপদ হয়েছিল। আমরা বরং এখান থেকে দ্রুত সরে গিয়ে কালিগঙ্গা নদীর ধারে গিয়ে বসব।

চিত্তা ওষ্ঠ টিপে হেসে বলল, এ স্থানটি অপয়া? আর এখানেই যে আমরা কত বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি, তা মনে নেই? এটাই সবচেয়ে পয়া স্থান।

অগত্যা শিবিকা নামিয়ে সবাই বিশ্রাম নিতে লাগল।

তার কিছুক্ষণ পরেই অদূরের অরণ্য থেকে বেরিয়ে এল এক সৈন্যবাহিনী। প্রায় পঞ্চাশজন, তাদের মধ্যে বন্দুকধারীই দশজন।

সৈন্যবাহিনী কিন্তু কাছে এগিয়ে এল না, খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে রইল সার বেঁধে। শুধু তাদের মধ্যে থেকে একজন অশ্বারোহী ছুটে এল ধুলো উড়িয়ে। অশ্বরোহীটি সুসজ্জিত, মাথায় পালক-গোঁজা শিরস্ত্রাণ। কাছে আসতেই চিনতে পারা গেল, তিনি দুরন্ত যোদ্ধা ইশা খাঁ।

বল্লভরাম ওই অশ্বরোহীকে চিনতে পেরে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

ইশা খাঁ বললেন, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। নিশ্চিন্তে থাকো। আমি শুধু ওই শিবিকার মধ্যে যে রাজকুমারী রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কয়েকটি কথা বলব।

বল্লভরাম কম্পিত কণ্ঠে বলল, হুজুর, আমাদের রানিদিদি তো কোনো পরপুরুষের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করেন না।

ইশা খাঁ বললেন, সে আমি বুঝব। তোমরা যে যার স্থানে অবস্থান করো। কেউ যদি আমাকে বাধা দিতে চাও, তাহলে সকলেই কচুকাটা হবে, এ আমি আগেই জানিয়ে রাখছি। আর যদি স্থির থাকো, তা হলে নিশ্চিন্তে গৃহে ফিরে যাবে।

শিবিকার কাছে এসে তিনি বললেন, ভিতরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের আমি

জানাচ্ছি, আমি সোনার গাঁওয়ের অধিপতি ইশা খাঁ মসনদদার। শ্রীপুরের রাজকন্যার সঙ্গে দু'-একটি কথা বলার জন্য এসেছি।

পর্দা ফাঁক করে চিন্তা বলল, হুজুর, আমার প্রণাম নিন। আপনাকে কে না চেনে। আগেরবার আপনি আমাদের জীবন ও ইজ্জত রক্ষা করেছেন। আপনার কাছে আমরা সকলেই মহা কৃতজ্ঞ। কিন্তু হুজুর, গুস্তাখি মাফ করবেন, আমি নিতান্ত এক নফরানি, তবু আপনাকে জানাতে বাধ হচ্ছি যে, আমাদের রানিদিদি কোনো অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না।

ইশা খাঁ বললেন, বেশ। বাক্যালাপ করতে হবে না। আমি শুধু কয়েকটা প্রশ্ন করব। তুমি উত্তর জেনে দাও। রাজকুমারী যে বৈধব্যজীবনের যন্ত্রণা ভোগ করছেন, তিনি কি এর থেকে মুক্তি চান না?

একটুক্ষণ সময় নিয়ে চিন্তা জানাল, হুজুর, রাজকুমারী এ প্রশ্নের কোনো উত্তরই দিচ্ছেন না।

ইশা খাঁ বললেন, ঠিক আছে, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, কোনো ব্যক্তি যদি তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, যদি তাঁকে সসম্মানে স্ত্রী হিসেবে চায়, তাতেও কি তিনি রাজি নন? অন্যান্য ধর্মে এ প্রকার বিবাহে কোনো বাধা নেই, শুধু হিন্দু ধর্মের সংস্কার বজায় রাখার জন্য সারা জীবন কষ্টই সহ্য করে যাবেন?

এবারেও চিন্তা বলল, হুজুর, রাজকুমারী এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দেবেন না।

ইশা খাঁ বললেন, বেশ। আমার তৃতীয় ও শেষ প্রশ্ন, কেউ যদি তাঁর প্রণয়পার্থী হয়ে তাঁকে সবলে হরণ করে, তাহলে তিনি কী করবেন?

একটু পরে চিন্তা বলল, হুজুর, এবারেও রাজকুমারী জানিয়েছেন, তিনি কোনো উত্তর দেবেন না। তবে যদি অনুমতি দেন, আমি নিজে একটা প্রশ্ন করতে পারি? যত দূর জানি, আমাদের রাজকুমার কেদার রাজার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আপনি বন্ধুর ভগিনীর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করবেন?

এবারে ইশা খাঁ মৃদু হাস্য করে বললেন, ঠিক, কেদার রায়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। তুমি কি মহাভারতের কাহিনি জানো? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনেরও তো বন্ধুত্ব ছিল, তাই না? তবু তো অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন!

আমিও যদি—

চিন্তা বলল, হুজুর, আমরা অবলা। আমাদের রক্ষী ও প্রহরীরা যদি

আপনাদের বাধা দিতে না পারে, তবে আমরা তাকে কী বলব?

চিন্তার কণ্ঠস্বরে অবশ্য কোনো ভীতি বা আশঙ্কার চিহ্ন নেই।

ইশা খাঁ বললেন, তা হলে আমি তোমাদের শাস্ত্র মেনেই শ্রীপুরের রাজকুমারীকে হরণ করতে চাই। তিনি আবার আত্মঘাতিনী হবেন না তো?

এবার চিন্তাও কিছু বলল না।

ইশা খাঁ বললেন শোনো, তোমাদের রক্ষীরা কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না। তাদের তেমন উদ্যোগও নেই। তবু, আমি সবলে তোমাদের ওই শিবিকা থেকে বার করতে চাই না। তোমাদের রাজকুমারী নিজে থেকেই বাইরে এলে আমি খুশি হব।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তার হাত ধরে রাজকুমারী স্বর্ণময়ী বেরিয়ে এলেন শিবিকার বাইরে। মুখের ঘোমটা সরিয়ে তিনি একবার তাকালেন ইশা খাঁর দিকে। সেই রহস্যময় দৃষ্টি।

ইশা খাঁ বললেন, চিন্তা, আমি ওঁর কাছে যবন। আমি প্রথমেই ওঁকে স্পর্শ করতে চাই না। তুমি ওঁকে আমার অশ্বপৃষ্ঠে তুলে দাও। দ্যাখো, উনি আপত্তি করেন কি না।

চিন্তা খুব সহজেই স্বর্ণময়ীকে তুলে দিল অশ্বপৃষ্ঠে। ইশা খাঁ সঙ্গে সঙ্গে দৌড় শুরু করলেন। একটু পর, স্বর্ণময়ী এই প্রথম স্বকণ্ঠে মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলেন, আপনি সত্যিই আমাকে বিবাহ করবেন? স্ত্রীর সম্মান দেবেন?

মুখ ফিরিয়ে ইশা খাঁ বললেন, অবশ্যই, আমি ওয়াদা করছি, আপনিই হবেন আমার প্রধানা রানি। আল্লা ও চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী, আমাদের যদি সন্তান হয়, সেই সন্তানই হবে আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

চার

এই সংবাদ যখন রাজধানীতে পৌঁছল তার পরেও বেশ কিছুক্ষণ অসুস্থ চাঁদ রায়কে তা জানানো হল না। কিন্তু কতক্ষণ আর গোপন রাখা যায়। চাঁদ রায় তাঁর কন্যার প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। এই কন্যার হাতের সেবা ছাড়া আর কারওরই সেবা তাঁর ঠিক মনঃপূত হয় না।

অন্দরমহলে প্রথম সংবাদটি শুনেই চাঁদ রায় কাতর ভাবে আঃ আঃ শব্দ করতে লাগলেন। যেন কেউ আচম্বিতে তাঁর বুকে একটা বর্শা বিঁধিয়ে দিয়েছে,

অচিরেই জ্ঞান হারালেন তিনি।

কিছু পরে যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, তখন কয়েকজন কবিরাজ-বৈদ্য তাঁকে ঘিরে বসে আছে, পায়ের কাছে কেদার রায়।

চাঁদ রায় কেদারের দিকে চক্ষু মেলে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করলেন, যা শুনেছি, সব সত্য?

কেদার মুখে কিছু না বলে শুধু মস্তক হেলিয়ে সম্মতি জানালেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাঁদ রায় আপন মনে বলতে লাগলেন, দূর দেশ থেকে এই যবনরা হিন্দুদের সর্বনাশ করতে এসেছে। এরা আমাদের রাজ্যগুলি একে একে গ্রাস করবে, আমাদের মন্দির-দেবালয় ধ্বংস করবে, আমাদের কন্যাদের হরণ করবে। আর একজনও হিন্দু থাকবে না, আমাদের সনাতন ধর্ম রসাতলে যাবে। এই বুঝি নিয়তি!

তারপর কেদারের দিকে চেয়ে বললেন, যবনকে কখনও বিশ্বাস নেই। তুই ওই নরাধমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়েছিলি, এখন দেখলি তো সে কেমন বন্ধুত্বের মূল্য দিয়েছে! আমি বুঝেছি, আমার আয়ু আর বেশি দিন নেই। আর কেউ যেন আমার সামনে সোনাইয়ের নাম উচ্চারণ না করে। আজ থেকে সে মৃত। কেদার, তুই আমার কাছে শপথ নে, এর প্রতিশোধ তোকে নিতেই হবে। যতদিন তোর শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকবে, ততদিন তুই ওই যবনের রাজ্য ধ্বংস করার চেষ্টা করবি! সেই পাপীকে যদি হত্যা করতে পারিস, তা হলে আমি পরলোকে গিয়ে শান্তি পাব।

এর তিনদিন পরেই চাঁদ রায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, তা ছাড়াও কেদার নিজেই আগে থেকে ঠিক করে ফেলেছে, ইশা খাঁকে সে সংহার করবেই। তার জন্য যদি নিজের রাজ্যও বিসর্জন দিতে হয়, তাও দিতে দ্বিধা করবে না।

শুরু হয়ে গেল যুদ্ধপ্রস্তুতি।

ক্রোধে অধীর হয়ে কেদার রায় তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি মেটার পরই ইশা খাঁর রাজ্যের অন্তর্গত খিজিরপুর আক্রমণ করলেন। দু'পক্ষের সমর চলল কয়েকদিন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অপরপক্ষে ইশা খাঁকে একবারও দেখা গেল না। তাঁর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন অন্য সেনাপতি।

শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন কেদার রায়। তিনি খিজিরপুর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে দিলেন। তারপর তিনি এগোলেন কৈলাগাছা দুর্গের দিকে।

সেখানেও তাঁকে তেমন জোরালো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হল না, ইশা খাঁর দেখা নেই। কেদার বাহিনীর পরাক্রমে কৈলাগাছা দুর্গেরও পতন হল।

তারপর কেদার রায় খবর পেলেন, তাঁর রাজ্যের অন্য প্রান্তে ইশা খাঁ অন্য একটি বাহিনী নিয়ে ঝটিকা-আক্রমণে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন দু'টি দুর্গ। সেখানেও কেদারের রাজ্যে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কুশলী যোদ্ধা ইশা খাঁ এখনই কেদার রায়ের মুখোমুখি হতে চান না, কিন্তু তাঁকে ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিতে চান নিজের শক্তিমত্তা।

এই যুদ্ধে কারওই কোনো লাভ হল না, বরং সৈন্যক্ষয় হল দু'পক্ষেরই। এই দুই বারোভুঁইয়ার মিলিত বাহিনীর সম্ভাবনা বিলীন হয়ে গেল একেবারে। মুসলমান ও হিন্দু প্রজাদের মধ্যেও উপ্ত হল সন্দেহ ও অবিশ্বাস।

সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন কেদার রায়। অনেক আলোচনার পর তাঁদের মুখপাত্র বললেন, মহারাজ, ইশা খাঁর শক্তিকে ন্যূনভাবে দেখা আমাদের উচিত হবে না। তিনি যুদ্ধনীতিতেও অত্যন্ত ধুরন্ধর। তাঁকে পুরোপুরি দমন করতে গেলে আমাদের আরও অনেক শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয়। আমাদের নৌবাহিনীকেও আরও সুদৃঢ় করতে হবে। এ জন্য সময়ের প্রয়োজন। তা ছাড়া, আরাকান রাজ আবার এদিকে আক্রমণ করার জন্য অস্ত্র শানাচ্ছেন, এ খবর পাওয়া গেছে। ইশা খাঁ এর মধ্যে আরাকান রাজের সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছেন। সুতরাং এখন আমাদের আত্মরক্ষার জন্য প্রধান কর্তব্য আরাকান রাজকে প্রতিরোধ করা।

কেদার রায় এ যুক্তি মানতে বাধ্য হলেন।

তারপর তিনি তাঁর অন্যতম সেনাপতি পর্তুগিজ কার্ভালোকে পাঠালেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কাছে। যদি তাঁর কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়।

মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল, যশোর থেকে কোনো খবর আসে না। এদিকে আরাকান বাহিনীর সঙ্গে ছোটখাটো সংঘর্ষ চলতেই থাকল। তারা একটু সুযোগ পেলেই লুঠপাট করে পালায়, অকারণে নিরীহ প্রজাদের হত্যা করতেও দ্বিধা করে না।

প্রতাপাদিত্য নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝেন না। এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য চরম অসামাজিক কোনো কাজেও তাঁর দ্বিধা নেই। তিনি কার্ভালো ও তাঁর

কয়েকজন সঙ্গীকে বসিয়ে রাখলেন কিছুদিন। ইতিমধ্যে বুঝতে চেষ্টা করলেন মগদের মতিগতি। মগেরা যশোর পর্যন্ত আসতে পারবে না, সুতরাং মগদের রাজার বিরুদ্ধতা করায় তাঁর কোনো লাভ নেই। বরং আরাকান রাজকে খুশি করার জন্য তিনি বেশ একটা সহজ উপায় বেছে নিলেন।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর তিনি কার্ভালো ও তাঁর তিন সঙ্গীকে নিভৃত মন্ত্রণার জন্য আহ্বান জানালেন এক সন্ধ্যাকালে। কার্ভালো শিবিরে উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহর করার পর একটি বাক্যও উচ্চারিত হল না। প্রত্যাপাদিত্য সঙ্কেত দিলেন, গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে এল বারোজন যোদ্ধা। সেই অতর্কিত আক্রমণে বাধা দেবারও সুযোগ পেলেন না কার্ভালো। অচিরেই তাঁর ও সঙ্গীদের ছিন্ন মুণ্ড ধুলায় গড়াল।

এই সংবাদ সর্বত্র পৌঁছবার পর মগরা আরও সাহসী হয়ে এগিয়ে এল বিক্রমপুরের দিকে। কেদার রায়কে একাই লড়তে হল তাদের সঙ্গে, ইশা খাঁ দূরে বসে রইলেন হাত গুটিয়ে। শত্রুপক্ষের শক্তিক্ষয়ে তাঁর খুশি হবারই কথা।

মগরা রাজ্য জয় করার চেয়েও ধন-সম্পদ লুণ্ঠনেই বেশি আগ্রহী, তাই এই যুদ্ধের কোনো নিষ্পত্তি হয় না। সংঘর্ষ চলতেই থাকে।

এদিকে মানসিংহ পাঠানদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে মনোনিবেশ করলেন বারোভুঁইয়াদের দিকে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলাকার অধীশ্বর প্রতাপাদিত্য। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার বদলে পরাধীন হলেও ভোগবিলাসের জীবন তাঁর কাছে শ্রেয়। মোগলবাহিনী অগ্রসর হতেই তিনি প্রচুর উপহার-উপঢৌকন পাঠালেন এবং নতজানু হলেন মানসিংহের কাছে। মানসিংহ তাঁকে করদ রাজা হিসেবে পরিগণিত করলেন বিনা যুদ্ধে।

বারোভুঁইয়াদের মধ্যে মোগল-বিরোধী ও প্রকৃত স্বাধীনতাকামী প্রকৃতপক্ষে দু'জন। এক মুসলমান, এক হিন্দু। দু'জনেরই আত্মসম্মানবোধ তীব্র, স্বভাবেও তেজি, সংগ্রামে নির্ভীক। কিন্তু এঁরা আর একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না, সে-সংবাদ মানসিংহ আগেই সংগ্রহ করছিলেন। একে একে এঁদের দমন করা সহজ হবে মনে করে তিনি প্রথমে অগ্রসর হলেন সোনার গাঁও-এর দিকে।

ইশা খাঁ আগে একবার সন্ধি করে মানসিংহের সঙ্গে দিল্লি গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বশ্যতা স্বীকার তাঁর প্রবৃত্তিতে নেই। আবার তিনি স্বাধীন রাজার

মতন কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। মানসিংহের বাহিনী ধেয়ে এল সোনার গাঁওয়ের দিকে। বলা বাহুল্য, কেদার রায় কোনো সাহায্যই পাঠালেন না, বরং এই ভেবে সন্তুষ্টি বোধ করলেন, এই যুদ্ধে মানসিংহ ও ইশা খাঁ, এই দু'পক্ষেরই অনেক রণতরী ও স্থলবাহিনী বিনষ্ট হবে, তাতে তাঁরই সুবিধে। যায় শত্রু পরে পরে।

কয়েকদিন পরেই সংবাদ এল। এই যুদ্ধে আকস্মিকভাবে ইশা খাঁর মৃত্যু হয়েছে। শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে।

মানসিংহ তখনই অবশ্য সোনার গাঁও-এর রাজ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন না। ইশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হতে না-হতেই মগদের একটা বাহিনী তাঁর কয়েকটি রণতরী দখল করে অস্ত্রশস্ত্র কুক্ষিগত করে চম্পট দিয়েছে। মানসিংহ ধাওয়া করলেন তাদের পিছনে। তিনি সন্দ্বীপেরও দখল নিতে চান।

উল্লসিত কেদার রায় বুঝতে পারলেন, এই তো সোনার গাঁও দখল করার সুবর্ণ সুযোগ। ওদের ইশা খাঁ-বিহীন সেনাবাহিনী পরিচালনা করার মতন সুযোগ্য কেউ নেই। ইশা খাঁর ওপর সাক্ষাৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করা গেল না বটে, কিন্তু তার সাধের রাজ্যটি একেবারে ধ্বংস করে দিলে তবু কিছু গায়ের জ্বালা মিটবে।

কয়েকদিন পরেই কেদার রায় আক্রমণ করলেন তাঁর প্রাক্তন বন্ধুর রাজ্য।

কিন্তু যত সহজে এই রাজ্যগ্রাস সম্পন্ন হবে মনে করেছিলেন, তা হল না। ইশা খাঁর ছিন্নভিন্ন বাহিনী আবার মিলিত হয়ে জোর লড়াই দিতে লাগল। কেদার রায় যদিও একটু একটু করে অগ্রসর হতে লাগলেন, কিন্তু জঙ্গলমহলের সন্নিকটে এসে শুরু হল তুমুল সংগ্রাম। এ রাজ্যের যোদ্ধারা আর কিছুতেই পিছু হটবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সন্ধ্যাকালে কেদার রায় তার কয়েকজন সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে বসলেন। প্রথমেই তিনি প্রশ্ন তুললেন, ইশা খাঁর অবর্তমানে এ রাজ্যের সেনাপতি কে? যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব কার হাতে?

কেউ ঠিক উত্তর দিতে পারে না। ঢেউয়ের মতন সার বেঁধে বিপক্ষীয় সৈন্যরা আসে। কিন্তু তাদের মাঝখানে তলোয়ার উঁচিয়ে কাউকে নির্দেশ দিতে দেখা যায় না। কিন্তু সেনাপতি ছাড়া কি যুদ্ধ হয়? শুধু লড়াই করলেই তো চলে না। সঠিক যুদ্ধনীতি অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারণ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কেদার রায় বললেন, চর পাঠাও। এ রাজ্যে ইশা খাঁর উত্তরাধিকারী কে

তা জানা দরকার।

তিনজন চর ছড়িয়ে পড়ল তিন দিকে। তাদের মধ্যে দু'জন ব্যর্থ হলেও গভীর রাত্রে একজন অবিশ্বাস্য সংবাদ নিয়ে এল। সে ছদ্মবেশ ধরে বিপক্ষের সেনাবাহিনী ভেদ করে ভিতরে ঢুকে সেনাপতিকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে।

সে বলল, মহারাজ, এ রাজ্যের সেনাপতি এক নারী।

নারী? বঙ্গনারীরা আবার যুদ্ধবিদ্যা শিখল কবে? তাদের তো যুদ্ধক্ষেত্রের ধারে-কাছেও আসতে দেওয়া হয় না। চরের এ সংবাদ কি সত্য হতে পারে?

কেদার প্রশ্ন করলেন, তুমি সত্যিই তাকে স্বচক্ষে দেখেছ, না গুজব শুনে এসেছ?

চর বলল, সত্যিই দেখেছি মহারাজ। তাঁর নাম সোনাইবিবি। অন্য এক নাম নেয়ামতবিবি। তিনি সব সময় সশস্ত্র অবস্থায় থাকেন, সৈন্যদের উৎসাহ দেন। এমনও শুনে এসেছি যে, যুদ্ধ আরও ঘোর অবস্থায় এলে তিনি স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে চেপে সম্মুখ সারিতে এসে লড়াই করবেন।

একটু থেমে চর আবার বলল, মহারাজ, যত দূর জেনেছি, এই সোনাইবিবি আপনার ভগিনী, মরহুম ইশা খাঁর স্ত্রী।

কেদার রায় কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন, সোনাই? আমার বোন? সে তো এমন লাজুক যে, মুখ ফুটে কথাই বলতে পারে না। কোনোদিন পরপুরুষের সামনে চোখ তুলে তাকায়নি, কোনোদিন কোনো অস্ত্র ছুঁয়েও দেখেনি, সে এখন হাতে অস্ত্র নিয়ে পুরুষ সৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করবে?

চরকে আরও কিছুক্ষণ জেরা করবার পর তিনি তাঁর সেনানায়কদের নির্দেশ দিলেন, কাল প্রত্যুষে যুদ্ধ শুরু হবে না। সাদা পতাকা উড়িয়ে দেবে। বিপক্ষের সেনাপতির কাছে দূত পাঠাবে, আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

সারা রাত কেদার রায়ের ঘুম এল না।

তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, ইশা খাঁ জেদের বশে তাঁর ভগিনীকে অপহরণ করেছিল। কিছুদিন প্রমোদের পর তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে হারেমে। সেখানে নারীদের আর পৃথক কোনো অস্তিত্ব থাকে না। ইশা খাঁর ওপর কেদারের ক্রোধ একটুও প্রশমিত হয়নি, কিন্তু স্বর্ণময়ীর কথা তিনি আর মনে রাখেননি, যেন সে মৃত। স্বর্ণময়ীকে পুনরুদ্ধারের তো কোনো প্রশ্নই নেই, হিন্দু নারী একবার গৃহের বাইরে গিয়ে পরপুরুষ স্পর্শিতা হলে তার আর গৃহে ফেরার

উপায় থাকে না। সুতরাং তাকে মৃত হিসেবে ধরে নেওয়াই তো ঠিক!

চাঁদ রায়ের অতি আদরিণী কন্যা, অমন নরম শান্ত মেয়েটির এমন রূপান্তর কী করে সম্ভব হল? সে আজ তার নিজের দেশ আর নিজের বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে যুদ্ধে নেমেছে।

পরদিন সাদা পতাকা উড়িয়ে দেবার পর দূত গেল বিপক্ষের শিবিরে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা গেল না, নানান শর্ত দিয়ে দু'পক্ষেরই দূত চালাচালি হতে লাগল। সম্পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে নিজের শিবিরে অন্য পক্ষের রাজা বা সেনাপতিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেও বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে খুন করার ঘটনা মোটেই বিরল নয়। অনেক সময় ভাইও ভাইকে রেয়াত করে না, ভাই ও বোনকেই বা বিশ্বাস কী!

অপরাহ্ণের দিকে ঠিক হল, দু'পক্ষের সেনাবাহিনী থেকেই কিছুটা দূরে এক মধ্যবর্তী স্থানে একটি নতুন শিবির স্থাপিত হবে, সেখানে উভয় পক্ষের দশজন দশজন বাছাই করা সৈন্য প্রহরায় থাকবে, শিবিরে অভ্যন্তরে থাকবেন শুধু এক পক্ষের রাজা ও অন্য পক্ষের রানি।

অপরাহ্ণ প্রায় বিগত, সন্ধ্যা সমাগত, কেদার রায়ই পৌঁছলেন আগে। ভিতরে জ্বলছে দু'টি মশাল, মুখোমুখি দু'টি উচ্চাসন। কেদার রায় বসলেন একটিতে।

অন্য পক্ষের রানি প্রবেশ করা পর কেদার কয়েক মুহূর্ত নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। যেন চেনাই যায় না। শুভ্র বৈধব্যের বেশে যাকে দেখেছেন, তার সঙ্গে এখন রঙিন মুসলমানি পোশাক, মাথায় পালক বসানো মুকুট।

রানিই প্রথম বললেন, দাদা, তোমার পা ছুঁয়েই প্রণাম করা উচিত ছিল, কিন্তু আমার স্পর্শে তোমার জাত যাবে কি না জানি না, তাই দূর থেকেই আদাব জানাচ্ছি।

ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে কেদার রায় বললেন, থাক। তাই যথেষ্ট! তুই কি সত্যিই সোনাই? নিজের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে তুই এমন কুৎসিত সেজেছিস, তার আগে মরলি না কেন?

রানি স্পষ্ট স্বরে উত্তর দিলেন, যে-ধর্ম মেয়েদের শুধু মরতেই বলে, আমি সে ধর্ম আর মানি না।

কেদার ধমক দিয়ে বললেন, আমাদের ধর্ম মোটেই মেয়েদের মরতে বলে

না। নারীরা পিতৃসেবা, পতিসেবা, পুত্রসেবার মতন মহান ব্রত পালন করে। বিধবারা শুদ্ধাচারী হয়ে থেকে, ঠাকুর-দেবতার পূজা করে কত না পুণ্য অর্জন করে! পরজন্মে তাদের সিঁথিও অক্ষয় হয়।

রানি আসন গ্রহণ না করে দাঁড়িয়েই রইলেন এবং বললেন, শুদ্ধাচারে থাকা মানে ইহজগতের সমস্ত সুখসম্ভোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। সেবার ব্রত মানে পিত্রালয়ের সবার দাসী-বাঁদি হয়ে থাকা। আমার প্রথম স্বামীর মুখও আমার মনে নেই, একদিনও তার সঙ্গে এক শয্যায় শুইনি, তবু সারা জীবন তার ধ্যান করে যেতে হবে! আমাকে সহজভাবে নিশ্বাস নিতেও দিতে না তোমরা।

গলার কাছে বাষ্প জমে যাচ্ছে, কিন্তু এখন কিছুতেই দুর্বলতা প্রকাশ করতে চান না রানি। একটুক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি আবার বললেন, পরজন্ম সত্যি সত্যি আছে কি না আমি জানি না। তোমরা ওতে বিশ্বাস করো, কিন্তু আমি এখন মুসলমান, আমি আর পরজন্ম মানি না। আমি বুঝেছি মানুষের যা কিছু সাধ-আহ্লাদ এ জন্মেই মেটাতে হয়।

কেদার রায় বললেন, ছিঃ! নিজেকে মুসলমান বলতে তোর একটুও লজ্জা হল না? তুই আমাদের বংশে কালি দিয়েছিস। একটা বিশ্বাসঘাতক, তস্কর তোকে চুরি করে এনেছে, ধর্ম বিসর্জন দেওয়ার আগে তুই মরলি না কেন? তাতেও আমরা খুশি হতাম।

দাদা, তোমাদের খুশি করার দায় আর আমার নেই। আমার স্বামী আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন...

সম্মান? তেনার হারেমে আর কটা বিবি আছে তোর মতন?

যে ক'জনই থাক। হিন্দুদের আট-দশটা বউ থাকে না? এরা তো তবু হারেমের বিবিদের খেতে-পরতে দেয়। আর হিন্দুরা এক একটা বিয়ে করে আর বউকে বাপের বাড়ি ফেলে রাখে। বরং উল্টে শ্বশুরের কাছে টাকা চায়! সবচেয়ে বড় কথা কী জানো দাদা, আমার স্বামী আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন অনেকখানি, আমাকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছেন, আমাকে অস্ত্র ধরা...

থাক ওসব বাজে কথা। এবার কাজের কথা হোক। তুই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিস কোন সাহসে! তোদের রাজ্য আমি গুঁড়িয়ে দিতে পারি, তা জানিস না? মানসিংহ তো তোদের অর্ধেক বাহিনী ধ্বংস করেই গেছে। কালই তোরা সব অস্ত্র নামিয়ে রাখ! এই দু'টো রাজ্য এক হলে আমরা

মানসিংহকে উপযুক্ত জবাব দিতে পারব। ইশা খাঁকে এই কথা আমি অনেকবার বলেছি, সে শুনল না। সামান্য ভোগ-লালসায় বিশ্বাসঘাতক হল। আমি তোকে কথা দিচ্ছি, তোর কিংবা তোর সন্তানদের গায়ে কেউ হাত ছোঁয়াবে না। আমি তোদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করে দেব, যথেষ্ট মাসোহারা পাবি, সারা জীবন সুখেশান্তিতে কাটাবি।

একটুক্ষণ নীরব থেকে রানি বললেন, আমার স্বামী শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন, সে-মৃত্যু গৌরবের। তিনি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, জীবন থাকতে আমি যেন এ রাজ্যের স্বাধীনতা বিসর্জন না দিই। আমার দু'টি সন্তান যেন কারো দাস না হয়। তুমি এখন আমার শত্রু। আমি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধে বিরতি দেব না। আমার প্রতিটি সৈনিকই এই প্রতিজ্ঞা করেছে...

এ যুদ্ধে তো তোরা হারবিই। তখন আমার সৈন্যরা লুঠপাট শুরু করলে আমি আর থামাতে পারব না। তোর সন্তানদের কথা ভেবে অন্তত...

এমন সময় শিবিরের বাইরে থেকে কেউ উত্তেজিত ভাবে বলল, মহারাজ, মহারাজ!

কেদার রায় হুংকার দিয়ে বললেন, আঃ, বলেছি না, কেউ আমাকে একসময় বিরক্ত করবে না। দূর হও!

সেই লোকটি আবার বলল, মহারাজ, মহারাজ, বিষম জরুরি বার্তা! আপনার এখুনি জানা দরকার। মহারাজ—

কেদার রায় শিবিরের পর্দা সরিয়ে দেখলেন, তার তিনজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচর সেখানে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের একজন বলল, মহারাজ, রাজধানী থেকে সংবাদ এসেছে, মহারাজ মানসিংহ দূত পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। সেই দূতের কাছে একটি পত্রও আছে। তিনদিনের মধ্যে সেই পত্রের উত্তর না পেলে সে ফিরে যাবে।

কেদার রায় একটুক্ষণ ভ্রুকুঞ্চিত করে রইলেন। এ আবার মানসিংহের কী নতুন চাল? দূত-টুত তো আগে কখনও তিনি পাঠাননি। সীমান্তে এসে দুন্দুভি বাজিয়ে যুদ্ধ ঘোষণাই তাঁর প্রথা।

অন্য একজন বলল, মহারাজ, আমাদের রাজধানী অরক্ষিত। এখুনি আপনার সেখানে ফিরে যাওয়া দরকার।

আবার শিবিরের মধ্যে এসে কেদার রায় গম্ভীর স্বরে বললেন, সোনাই,

আমিও পিতার কাছে শপথ নিয়েছি, ইশা খাঁর রাজ্য পদানত না করে আমি নিবৃত্ত হব না। আপাতত সে কাজ স্থগিত রইল। এখন মানসিংহের বাহিনীকে আমি চূড়ান্ত শিক্ষা দিতে সক্ষম। আমার নৌবাহিনী মোগলের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। এবার স্থলযুদ্ধে আমার গজবাহিনীও অপ্রতিরোধ্য। মানসিংহ যদি এবার নিজের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষমও হয়, পিছু হঠতে অবশ্যই বাধ্য হবে। সে কাজ সমাপন করে আমি আবার ফিরে আসব এ রাজ্যে। মনে রাখিস।

পাঁচ

সে রাত্রেই এক অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে কেদার রায় দ্রুত ফিরে এলেন নিজের রাজধানীতে।

মোগল সেনাপতির দূতকে যেমন তেমন ভাবে দর্শন দেওয়া যায় না। পরদিনই রাজসভা নতুন ভাবে সজ্জিত করা হল। একটু উচ্চ বেদিতে স্থাপিত হল স্বর্ণখচিত সিংহাসন। সভাসদদের সংবাদ পাঠিয়ে ডেকে আনা হল। নানা পুষ্পে সজ্জিত হল প্রবেশদ্বার।

সকালবেলা শুরু হল সভা। মানসিংহের দূতকে বসিয়ে রেখে রাজা কেদার রায় সভাসদদের সঙ্গে অন্য আলোচনা প্রবৃত্ত হলেন। এমনকী মহাভারতের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা আখ্যানের সঙ্গে কালিদাসের নাটকটির কত তফাত সে প্রসঙ্গও তুললেন সভাপণ্ডিতের সঙ্গে। যেন তিনি বোঝাতে চান, মানসিংহের কাছ থেকে দূত আসা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয়। কোথাও কোনো দুশ্চিন্তার চিহ্ন নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এইভাবে তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ও হ্যাঁ, মহারাজ মানসিংহের কাছ থেকে দূত এসেছে শুনলাম? কোথায় তিনি, ডাকো তাঁকে।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, তিনি মধ্যম সারিতেই বসে আছেন।

এবারে দূত উঠে এসে রাজাকে যথাবিহিত অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ মানসিং কালিগঙ্গা নদীর ওপারে অবস্থান করছেন। তিনি যুদ্ধ ও রক্তপাত এড়িয়ে যেতে চান। বঙ্গের যে-সব জমিদার ভারত সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে চান, তাঁদের সঙ্গে মহারাজ মানসিংহ বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী। সে কারণে তিনি আপনার কাছে একটি উপহার ও একটি পত্র

পাঠিয়েছেন।

দূরের এক সঙ্গী একটি পেটিকা খুলে একটি শৃঙ্খল ও একটি তলোয়ার বার করল।

দূত বললেন, মহাশয় আপনি এই দু'টির মধ্যে যে-কোনো একটি আপনার পছন্দ মতো তুলে নিন। তাতেই আমরা সঠিক বার্তা পেয়ে যাব।

দূত একবারও রাজা সম্বোধন করছেন না কেদার রায়কে। অর্থাৎ এরা নিজে নিজেই রাজা। দিল্লির দরবার থেকে সনদ না দিলে কেউ রাজা হয় না, মোগলরা তাকে মানে না।

কেদার রায় সিংহাসন থেকে নেমে এসে বললেন, সব অলঙ্কার সকলকে মানায় না। ওই শৃঙ্খলটি মহারাজ মানসিংহকেই ধারণ করতে বলবেন।

তলোয়ারটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, তেমন ধার নেই দেখছি, ওজনেও কম। আমার রাজ্যে এর তুলনায় অনেক বেশি ধারাল অসি নির্মিত হয়। মহারাজ মানসিংহ যদি সেই অস্ত্রের সম্মুখীন হতে চান, তবে তিনি স্বাগতম। পত্রটি কই, দেখি!

পত্রটি পাঠ করতে করতে কেদার রায় ওষ্ঠ বক্র করে বললেন, আপনাদের মহারাজ একজন শিক্ষিত পত্রনবীশও জোগাড় করতে পারেননি দেখছি।

সত্যিই পত্রটি অতি দুর্বল ভাষায় লেখা। তার অংশবিশেষে বলা হয়েছে যে, ত্রিপুরার মানুষ, মগ, বাঙালিরা সব পলায়ন করো। অশ্ব-গজ-পদাতিক ও নৌবাহিনীতে কম্পিত বঙ্গভূমি। বিষম সমর সিংহ মানসিংহ এসে গেছেন।

ত্রিপুর মগ বাঙালি, কাককুলী চাকালী,
সকল পুরুষমেতৎ ভাগী যাও পলায়ী
হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষম সমর সিংহ মানসিংহ প্রশতি।

কেদার রায় অবজ্ঞার সঙ্গে তাঁর সভাপণ্ডিতের দিকে পত্রটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আপনি এর একটা উত্তর দিয়ে দিন নির্ভুল সংস্কৃতে। তাতে জানাবেন, সিংহ যদি গিরিশৃঙ্গে উঠে বসে থাকে, তবুও সে একটা পশুই, তার বেশি কিছু নয়।

অর্থাৎ সরাসরি সমরে আহ্বান।

মানসিংহ সসৈন্যে নদী পেরোবার উদ্যোগ করলেন, কেদার রায় তাঁকে স্থলে ও জলে প্রতিহত করতে গেলেন।

এমন কঠিন প্রতি আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়নি মানসিংহকে অনেক দিন। বাঙালি সৈনিকরা প্রত্যেকেই যেন যুদ্ধে নেমেছে প্রাণ পণ করে। কেদার রায়ও তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রায় অলৌকিকভাবে, কখনও তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর একবারে অগ্রভাগে, আবার কখনও তিনি রণতরীতে উঠে তোপ দাগছেন নিজের হাতে। সব শ্রেণির সৈনিকই কখনও না কখনও রাজাকে দেখতে পাচ্ছেন নিজেদের মধ্যে। তিনি ঘুরছেন বিদ্যুৎগতিতে।

প্রথম দিনের যুদ্ধ সমান সমান হলেও দ্বিতীয় দিনে মানসিংহ বাহিনীকে কিছুটা পিছু হটতে হল। কেদার বাহিনীর রণকৌশল বুঝতেই পারছে না মোগলরা। সম্মুখ যুদ্ধে এদের বেশি সৈনিক আসে না, কিন্তু আকস্মিকভাবে দক্ষিণ, বাম ও পশ্চাৎ থেকে অন্যান্য বাহিনী ধেয়ে আসে। এরা এত দ্রুত দিক বদলায় কী করে, বিশেষত পশ্চাৎভাগে?

নদী-নালার দেশের এইসব মানুষ জলের তলায় থাকতে পারে অনেকক্ষণ। এরা নদীর অনেক দূর থেকে ডুব দিয়ে এসে রণতরীর তলদেশে কখন আঘাত করে তা বোঝাই যায় না। এই ভাবে বেশ কয়েকটি রণতরী সলিলসমাধি লাভ করেছে।

মোগলদের কামানগুলি উন্নততর। হস্তিবাহিনীটিও বেশ সুদৃঢ়, সে তুলনায় কেদারের হস্তিবাহিনী নামমাত্র। কিন্তু মোগলপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ও অধিকতর অস্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে আছে কেদার বাহিনীর মনোবল। তাই মোগল পক্ষে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বেশি।

যুদ্ধের নবম দিনে মানসিংহ এবারের মতন পশ্চাৎ অপসারণ করতে বাধ্য হবেন বলে চিন্তা করছেন, এমন সময় একটি সাংঘাতিক কাণ্ড হল।

বর্ষা আসন্ন, তাই কেদার বাহিনী এবার জয়ী হবেই বলে ধরে নিয়েছে, আচম্বিতে এক মোগল সেনাপতি হস্তিপৃষ্ঠ থেকে সোজাসুজি গুলি চালনা করল কেদার রায়ের মস্তক লক্ষ্য করে। সে লক্ষ্য অব্যর্থ। রাজা কেদার রায় অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গেলেন ভূমিতলে। আর উঠলেন না। ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের মৃত্যু ঘটল ঠিক একই ভাবে।

হাহাকার পড়ে গেল বাঙালি বাহিনীতে। অনেকে অস্ত্র ফেলে বুক চাপড়াতে শুরু করল। মোগল বাহিনীর আক্রমণ আরও জোরালো হল এই সুযোগে। কেদারহীন বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

মহারাজ মানসিংহ বিজয়ী বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করলেন রাজধানী শ্রীপুরে।

এখানকার সমস্ত ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের অনুমতি দেওয়া হল তাঁর সৈনিকদের। তিনি নিজে এ রাজ্যের অধিষ্ঠিতা দেবী শিলাময়ীর মূর্তি নিয়ে চলে গেলেন, সোনার শ্রীপুর ধ্বংস হয়ে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই ইশা খাঁর রাজ্য অরক্ষিত মনে করে মগেরা এসে আবার আক্রমণ করে। কিন্তু সে রাজ্য অরক্ষিত মোটেই নয়, নেয়ামতবিবি নিজে অস্ত্র ধারণ করে তাঁর সৈন্যবাহিনী আবার গড়ে তুলেছিলেন। মগদের আকস্মিক আক্রমণ তিনি প্রতিহত করেন, কয়েকদিন লড়াইয়ের পরে তিনি আশ্রয় নেন হাজিগঞ্জ দুর্গে। শত্রুপক্ষের সঙ্গে তিনি যেমন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করলেন, আর কোনো বঙ্গ রমণীর তেমন তেজের কথা কেউ কখনও শোনেনি।

মগরা শেষ পর্যন্ত হাজিগঞ্জ দুর্গে আগুন লাগিয়ে দেয়। নেয়ামত অর্থাৎ সোনাইবিবি শত্রুপক্ষের হাতে কোনোদিন ধরা দেবেন না বলে শপথ করেছিলেন। সেই অগ্নিতে তিনি আত্মাহুতি দিলেন স্বেচ্ছায়।

বঙ্গবাসীদের স্বাধীনতার স্পৃহা ও যুদ্ধের সেখানেই ইতি।

কালক্রমে পদ্মানদী চাঁদ রায়-কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর ও আর অনেকখানি গ্রাস করে কীর্তিনাশা নাম নিয়েছে। ইশা খাঁর রাজ্য ও রাজধানীও ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তাঁর দুর্ধর্ষ বীরত্ব ও কীর্তিরও প্রায় কোনো চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এদেশের মানুষের স্মৃতি থেকেও এঁরা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছেন।

লেখকের কথা :

বঙ্গের বারোভুঁইয়ারা ইতিহাসে বঞ্চিত। বড় বড় ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে শুধু পাঠান-মোগলদের দ্বন্দ্বই স্থান পেয়েছে, বাংলার এইসব বীর যোদ্ধাদের কাহিনি উপেক্ষিত। সে-সব বিবরণ পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ঐতিহাসিক তথ্য যৎসামান্য, অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। আর আছে কিছু কিংবদন্তি, নানা পল্লীকবির গীতিকা, সেসবের মধ্যেও ইতিহাস রক্ষার কোনো অভিপ্রায় দেখা যায় না, আছে উচ্ছ্বাস ও নিজস্ব মনোবাঞ্ছা পূরণ।

সুতরাং ইতিহাসের উপাদানের অভাবে, আমার এই কাহিনিটিকেও একটি আধুনিক কিংবদন্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে, মূল সত্য আদর্শটি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি।
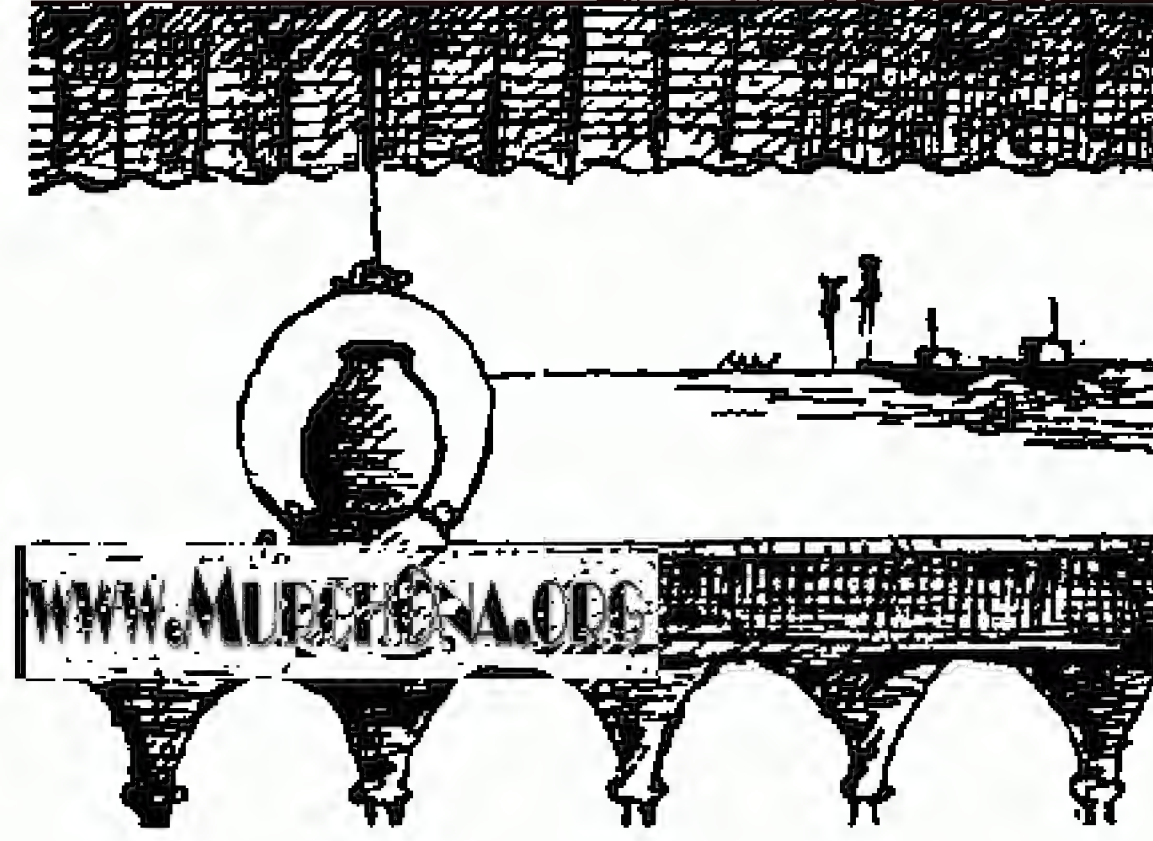
লণ্ঠন সাহেবের বাংলো

একটুখানি ঘুমের চটকা এসেছিল, একটা শব্দ শুনে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন হ্যামিল্টন সাহেব। হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করলেন,—কেডা? কে ওহানে?

অনেকখানি লম্বা ও চওড়া বারান্দা। ওপরে ছাউনি দেওয়া। এখন অন্ধকার। একটা ঝোলানো লণ্ঠন আছে, সেটা আজ জ্বালানো হয়েছিল কি হয়নি, তা সাহেবের খেয়াল নেই।

কোনো উত্তর না পেয়ে হ্যামিল্টন পাশে হাত বাড়িয়ে গেলাসটা খুঁজলেন।

পাশাপাশি দুটি আরামকেদারা। মাঝখানে একটা ছোট তেপায়ায় রাখা থাকে তাঁর গেলাস, মদের বোতল ও জলের পাত্র। এখান থেকেই দেখা যায় গড়াই নদী, অন্ধকারেও দু-একটা নৌকোর বিন্দু বিন্দু কুপির আলো। জ্যোৎস্না রাতে চকচক করে নদীর জল।

হাত বাড়িয়ে গেলাসটা পেলেন সাহেব। সেটা খালি। মদের বোতলটিও নিঃশেষ, একটু তলানিও নেই। তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল।

পেছনে দরজার কাছে আর একবার শব্দ হতেই সাহেব হুঙ্কার দিয়ে বললেন,—কে রে? সাড়া দিস না ক্যান, অ্যাঁ?

উত্তর নেই। তবে বুঝি বাতাসের শব্দ। খুব জোরে হাওয়া উঠলে এই নদীতীরের দোতলা বাংলো বাড়িটাকে মনে হয় ঠিক জাহাজের মতন। যেন একটু একটু দোলে।

তৃতীয়বার শব্দটা হতেই পরিষ্কার বোঝা গেল, তা প্রাকৃতিক হতে পারে না, নিশ্চিত কোনো জীবিত প্রাণীর।

সাহেবের পায়ের কাছে সব সময় রাখা থাকে তাঁর বন্দুক। কোম্পানির লোকেরা এই বাংলো দখল করবে বলে হুমকি দিয়ে রেখেছে। সাহেবকে তাই সদাসতর্ক থাকতে হয়। বন্দুকটা হাতে নিয়ে সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। সারাদিনের নেশায় তাঁর সারা শরীরে টলটলায়মান ভাব, তবু এগোতে এগোতে তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগলেন,—হালা পুঙ্গির পুত, বাস্টার্ড, মাদার..., এক গুলিতে খতম করে দেব। আমারে মারতে আইছস? তোর বউ আইজই বিধবা হইব।

নেশার ঝোঁকে সাহেবের খেয়ালই হল না যে কোনো আততায়ী এলে সে আড়াল থেকে শব্দ করবে কেন?

পেছনের ঘরটার পর্দা সরাতেই প্রথমে দেখা গেল দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। খুব নিচুতে। অর্থাৎ কোনো বড়ো প্রাণী নয়। তার পর বোঝা গেল, সেটা একটা বেড়াল। বেড়ালটা আবার একটা ইঁদুর কামড়ে ধরেছে। ইঁদুরটা এখনো জ্যান্ত, বেড়ালটা সেটাকে মেঝেতে ঠুকে ঠুকে মারার চেষ্টা করছে।

বেড়ালটা কিন্তু সাহেবকে দেখেও ভয়ে পালাবার চেষ্টা করল না। তার মুখের গেরাসটা ফেলে রেখে, সে যেতে রাজি নয়।

সাহেব একেবার বেড়াল সহ্য করতে পারেন না। বেড়াল দেখলেই তাঁর ঘেন্না হয়।

এ-বাড়িতে অনেক ইঁদুর আছে। নদীর ধারে বাড়ি, ইঁদুর তো থাকবেই। দিনের বেলাতেও ইঁদুরদের দৌড়োদৌড়ি করতে দেখা যায়, সাহেবের খারাপ লাগে না। অনেক সময় সাহেবের পায়ের ওপর দিয়েও এক-একটা দৌড়ে যায়, তারা তো কামড়ায় না কিংবা ক্ষতি করে না কিছু। তাঁর বাড়ির ইঁদুর বাইরের বেড়াল মারতে আসবে কেন? এই হলো বেড়ালটা প্রায়ই ঢুকে পড়ে।

সাহেব দু-চারবার হুট-হ্যাট বললেও নড়ল না বেড়ালটা।

একটা বেড়ালকে গুলি করে মারলে সেটা বড্ড বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে যায়। হ্যামিল্টন তবু বন্দুক তুলে বাইরের দিকে তাক করে একবার ফায়ার করলেন।

সেই আওয়াজে বেড়ালটা ল্যাজ তুলে পালাল পড়িমরি করে।

প্রতিদিন অন্তত একবার অপ্রয়োজনেও সাহেবের ফায়ার করা চাই। এই

শব্দটা তাঁর ভালো লাগে। তা ছাড়া আশেপাশের মানুষের ওপর তাঁর আধিপত্য এখনো জারি করা যায়। নীলকুঠির ফ্রেজিয়ার সাহেব ছাড়া এ-তল্লাটে আর কারুর বন্দুক নেই।

ফায়ারিং-এর শব্দ শুনে কাশেম হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল।

—কী হইছে সাহেব? কারে মারলেন।

একটু দূরে এসে দাঁড়িয়েছে কাশেম। সাহেব তার আরদালিকে বললেন, —কাছে আয়, কাছে আয়।

কাশেম কাছে আসতেই হ্যামিল্টন খপ করে তার একটা কান ধরে মুচড়ে দিতে দিতে বললেন,—হারামজাদা, শ্যাখের পো, নিমকহারাম, ডিউটিতে ফাঁকি দ্যাস! আমার বাড়িতে বিড়াল ঢোকে ক্যামনে? দ্যাখতে পারস না?

কাশেম হাসতে হাসতে বলল,—ছাড়েন, ছাড়েন, লাগে। বিলাই ঢুকে পাকের ঘরের জানলা দিয়া। সেহানে তো ফইটকা বইস্যা থাকে। তার দেখনের কথা।

কান ছেড়ে দিয়ে সাহেব বললেন,—চোপ! ফটিকের কাজ রান্না করা আর তর ডিউটি বাড়ি পাহারা দেওয়া আর আমার খিদমদগারি। আমার যে বোতল ফুরাইছে, তা কে দ্যাখব? লণ্ঠনডা জ্বালাইস নাই ক্যান?

—আরও বোতল তো ঘরেই আছে সাহেব।

—ফের মুখে মুখে কথা? লাথ্থি খাবি! ঘরেই থাক আর দোকানেই থাক, আমার চেয়ারের পাশে সব সময় বোতল মজুত রাখা তর ডিউটি।

—এহনি দিতাসি সাহেব। মাফ করেন।

হ্যামিল্টন আবার এসে নিজের আর্মচেয়ারে বসলেন। কাশেম বোতল এনে, তার থেকে গেলাসে কিছুটা ঢেলে, পানি মিশিয়ে সাহেবের হাতে দিল। তার পর বলল,—ফইটকা পুছ করতাছিল, রাত্তিরে কী খাইবেন?

—খামু তোর মাথা। কী দিতে পারবি?

—আপনে যা ইচ্ছা করেন।

—ইচ্ছা করলেই দিতে পারবি? আমার তো ইচ্ছা ইয়র্কশায়ার পুডিং খাইতে। পারবি দিতে?

—ওই বস্তুর কথা তো কিছু জানি না। ফইটকারে কমু।

—ফইটকা বোঝবে কচু। বাড়িতে দুধ আসে? কিশমিস আসে? ফটিকরে ক পায়েস বানাইতে। ইয়র্কশায়ার পুডিং-এর বদলে হেইডা হবে কুমারখালি

পুডিং।...তোর ছুটো পোলাডা আইজ কেমন আছে?

—ভাল না সাহেব। জ্বর ছাড়ে নাই।

—শীত করে? কাঁপুনি দেয়?

—না কর্তা! জ্বরে একেবার শরীল পোড়ায়। হাত দিলে ছ্যাঁকা লাগে।

—এই জ্বর ভালো না। ম্যালেরিয়া না তো? কাইলও যদি জ্বর না ছাড়ে, ওরে যশোর শহরে নিয়া যা। ভালো চিকিৎসক দেখা। খরচাপাতি যা লাগে, আমি দিমু।

—আপনে মেহেরবান।

—কাশেম, আমার এই শরাবের বোতলে একবার চুমুক দিয়া দেখবি নাকি কেমন লাগে?

—কী যে কন সাহেব, তোবা তোবা! আমার ধর্মে ওই বস্তু এক্কেবারে হারাম। ও-কথা শোনলেও পাপ হয়।

—একদিন যদি জোর কইরা তোর মুখে ঢাইল্যা দেই?

—নিশ্বাস বন্ধ কইরা থাকুম সাহেব। মইরা গ্যালেও গলায় নিমু না। ফইটকা মাঝে মাঝে দুই-এক চুমুক দেয়। আমি জানি। ও হারামজাদা...

—চোপ! আবার তুই ফটিকের নামে নালিশ করস? ফটিকও তো কয়, তুই নাকি আমার সোনামুগ ডাইল চুরি কইরা বাড়িতে পাঠাস? সইত্য কথা?

—ডাহা মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা। অমন পাপ করলে আমি দোজখে যামু। আপনে সোনামুগ ছাড়া অন্য কোনো ডাইল খান না, আমি কি তা জানি না? ফইটকাটা শয়তান। ও মাছের মুড়া সব নিজে খায়, আর কাউরে দেয় না।

—আর তুই নাকি ফটিকের বউয়ের দিকে চক্ষু তরল করস?

—ছি ছি ছি ছি! সে আমার মাইয়ার মতন। ওই লক্ষ্মী আর আমার মাইয়া ফতিমা এক্কেবারে সমান সমান। ফইটকা এই কথা কয়? আমি তারে গলা টিপ্যা মারুম।

হ্যামিল্টন হা হা করে হাসতে হাসতে হাতের ইঙ্গিতে কাশেমকে চলে যেতে বললেন।

খানিকক্ষণ হাসির পর তৃপ্ত হয়ে হ্যামিল্টন গেলাসের পানীয়তে চুমুক দিতে লাগলেন।

ফটিক আর কাশেমের এই ঝগড়া তিনি বেশ উপভোগ করেন। ইচ্ছে

করেই তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় থেকে এই দু-জন কর্মচারীকে রেখেছেন। পরস্পরের বিরুদ্ধে এদের নানান অভিযোগ লেগেই আছে। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে ওদের উসকে দেন। আবার এটাও তিনি লক্ষ করেছেন, যতই ঝগড়া করুক, ওদের দু-জনের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য টানও আছে।

দু-গেলাস বেশ দ্রুত শেষ করার পর তিনি পাশ ফিরে তাকালেন পাশের কেদারার দিকে।

এখন সেখানে বসে আছে এক রমণী। তুঁতে রঙের গাউন ও গলায় একটা শাদা স্কার্ফ জড়ানো। সাহেবের পত্নী জেনি।

তাঁর দিকে তাকিয়ে হ্যামিল্টন বললেন,—ডারলিং, লুক অ্যাট দ্য স্কাই। ক্লাউডস গ্যাদারিং, স্টিল ইউ ক্যান সি ফ্লিকারিং অব মুনলাইট... বাই দ্য ওয়ে, তুমি নিজের হাতে যে তিনটে লেবুগাছ লাগিয়েছিলে, তাতে এবারে ফল এসেছে, আজই আমি তোমার গাছের একটা লেবু খেলাম।

ঘণ্টাখানেক বাদে ফটিক খাবার দেবে কি না জিজ্ঞেস করার জন্য ওপরে এসে দেখল হ্যামিল্টন সাহেব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

দু-একবার মৃদু গলায় ডেকেও সে সাড়া পেল না।

মাঝে মাঝেই এরকম হয়, বেশি নেশা করা পর সাহেব কেদারাতেই হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকেন, তাকে বিছানায় নিয়ে যাওয়া যায় না। এভাবেই কেটে যায় সারারাত।

এখন তাকে জাগিয়ে তুলে খাওয়াবারও উপায় নেই। হাজার ডাকাডাকিতেও সাড়া দেবেন না। আর গায়ে ঠ্যালা দিয়ে জাগালে তিনি বীভৎস রকমের গালাগালি দিতে শুরু করবেন। চড়, লাথিও মারতে পারেন।

ফিরে যাবার আগে ফটিক সাহেবের অর্ধসমাপ্ত মদের গেলাসটা তুলে এক চুমুকে মেরে দিল সবটা।

দুই

এই পরগনাটি আগে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। এখন কোম্পানির রাজত্ব আর নেই, বর্তমানে এই পুরো দেশটারই অধিশ্বরী হয়েছেন মহারানি ভিক্টোরিয়া। তাই বিলেতে অবস্থিত কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরসরা দ্রুত সম্পত্তি বেচে দিচ্ছেন দেশীয় জমিদারদের কাছে। আলাদা আলাদাভাবে

প্রত্যেক প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করার বদলে জমিদারদের কাছ থেকে থোক টাকা সংগ্রহ করাই সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক।

এই পরগনাও কিনে নিয়েছেন কলকাতাবাসী এক জমিদার। আগে এখানকার ম্যানেজার ছিলেন চার্লস হ্যামিল্টন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চাকরি গেছে, দেশীয় জমিদার দেশীয় নায়েব নিযুক্ত করেছেন। এলাকার সমস্ত জমি নব্য জমিদারের দখলে এলেও ম্যানেজারের বাংলোটি পাওয়া যায়নি। হ্যামিল্টন কিছুতেই এ-বাড়ি ছাড়বেন না বলে জেদ করে রয়েছেন।

কোম্পানি পড়েছে মহা মুশকিলে। চুক্তি অনুযায়ী সব কিছুই জমিদারের হাতে তুলে দেওয়ার কথা। হ্যামিল্টনকে বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ-উপরোধ, হুমকি, ভীতি প্রদর্শনের পরও সরানো যাচ্ছে না কিছুতেই। জমিদারও এ-বাড়ির অধিকার না পেলে কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করবেন বলে শাসানি দিচ্ছেন।

হ্যামিল্টনের জেদ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তো বটেই। কোম্পানিই যদি সরে যায়, তা হলে তার ম্যানেজারের তো কোনো অধিকারই থাকে না। তবু হ্যামিল্টন বলছেন, এ-বাড়ি তিনি ছাড়বেন না কিছুতেই। কোম্পানি তাকে কলকাতায় একটি বাসস্থান তৈরি করে দেবার জন্য প্রস্তুত, হ্যামিল্টন তাতেও রাজি নন। তিনি কলকাতাতেও যাবেন না, বিলেতেও ফিরে যাবেন না।

ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ার থেকে চার্লস হ্যামিল্টন ভারতে আসেন সতেরো বছর বয়েসে। প্রথম কয়েকবছর তিনি ছিলেন কোম্পানির রাইটার অর্থাৎ কেরানি। তার পর তিনি সিভিল সার্ভিসের ট্রেনিং নিয়ে জেলায় জেলায় ঘুরেছেন। শেষ পঁয়তিরিশ বছর তিনি আছেন এই ইব্রাহিমপুর পরগনায়। আগে ছিলেন সহকারী ম্যানেজার, পরে পুরোপুরি ম্যানেজার। আগে ম্যানেজারের কুঠি ছিল অন্য একটি ছোট বাড়িতে। নদীর ধারে এই সুদৃশ্য দোতলা বাংলো তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বানিয়েছেন। এখানকার সব আসবাবপত্র সাজিয়েছেন তাঁর স্ত্রী। সংলগ্ন বাগানটিতেও আছে তাঁর স্ত্রীর হাতের স্পর্শ। জেনি খুব গাছপালা ভালোবাসতেন, গ্রামে ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন গাছের চারা সংগ্রহ করে লাগিয়েছেন এখানে।

এবং জেনির শেষ-ইচ্ছে মতন তাঁর সমাধিও আছে এই বাগানের একপ্রান্তে।

হ্যামিল্টন সাহেব আর দেশে ফিরে যেতে চান না, কারণ যেখানে তিনি

জন্মেছিলেন, সেটাকে আর তিনি নিজের দেশ মনে করেন না।

ভারতে এসে কাজে যোগদান করা পর মাত্র দু-বার তিনি ফিরে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে, ছুটি কাটাতে। দ্বিতীয়বার তাঁর মন টেকেনি, ফেরার জন্য ছটফট করেছিলেন। সেবারে ফেরার জাহাজেই জেনির সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। অদ্ভুত রকমের প্রকৃতিপাগল সেই মেয়েটি বিয়ের পর আর ফিরতে চাননি ইংল্যান্ডে। এই বাংলাকেই তিনি নিজের দেশ করে নিয়েছিলেন।

হ্যামিল্টন ইংল্যান্ডে তাঁর বাল্য-কৈশোরে যত বছর কাটিয়েছেন, তার দ্বিগুণের বেশি সময় কেটেছে এই বাংলায়। সেখানে তাঁর পিতা-মাতা বেঁচে নেই, নিকট আত্মীয়স্বজনও তেমন কেউ নেই। তিনি এখন ফিরে গেলে কেউ তাঁকে পাত্তা দেবে না। এ-দেশ থেকে বহু টাকা সংগ্রহ করে কিছু কিছু ইংরেজ ফিরে যায় ইংল্যান্ডে। সেখানে জাঁকজমক, বিলাসিতায় ডুবে থাকলেও সমাজে বিশেষ পাত্তা পায় না, বেশিরভাগ মানুষই তাদের কেমন যেন অবজ্ঞার চোখে দ্যাখে। লর্ড ক্লাইভকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। হ্যামিল্টনকে এখানকার কত মানুষ চেনে, তিনি এখানকার ভাষা জানেন, আচার-আচরণও নিখুঁতভাবে শিখেছেন। তিনি সকলের সঙ্গে মিশতে পারেন সমানভাবে। সবচেয়ে বড় কথা, এখানেই তো রয়ে গেল জেনি।

এখন অন্য কোনো কাজ নেই, মদ্যপানেই বেশি সময় কাটে। জেনির মৃত্যুর পর মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে গেছে। মদ্যপান বিশেষ করে তাঁর ভালো লাগে এই কারণে যে নেশা বেশ জমে উঠলে তিনি আর জেনির সঙ্গে বিচ্ছেদ বোধ করেন না। জেনির সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয়, তাঁর নিঃসঙ্গতা কেটে যায়।

এক-একদিন বেলা হতে না হতেই তিনি বোতল খুলে বসেন, সেদিন আর বেরুনোই হয় না বাড়ি থেকে। আবার এক-একদিন তাঁর মেজাজ বেশ ফুরফুরে থাকে সকালবেলা, তখন তিনি পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। পায়ে বুটজুতো, ঢোলা প্যান্ট, ডোরাকাটা কুর্তার ওপরে একটা রং-জ্বলা কালো রঙের কোট পরা, দীর্ঘকায় সাহেবটির মাথার অধিকাংশ চুলই শাদা। কাঁধে ঝোলানো থাকে বন্দুক, হাঁটেন থপথপ করে।

এখানকার অনেক মানুষকেই তিনি ডাকেন নাম ধরে। তাদের কুশল সংবাদ নেন। ঝড়ে কার বাড়ির চাল উড়ে গেছে, কার মেয়েকে কুমিরে টেনে নিয়ে গেছে, সেসব খবরও তিনি মনে রাখেন।

ছোট ছোট কচিকাঁচারা অন্য সাহেব দেখলে ভয় পায়, দৌড়ে পালায়। এই সাহেবকে, দেখলে তারা তাঁকে ঘিরে ধরে চিলুবিলু করে। সাহেব তাদের কারুর গাল টিপে দেন, কারুর মাথার চুলে হাত বুলোন, আবার চিমটিও কাটেন দু-একজনকে।

বড়োরাও তাঁর সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়ায়। কেউ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে এলে তিনি বাধা দিয়ে বলেন,—আরে র র, ছুঁইস না, ছুঁইস না। আমি তো মেলেচ্ছ, আমার পা ছুঁইলে তগো জাত যাইব।

সাহেব যে কিছুতেই বাংলো বাড়ির দখল ছাড়বে না, তা এ-তল্লাটের সব মানুষই জানে। কিন্তু যতই বন্দুক থাক, একা সাহেবের পক্ষে কি জমিদারের পাইক-বরকন্দাজদের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব? সাহেব জানেন, তাঁর আসল জোর, এইসব গ্রামের মানুষের ভালোবাসা। এখানকার মানুষ তাকে ছাড়তে চায় না। কোনো সন্দেহজনক নতুন মানুষকে দেখলে তারা দৌড়ে গিয়ে সাহেবকে আগে খবর দেয়।

সঠিক নামটা উচ্চারণ করতে পারে না বলে অনেকেই আড়ালে হ্যামিল্টন সাহেবকে বলে লণ্ঠন সাহেব। তাঁর বাংলোর বারান্দায় সারারাত একটা ঝুলন্ত লণ্ঠন জ্বলে, সেটাও একটা কারণ। আবার কেউ কেউ যে বলে পাগলা সাহেব, তাও হ্যামিল্টনের কানে এসেছে। তিনি তা শুনে হাসেন। পাগল সাজতে তাঁর আপত্তি নেই।

সাহেব যখন এখানে প্রথম আসেন, তখন এখানে বাজার-হাট কিছু ছিল না। স্থানীয় মানুষকে অনেক কষ্ট করে মনসাগঞ্জের হাটে যেতে হত। তাও বর্ষাকালে নৌকো ছাড়া সেখানে যাওয়ার আর কোনো উপায় ছিল না। মানুষের অসুবিধের কথা বিবেচনা করেই হ্যামিল্টন নদীর ধারে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দুটি দোকান স্থাপন করেছিলেন। সে প্রায় সতেরো বছর আগেকার কথা। এখন সেখানে রীতিমতন একটি বাজার গজিয়ে উঠেছে, তেরো-চোদ্দোটি দোকান। এ-বাজারের সঙ্গে কোম্পানির কোনো সম্পর্ক ছিল না। সম্পূর্ণটাই হ্যামিল্টনের নিজস্ব উদ্যোগ। লোকের মুখে মুখে নাম রটে গিয়েছিল 'চার্লস বাজার'। এখন সেটাই বিকৃত হয়ে 'চালিয়া বাজার'। এই নদী দিয়ে স্টিমার চালু হবার পর বাজারটি দিন দিন আরও জমে উঠছে।

হ্যামিল্টনের এই নিজস্ব বাজার থেকে কিছু আয় হয়। দোকানদারেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই নিয়মিত কর দেয়। কিন্তু সাহেবের অর্থের তেমন প্রয়োজন

নেই, লালসাও নেই। এখান থেকে যা অর্থ পান, তা গরিব মানুষদের জন্য খরচ করেন। সাহেব খেয়ালি মানুষ, কেউ কন্যাদায় কিংবা পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চাইলে তিনি মুখভেটকি দিয়ে বিদায় করে দেন, আবার কারুর গুরুতর অসুখের খবর পেলে কিংবা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজন কিংবা কেউ তীর্থযাত্রায় যেতে চাইলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুঠো মুঠো পয়সা দেন।

দূরদেশ থেকে একজন এসে এখানে নতুন কচুরি-জিলিপির দোকান খুলেছে। সে দোকানের পাশ দিয়ে যেতে গেলে ভুরভুর করে খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ পাওয়া যায়।

দোকানের একপাশে পাতা একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে হাঁক দিলেন, —কই রে, দে, জিলিপি-হালুয়া কী আছে দে!

গলায় পইতে জড়ানো মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি হাতজোড় করে বলল, —পেন্নাম হই সাহেব। হালুয়া ফুরাইয়া গেসে, জিলাপি দিমু?

সাহেব বললেন,—তাই দে।

লোকটি জানে, সাহেব কচুরি পছন্দ করেন না। মিষ্টদ্রব্য ভালোবাসেন। একটি কলাপাতায় সে চারখানা জিলিপি সাজিয়ে এনে দিল।

সাহেব ভুরু তুলে বললেন,—মোটে এই কয়খান? এ তো নস্যি! তোর ঝুড়িতে কতগুলান আসে? নিয়ায় সব নিয়ায়। দ্যাখোস না, আমার প্যাটখান কত বড়। আমার রাইক্ষসের মতন খুদা!

লোকটি এক ঝুড়িভরতি জিলিপি নিয়ে এল।

সাহেব তা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে হেঃ হেঃ করে হাসলেন। তার পর রাস্তার উলটোদিকে দাঁড়ানো দুটি শিশুর দিকে চেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন,—আয়, আয়।

দুটি শিশুই আঙুল চুষছিল, দৌড়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

সাহেব বললেন,—তগো আঙ্গুলে কি মধু থাহে? খা, জিলিপি খা, যে কয়টা পারস।

বাচ্চাদুটো ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝুড়ির ওপর।

কী করে খবর রটে যায় কে জানে। প্রায় চোখের নিমেষেই যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আরও দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে। কে কত বেশি খেতে পারে শুরু হয়ে গেল তার প্রতিযোগিতা। তাদের মুখ আর হাত রসে মাখামাখি।

সাহেব প্রসন্নমুখে দেখতে লাগলেন সেই জিলিপি উৎসব।

হঠাৎ তিনি লক্ষ করলেন, একটি বাচ্চা মেয়ের একচোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। একে তো ঠিক আনন্দের অশ্রু বলা যায় না। যদি তাই হয়, তাই বা শুধু এক চোখে হবে কেন?

তিনি মেয়েটির থুতনি ধরে জিজ্ঞেস করলেন,—অ্যাই, কান্দোস ক্যান?

মেয়েটি বলল,—কান্দি না তো!

সাহেব বুঝলেন এটা এক ধরনের চোখের অসুখ। আগেও কয়েকজনকে দেখেছেন। বিনা চিকিৎসায় এই রোগে কেউ কেউ অন্ধ হয়ে যায়। মাঝে মাঝেই অন্ধ মানুষও চোখে পড়ে এ-অঞ্চলে।

সাহেব মনে মনে সংকল্প করলেন, শহর থেকে একজন চক্ষুরোগের চিকিৎসক আনাতেই হবে। অন্তত কয়েকদিনের জন্য।

তিন

যেদিন নেশা তেমন জমে না, সেদিন হ্যামিল্টনের সমস্ত শরীর অস্থির অস্থির লাগে। সেদিন রাতে পাশের কেদারায় জেনিকেও দেখা যায় না। মনে মনে সাধ্যসাধনা করতে থাকেন, জেনি কাম, প্লিজ কাম। মাই ডারলিং, হোয়্যার আর ইউ?

তারপর একসময় উঠে গিয়ে বারান্দার রেলিং ধরে জেনির কবরের দিকে তাকিয়ে গলা ফাটিয়ে ডাকেন, জেনি, জেনি!

সেই আকুল আহ্বান হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে যায় নদীর ওপর দিয়ে। ঝিকমিক করে আকাশের তারা। কোথ নৌকা থেকে শোনা যায় ভাটিয়ালি গান। চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সাহেবের গলা ভেঙে যায়, দূর থেকে শুনলে মনে হয় কোনো ক্লান্ত রাতপাখির ডাক।

প্রায় সারারাত জেগে থাকার ফলে ভোর থেকে সাহেব ঘুমোন অনেক বেলা পর্যন্ত। খিদমদগাররা তাঁকে ডাকবার সাহস পায় না।

একদিন ডাকতেই হল।

একজন কেউকেটা ধরনের ব্যক্তি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর তিনজন পাহারাদার। তাদের তিনজনেরই হাতে বল্লম। এখন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে পড়েছে, এ-সময়ে ঘুমোচ্ছেন শুনে তিনি বিশ্বাস করছেন না।

ডাকাডাকিতে শেষপর্যন্ত উঠে বসে সাহেব হুংকার দিলেন,—ক্যান ডাকলি রে শুয়ার!

কাশেম হাতজোড় করে কাঁচুমাচু গলায় পুরো বৃত্তান্তটি জানাল।

সাহেব একটা কুর্তা গায়ে জড়িয়ে নিলেন কোনোরকমে। মুখ ধুলেন না। চক্ষু রক্তবর্ণ। বন্দুকটা হাতে নিয়ে তিনি দুপদাপ করে নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে।

সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন এক আগন্তুক। পোশাকের জাঁকজমক দেখে তাঁকে একজন বিশিষ্ট মানুষ বলেই মনে হয়। একটা জরির কাজ করা কুর্তা গায়ে, মাথায় পাগড়ি। মুখে অভিজাতসুলভ চাপা অহংকারের ভাব।

সেসব অগ্রাহ্য করে হ্যামিল্টন বললেন,—হু আর ইউ? কী চাই?

আগন্তুক বললেন,—মে আই টক টু ফর এ হোয়াইল?

হ্যামিল্টন বললেন,—হু সেন্ট ইউ? আমার সঙ্গে কারো তো কোনো কথার প্রয়োজন নেই!

আগন্তুক আবার বললন,—আই উইল টেক ওনলি ফিউ মিনিটস অব ইয়োর টাইম।

সাহেব প্রায় ধমকের সুরে বললেন,—আপনি বাংগালি? বাংগালি হয়ে বাংগালায় কথা বলতে পারেন না? কে আপনি? কে আপনাকে পাঠিয়েছে? জমিদারের নায়েব নাকি?

ব্যক্তিটি এবার স্মিতহাস্যে বললেন,—না, আমাকে নায়েব পাঠায়নিকো। আমি নিজেই এসেছি। এই অধমের নাম শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর।

পেছনের পাহারাদারদের একজন বললেন,—ইনিই স্বয়ং জমিদার।

সাহেব বললেন,—ঠাকুর? নতুন জমিদার? আপনি নিজে এসেছেন কি এই কুঠিবাড়ির দখল নিতে? আগেই বলে রাখি, আমি জীবন থাকতে এ-বাড়ির দখল দেব না। আপনি যা খুশি করতে পারেন!

—আমি দখল নিতে আসিনি। তেমন উদ্দেশ্য থাকলে আমার নিজের আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

—তবে?

—আপনি আমাদের অতিথি। আপনার রক্ষণাবেক্ষণ আমাদেরই কর্তব্য। আমি জ্ঞাত আছি যে এ-বাড়িতে আপনার সহধর্মিনীর পবিত্র স্মৃতি আছে। আমরা কোনোক্রমেই তা নষ্ট করতে চাই না। মিস্টার হ্যামিল্টন, আপনি

এ-বাড়িতে যতদিন খুশি থাকবেন, আজীবন থাকুন, তাতেই আমরা ধন্য হব। এ-বাড়ির সংস্কার, মেরামতির ব্যয়ও আমার এস্টেট বহন করবে, যখন যা প্রয়োজন জানাবেন আমাদের।

হ্যামিল্টন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইলেন দ্বারকানাথের দিকে। তিনি শুনেছিলেন, নব্য জমিদারশ্রেণি খুব অর্থলোভী হয়। প্রজাদের টাকায় শহরে বসে আমোদ বিলাসিতায় বহু অর্থ ব্যয় করে। এ যে শুনছেন উলটো কথা!

তিনি বললেন,—আমি দুঃখিত, ঠাকুরবাবু। আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আমি এখন আপনার প্রজা, আপনাকে অবশ্যই মান্য করা উচিত। ভেতরে আসুন, আসন গ্রহণ করুন।

দ্বারকানাথ পা থেকে নাগরাজুতো খুলে ফেলতে লাগলেন।

—একী, জুতো খুলছেন কেন?

—এ-বাড়ি আপনার স্ত্রীর স্মৃতিমন্দির। আমাদের দেশে এসব স্থানে খালি পায়ে ঢোকাই প্রথা।

—আরে না না। ওসব কিছু না। আমরা ওসব মানি না। বাগানে আমার স্ত্রীর কবর আছে। আমি মরলে আমার দেহটিকেও সেখানে স্থান দেবেন, তাই যথেষ্ট। বসেন, বসেন। মাফ করবেন, আপনার উপযুক্ত কেদারা নেই, সবকিছু ভালোভাবে সাফ করাও হয় না।

—আমি বেশিক্ষণ আপনার সময় নেব না। এ-বাড়ি আপনার। আপনাকে আর বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না। আমার লাঠিয়ালরাই এই গ্রাম পাহারা দেবে।

—এবার আমার একটা বক্তব্য শুনুন। আমি কারুর দান নিতে অভ্যস্ত নই। আমি ইংরেজ, এ-দেশে জোরজুলুম করে দখলদারি করতেই আমরা অভ্যস্ত। দান তো নিতে পারি না। এ-বাড়ি আমি ছাড়তে চাই না, তাও ঠিক। আপনি আমাকে এ-বাড়িতে আজীবন অধিকার দিতে চান, এটা আপনার মহানুভবতা, কিন্তু এর বিনিময়ে আমিও আপনাকে কিছু দিতে চাই।

দ্বারকানাথ হাতজোড় করে বললেন,—আমি কিন্তু বিনিময়ে কিছু পাবার প্রত্যাশা নিয়ে এখানে আসিনি। আপনি মুখে যে বললেন...

সাহেব বললেন,—ঠাকুরবাবু, এখানে একটি বাজার আছে। তার মালিকানা কিন্তু কোম্পানির নয়, আমার। এই বাজারটি আপনি গ্রহণ করুন। আমি বুঝতে

পারি, নতুন স্টিমার স্টেশন হলে বাজার আরও জমজমাট হবে। আয় আরও বাড়বে। তখন রাস্তা, স্যানিটেশনের ব্যবস্থাও করা দরকার। আমার স্বাস্থ্য ভালো না, আমি আর এতসব পারব না। আপনি ভার নিন। গ্রামদেশে বহু গরিব, বিশেষত শিশুদের যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন...এ-অঞ্চলে একপ্রকার অদ্ভুত চক্ষুরোগ হয়, বেশ কিছু বালক-বালিকা যাতে অন্ধ হয়ে যায়। তাদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নাই। আপনি যদি এই অন্ধদের সাহায্যের জন্য...

দ্বারকানাথ গদগদ কণ্ঠে বললেন,—আপনার কথা শিরোধার্য। আমি অন্ধ-আতুরদের সাহায্য ও চিকিৎসার জন্য অবশ্যই সবরকম উদ্যোগ নেব।

তারপর দু-জনে করমর্দন করলেন আন্তরিকভাবে।

জমিদার দ্বারকানাথ যে এই পাগলাটে মানবদরদী সাহেবটিকে বাস্তুচ্যুত করেননি, সেজন্য স্থানীয় মানুষরা ধন্য ধন্য করতে লাগল। ইংরেজ কুঠিয়াল ও শাসকশ্রেণিও জমিদারের এই বদান্যতায় খুব খুশি, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল দ্বারকানাথের প্রশংসা।

এরপর থেকে হ্যামিল্টন সাহেবের জীবনও নির্বিঘ্ন হয়ে গেল। আর বন্দুক কাঁধে নিয়ে বাড়ি পাহারা দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এমন নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা তাঁর যেন ঠিক সহ্য হল না। আগে সবসময় যে প্রতিরোধের স্পৃহা আর জেদ নিয়ে ঘুরতেন, তাতে সবসময় শরীরে উত্তেজনা সঞ্চারিত থাকত। এখন শরীর কেমন যেন শিথিল শিথিল লাগে।

এখন প্রায় রাতেই পাশের কেদারায় আর জেনির দেখা পাওয়া যায় না। সাহেব নেশার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন, তবু জেনির পাত্তা নেই।

এক রাতে সাহেব বারান্দায় রেলিং ধরে জেনি জেনি বলে চিৎকার করছেন, নীচের তলায় কাশেম আর ফটিক বসে বসে শুনছে। আজ যেন চিৎকারের প্রাবল্য অনেক বেশি, তীব্র আর্তনাদের মতন, তা খানখান করে দিল গ্রামবাংলার শান্ত নির্জনতা। এ-সময় ওরা সাহেবের ধারেকাছে যায় না, অথচ নিজেরাও ঘুমোতে পারে না।

রাত্তিরে সাহেব কক্ষনো নীচে নামেন না। সে-রাতে একসময় কাঠের সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ করতে করতে তিনি নীচে নেমে, বাগানের মধ্যে জেনির কবরের কাছে গিয়ে বুক-ফাটানো কান্নার সঙ্গে ডাকতে লাগলেন,—জেনি, জেনি, মাই ডারলিং, ডোন্ট লিভ মি...

কাশেম আর ফটিক ঘরে বসে থাকতে পারল না। তারাও ছুটে গেল বাগানে। স্ত্রীর কবরের পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন হ্যামিল্টন। তাঁর শরীরে প্রাণের স্পন্দন নেই।

হ্যামিল্টন যথাবিহিত সৎকারের কয়েকদিন পরেই ঠাকুরদের খুরসিয়াদপুরের কাছারির নায়েব এসে দখল নিয়ে নিল সেই বাড়ির।

দ্বারকানাথ এখন বিলেতে। সেখানে তাঁর অভূতপূর্ব বিলাসিতার চাকচিক্য দেখে ইংরেজদেরও তাক লেগে গেছে। স্বয়ং মহারানি ভিক্টোরিয়াও খোঁজখবর নিচ্ছেন তাঁর।

দ্বারকানাথ এক হিসেবে হ্যামিল্টনের কথা রাখলেন। কুমারখালির অন্ধ-আতুরদের সাহায্য করলে ক-জন আর সে খবর জানবে? তিনি অবশ্য ওসব বিবেচনা করার সময় পাননি। বিলেতে স্থানীয় অন্ধদের চিকিৎসার জন্য একটা ব্লাইন্ড ফান্ড খুলে চাঁদা তোলা হচ্ছিল। দ্বারকানাথ সে ব্লাইন্ড ফান্ডে দান করলেন দশ সহস্র মুদ্রা।

সে-জন্য লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সুখ্যাতি, সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল এই বিবরণ। ইতিমধ্যেই ইংরেজরা এই ভারতীয় জমিদারকে প্রিন্স দোয়ারকানাথ বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছে।

বৃষ্টি-বজ্রপাতের সেই রাতে

হ্যাঁ, ধুমধাম হয়েছিল বটে অমরেন্দ্রনাথের বিয়ের উৎসবে। এখনও নানা কথা প্রসঙ্গে সেই স্মৃতির কথা এসে পড়ে। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের বিয়ের আড়ম্বরের সঙ্গে তুলনা হয়।

সময়টা ভালো ছিল না। পঁয়ষট্টি সালে খামোখা ভারত-পাকিস্তানের একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে, যাতে দুটো দেশেরই প্রবল ক্ষতি ছাড়া লাভ হয়নি বিন্দুমাত্র। পশ্চিমবাংলায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে প্রচুর কলকারখানা, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে, প্রায় প্রতিদিনই রাস্তাঘাটে বিক্ষোভ, মিছিল, পুলিশের টিয়ারগ্যাস ও গুলি। এরকম সময় সামাজিক উৎসবে এত অর্থ ব্যয় খুবই দৃষ্টিকটু লাগে। কিন্তু বাংলার ক্ষয়িষ্ণু বনেদি পরিবারগুলি এখনও যেন এ সব ব্যাপারে একেবারেই সচেতন হয়নি। নিজেদের ধারা বজায় রাখার প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

খাস কলকাতার উপকণ্ঠে এককালের মফস্সলের ছোটবড় জমিদারদের অনেক বাগানবাড়ি ছিল। জমিদার প্রথা কাগজে-কলমে শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই তাদের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল ধ্বংস প্রতিক্রিয়া। সেই সব বিশাল বিশাল বাড়িগুলি আস্তে আস্তে সংরক্ষণের অর্থের অভাবে ভগ্নস্তূপ হয়ে যাচ্ছিল, জবরদখলও হয়ে যাচ্ছিল অনেক, আর কোথাও কোথাও শরিকি ভাগাভাগিতে সে সব বাড়িতে আর বনেদি প্রাসাদ বলে চেনার উপায় ছিল না।

কাশীপুরের ঘোষালদের বাড়িতে অবশ্য তখনও তেমন খারাপ অবস্থা হয়নি।

জমিদারতন্ত্রের পতনের চিহ্নগুলি পদ্মনাভ ঘোষাল আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। ঘোষালদের জমিদারি ছিল ওড়িশার বালেশ্বরে আর মেদিনীপুরে ঘাটালে। পদ্মনাভ ঘোষাল সে সব জায়গায় থেকে জমিদারি গুটিয়ে এনে যাবতীয় সঞ্চিত অর্থ ঢেলেছিলেন ব্যবসায়। জমিদারদের সাধারণত ব্যবসাবুদ্ধি থাকে না, কী করে অর্থ উপার্জন করতে হয়, সেটাই তাঁরা শেখেন না। সে সব কাজ নায়েব-গোমস্তাদের, তাঁরা শুধু হুকুমের জোরে অর্থ পেতেই অভ্যস্ত। এই প্রণালীতে ব্যবসা চালাতে গেলে ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী। আর কিছু কিছু জমিদার এইভাবে ডুবলেও পদ্মনাভ ঘোষাল এ ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, তাই তিনি সরাসরি কোনো ব্যবসায়ে না নেমে জার্ডিন হ্যান্ডারসন নামে এক বিলেতি কোম্পানির সঙ্গে পার্টনারশিপে চুক্তিবদ্ধ হলেন। এরা চা ও পাটে বিশেষজ্ঞ।

জমিদারি থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে এই ব্যবসায়ে নিজেকে বেশ ভালোই জড়িয়ে নিয়েছিলেন পদ্মনাভ ঘোষাল, কিন্তু বেশিদিন তিনি এ সব ভোগ করলেন না। কুচবিহারের দিকে একটা চা-বাগান পরিদর্শন করে তিনি একটা জিপ গাড়িতে ফিরছিলেন। অল্প সন্ধেবেলা। সঙ্কোশ নদীর ধারে একপাল হাতি দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তা জুড়ে। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। একসময় হাতির পাল স্বেচ্ছায় সরে যায়, তাদের জোর করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাই বৃথা। বাড়ি ফেরার তাড়ায় হয়তো পদ্মনাভ অধৈর্য হয়েছিলেন, কিংবা জিপ চালকের দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, সে হাতির পালকে বাঁ-দিক রেখে নদীতে নেমে এগিয়ে যেতে চায়। জিপটিতে মোট আরোহীর সংখ্যা ড্রাইভারকে নিয়ে সাত, তাদের মধ্যে ছ জনেরই তেমন কোনো বিপদ হয়নি, জিপটা উলটে যাওয়ার পর মাথায় পাথরের আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে একজনেরই মৃত্যু হয়। পদ্মনাভ ঘোষালের।

তাঁর স্ত্রী শকুন্তলা তখন পূর্ণ যুবতী। এক ছেলে ও এক মেয়ের বয়স যথাক্রমে ষোলো ও এগারো। আর পদ্মনাভর কাকা ও দুই খুড়তুতো ভাই মিলে তিন শরিক। ব্যবসায়ে সাফল্যের পুরোপুরি কৃতিত্বই পদ্মনাভর, কিন্তু পুরনো শরিকিপ্রথা তো রয়েই গেছে। তারা ঘুমন্ত অংশীদার। ক্ষতি কিংবা ঋণ হলে তাদের কোনো দায় নেই, কিন্তু লাভের অংশ তারা বাড়ি বসে পেতে চায়।

পদ্মনাভর কাকা ভালোমানুষ ধরনের। গানবাজনা নিয়েই মেতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে পদ্মনাভর সুসম্পর্কই থেকেছে বরাবর। শরিকি ভাগ হিসেবে তাঁর যা প্রাপ্য তার চেয়ে কিছুটা বেশিই দিতেন পদ্মনাভ। মাঝে মাঝে তিনি কাকার গানবাজনার আসরে গিয়েও বসতেন।

খুড়তুতো ভাই দুটির মধ্যে বড়টি বিজ্ঞানের অধ্যাপক, শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছেন, থাকেন নিউ আলিপুরে, এ দিককার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না। পরের ভাই উকিল এবং অতি ধুরন্ধর। এক বিধবা রমণী ও তার নাবালক পুত্রের কাছ থেকে পুরো সম্পত্তি গ্রাস করা চেষ্টায় সে মেতে উঠল। তার নাম অরুণাভ, যেমন তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মুখের ভাষা তেমনই মিষ্টি।

শকুন্তলা বনেদি সম্পন্ন পরিবারের সুন্দরী বউ। সারাদিন পটের বিবি সেজে থাকাই যেন তার কাজ। বিধবা হওয়ার আগে তার সম্পর্কে এরকমই ধারণা ছিল অন্যদের। সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলার পর তার ভেতর থেকে যেন ফুটে বেরুতে লাগল অন্য এক ব্যক্তিত্ব। টনটনে বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন এক জেদি রমণী এবং স্পষ্টবক্তা।

বিবাহিত জীবনের অনেকগুলি বছর এই পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী অন্তঃপুরবাসিনী হয়েই ছিলেন শকুন্তলা, স্বামীর সঙ্গ কিংবা খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়জনের সঙ্গ ছাড়া বাইরে বেরুতেন না। তা বলে তিনি যে কলকাতার পথঘাট চেনেন না, তা তো নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী ছিলেন, বন্ধুদের সঙ্গে কফি হাউজে আড্ডা দিতেন, দল বেঁধে সিনেমা দেখতে আসতেন মেট্রো-লাইট হাউজে।

অকস্মাৎ স্বামী বিয়োগের পর শোক সামলে উঠে শকুন্তলা সংসার এবং ব্যবসা, দুটোরই হাল ধরলেন। ডালহৌসি স্কোয়ারের মিশন রো-তে জার্ডিন হ্যান্ডারসনের সঙ্গে তাঁদের যে যৌথ অফিস আছে, সেখানে গিয়ে সিনিয়র পার্টনারের নিজস্ব ঘরে শকুন্তলা গিয়ে বসতে লাগলেন নিয়মিত। দেখতে লাগলেন হিসেবপত্র। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সেখানকার কেরানিরা দু-দিনেই বুঝতে পেরে গেল ইনি মোটেই সহজপাত্রী নন। এঁকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে কিছু ভুল বোঝানো মোটেই সম্ভব নয়।

শ্রাদ্ধের কাজকর্ম মিটে যাওয়ার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই অরুণাভ এল শকুন্তলার সঙ্গে দেখা করতে। সন্ধের একটু পর। জুলাই মাস, প্রবল গরম, তারই মধ্যে অরুণাভ পুরোদস্তুর সুট পরা। তাকে সুপুরুষই বলা যায়। যে

কোনো কারণেই হোক, এই সব জমিদারবাড়ির পুরুষদের কারুরই গায়ের রং কালো হয় না, কেউই রোগা, বেঁটে নয়। শুধু এরই মধ্যে অরুণাভর মাথার সামনের দিকটায় কিছুটা টাক পড়ে গেছে।

শকুন্তলা কালো পাড়, শুভ্র বসন পরা, অলঙ্কারগুলি সব খুলে ফেলেছেন, তবু তাঁর সোনার অঙ্গ। ভরপুর স্বাস্থ্য একটু ভারীর দিকে, অনেকটা দেবী দেবী ভাব। কিছুদিন হল তিনি সরু, সোনালি ফ্রেমের চশমা পরছেন।

অরুণাভ আর শকুন্তলা প্রায় সমবয়েসি। দেওর-বউদি হিসেবে তাঁদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারত, তা হয়নি। সব সময়েই হেসে হেসে খুব সূক্ষ্ম ভাবে বাক্‌যুদ্ধ চলে। শকুন্তলা এসে ঘরে ঢুকতেই তার পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য ঝুঁকে এল অরুণাভ।

ত্রস্তে সরে গিয়ে শকুন্তলা বললেন, এই না, না, এখন প্রণাম নিতে নেই। বসো, বসো। তুমি এসে খুব ভালো করেছ, আমি নিজেই তোমাকে খবর দিতাম।

দশ দিনব্যাপী শ্রাদ্ধ-শান্তি উৎসবের মধ্যে অরুণাভ এসেছে, তখন শকুন্তলার সঙ্গে আলাদা করে কথা হয়নি।

অরুণাভ বলল, 'বউদি, তোমাকে জানানো হয়নি। রাঙাদার খবরটা যখন আমি হঠাৎ শুনি, আমার বুকে যেন একটা বুলেট লেগেছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। জলজ্যান্ত মানুষটা, কোনো অসুখ বিসুখ নেই...'

এই ধরনেরই কথা কত জনের কাছ থেকে যে শুনছেন শকুন্তলা তার ইয়ত্তা নেই। কার আবেগ কতটা সত্যি আর কতটা কৃত্রিম, তা বোঝা না গেলেও এক সময় শুনতে শুনতে একঘেয়ে লাগে।

তবু এই সময় মুখখানা নিরেট ও শুষ্ক করে রাখতেই হয়।

অরুণাভ বলেই চলেছে, 'জলপাইগুড়ি যাওয়ার আগের দিনই দাদা আমাকে বলেছিল, ছোট্টু, তোর সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। তোকে আমার অনেক দায়িত্ব নিতে হবে, আমি একা সব পারছি না সামলাতে।'

এ সব সত্যি না মিথ্যে, তা আর প্রমাণ করার উপায় নেই। শকুন্তলা অবশ্য এর একবিন্দুও বিশ্বাস করলেন না। তাঁর স্বামীর মুখের ভাষা এরকম ছিল না।

একটু ফাঁক পেয়ে তিনি বললেন, 'তোমার মেয়ে এখন কেমন আছে?

তার অনবরত বমি হচ্ছিল শুনেছিলাম।'

অরুণাভ বলল, 'ওটা এক ধরনের অ্যালার্জি। ঠিক ধরা যাচ্ছিল না। এখন ঠিক ওষুধ পড়েছে, ভালো আছে।'

শকুন্তলা বললেন, 'আর তোমার ছোট ছেলেটি? সে মামাবাড়িতেই মানুষ হচ্ছে? অনেক দিন তাকে দেখিনি, একদিন নিয়ে এস—'

এই সব খেজুরে আলাপ করার জন্যে অরুণাভ আজ আসেনি।

ঠিক প্রসঙ্গে ফিরে আসার জন্য সে বলল, 'বউদি, দাদা যে কথাটা বলেছিলেন, সেটা আমি ভুলত পারি না। যদিও ইদানীং আমি কাজেকর্মে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, তবু দাদার আত্মার শান্তির জন্যে আমি এখানকার কাজের অনেকটা দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। দাদার বিজনেস অফিসের কাছেই তো আমার চেম্বার।'

নিপুণ অভিনেত্রীর মতো খুবই বিস্ময় প্রকাশ করে শকুন্তলা বললেন, 'ও মা, এ কথা তো আগে বলোনি। আমি তো যা শুনেছি, তুমি সদা ব্যস্ত, দারুণ পসার হয়েছে। তাই আমি কিছু বলতে সাহস পাইনি। তোমার সাহায্য পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। কিন্তু গত সপ্তাহেই আমি একজন রিটায়ার্ড আই এ এস অফিসারকে ম্যানেজার নিযুক্ত করে ফেলেছি। তিনিই সব কাজকর্ম দেখবেন আর আমার কাছে রিপোর্ট করবেন।'

হা হা করে হেসে উঠে অরুণাভ বলল, 'কী যে বলো! ম্যানেজার! আমি তো সে কথা বলিনি। ম্যানেজার তো মাইনে করা, তাই না? আমি তো টাকাকড়ি কিচ্ছু চাই না। আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপার, এর যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, আর তুমি খাটতে যাবে কেন, ওই ম্যানেজার আমার কাছেই রিপোর্ট করবে! তুমি জানো না, এই সব ম্যানেজাররা যা হয়, একটু অসাবধান হলেও চুরি করে ফাঁক করে দেয়। আমি থাকলে...'

শকুন্তলা বলল, 'বাড়িতে বসে থেকে থেকে আমার বাত হয়ে যাচ্ছে। এখন অফিসে যাচ্ছি, বেশ ভালো লাগছে। আমি মেয়ে বলে আমাকে ঠকাবে? ঠাকুরপো, মেয়েরা এখন আর ললিত লবঙ্গলতা হয়ে নেই। তারা কর্পোরেট হাউজের সি ই ও হচ্ছে, তারা কমার্শিয়াল প্লেন চালাচ্ছে। যা হোক, তুমি যে সাহায্যের কথা বললে, তাই তো যথেষ্ট। আমার তেমন দরকার হলে নিশ্চয়ই তোমাকে খবর দেব।'

একজন পরিচারিকা এসে বড় রুপোর রেকাবিতে নানারকম মিষ্টদ্রব্য

সাজিয়ে এনে দিল। সঙ্গে এক গ্লাস বেলের পানা। সেই ফ্রস্টেড কাচের গেলাসটি এক টুকরো ঝালর দিয়ে ঢাকা।

সে দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল অরুণাভ। বেলের পানা? এখন তার হুইস্কি পানের সময় হয়ে গেছে। মিষ্টি খাওয়া তার নিষেধ, রক্তে চিনি এসে গেছে। তবু একটা তালশাঁস সন্দেশ তুলে মুখে দিয়ে সে বলল, 'বউদি, তুমি যে বললে, তুমি আমাকে খবর দিতে কোনো কারণে...'

শকুন্তলা সরল মুখ করে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের এস্টেটের সলিসিটার সি এন বসাককে তো তুমি চেনো। তিনি গত সপ্তাহে আমাকে বললেন, তোমার বাবা আর তোমাদের দু-ভাইকে যে শরিকি মাসোহারা দেওয়া হত, সেটার টার্ম অনেকদিন শেষ হয়েছে। আর দেওয়ার দরকার নেই।'

অরুণাভ এবার একজন শিকারি প্রাণীর মতো সমস্ত শরীরে আঁটো হয়ে বলল, 'তার মানে?'

শকুন্তলা বললেন, 'সেই তো, মানেটা তো আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি। তাই তোমাকে ডেকে আলোচনা করব ঠিক করেছিলাম।'

অরুণাভ বলল, 'বসাককাকার বয়েস হয়েছে অনেক, মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। কয়েক জেনারেশন ধরে এই জমিদারি এস্টেটে আমাদের শরিকি বন্দোবস্ত আছে। তা হঠাৎ খারিজ হয়ে যাবে কী করে? অ্যাবসার্ড!'

শকুন্তলা বলল, 'দলিলপত্রে নাকি দেখা গেছে, জমিদারি এস্টেট বলেই কিছু আর নেই। নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে এই এস্টেটের এত ঋণ জমে গিয়েছিল যে হাইকোর্ট থেকে খানিকটা সময় দিয়ে সব সম্পত্তি নিলামে তোলার অর্ডার হয়েছিল। আর সেই ঋণ শোধ করার জন্য তোমরা কোনো দায়িত্ব নিতে চাওনি।'

অরুণাভ রক্তাভ মুখে বলল, 'অত ঋণ কী করে হল, আমরা তার ব্যাখ্যা চেয়েছিলাম।'

শকুন্তলা বলল, 'তার তো সময় ছিল না। তখন তোমার রাঙাদা নিজের যা কিছু ছিল, ওঁর খুব দামি ক্রিস্টাল সেট ছিল মনে আছে? সেইসব বিক্রি করে দিল, প্লাস আমার গয়না, আমার বাবার কাছ থেকেও কিছু সাহায্য নিয়ে নিলামে পুরো জমিদারিই আমার নামে কিনে নেন। অর্থাৎ এস্টেট বলে আর কিছু রইল না। এতটা আমিও জানতাম না। তোমাদের তো মাসোহারা দেওয়া চলছিল। সলিসিটর বলছেন, তোমার দাদা আর নেই, সুতরাং এখন আর ওই

শরিকি মাসোহারা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

অরুণাভ বললেন, 'ফানি, ভেরি ফানি। জমিদারি এস্টেট উঠে গেল তা আমরা জানতেই পারলাম না। আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? বউদি, তুমি ওই সলিসিটারের কথায় এখনই তেমন গুরুত্ব দিও না। আমি দলিলপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখছি। তুমি যদি পেমেন্ট বন্ধ করে দাও, তা হলে পরে তোমাকে সুদ সমেত শোধ করতে হবে, তাতে টাকা অনেক বেড়ে যাবে।'

এবারে চরম অস্ত্রটি প্রয়োগ করলেন শকুন্তলা। তিনি বললেন, 'সলিসিটার বলেছেন, বেশ কয়েক বছর তোমাদের পেমেন্ট করা হয়েছে, সেগুলোর কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এখন নাকি তোমাদের কাছ থেকে সে সব টাকা সুদ সমেত আদায় করা জন্যে নোটিশ দিতে হবে। আমি অবশ্য বলেছি, না না, পুরনো টাকা ফেরত পাওয়ার জন্যে চাপ দেওয়ার কোনো দরকার নেই। ও সব তো আমার স্বামী জেনেশুনেই দিয়েছেন। ও টাকা মাপ করে দিতে হবে। তোমাদের আর কিছু ফেরত দিতে হবে না।'

জীবনে যেন এরকম অবিশ্বাস্য কথা কখনও শোনেনি, এইভাবে তাকিয়ে রাইল অরুণাভ।

এরপর শুরু হল মামলা-মোকদ্দমা।

শকুন্তলার বাবা ব্যরিস্টার। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাড়িতে আসামি-বিবাদীদের ভিড় দেখেছেন। বাবার মুখে মামলা-টামলার গল্প শুনেছেন অনেক। উকিল-ব্যারিস্টারদের ধরন-ধারণও তিন বেশ ভালোই জানেন। তিনি একটুও ঘাবড়ালেন না।

ছেলে আর মেয়েকে তিনি এ সব আঁচ থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখলেন। তাদের পড়াশুনোর যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সে দিকে তীক্ষ্ণ নজর রইল তাঁর। সন্ধের পর ছেলেমেয়েরা বাড়ির বাইরে থাকতে পারবে না। তাদের পড়াশুনোর সময় তিনিও কাছাকাছি থাকেন। ছেলে বা মেয়েকে তিনি কোনোরকম বিলাসিতায় অভ্যস্ত হতে দিলেন না। মেয়ে বাড়ির গাড়ির বদলে স্কুল বাসে স্কুলে যায়, ছেলে কলেজে যায় পাবলিক বাসে।

সংসার খরচও অনেকটা ছেঁটে ফেললেন শকুন্তলা।

এত বড় বাড়ির একটা অংশ প্রায় ভেঙে পড়ছিল, সেই অংশটা মেরামত করার বদলে একেবারেই ভাঙিয়ে ফেললেন, অনেকখানি ফাঁকা জায়গা বেরুল। তা লিজ দিলেন একটা ব্যাঙ্ককে। সেই টাকায় অন্য অংশটাকে সারিয়ে

আধুনিক করে ফেললেন।

এইসব বনেদি বাড়িতে বেশ কিছু আশ্রিত আত্মীয়পরিজন থাকে বংশ পরম্পরা ধরে। শকুন্তলা তাদের কারোকেই বিদায় দিলেন না। তবে তাদের মধ্যে যারা শক্ত-সমর্থ তাদের এবার কিছু কিছু দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন।

শকুন্তলার বাবা জমিদার ছিলেন না কিন্তু নাম করা ব্যারিস্টার হিসেবে কলকাতার সমাজের ওপরমহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। সেই সুবাদে শকুন্তলাও চেনেন অনেককে। পুলিশ কমিশনার তাঁর কাছে তপুকাকা, মেয়র সন্তোষদা, কংগ্রেসের অতুল্য ঘোষ তাঁকে মেয়ের মতো স্নেহ করেন। আবার তাঁর এক মামাতো ভাই বড় গোছের নকশাল নেতা। সুতরাং অসহায় বিধবা ভেবে কেউ তাঁকে ভয় দেখাতে সাহস করেনি। শকুন্তলাকে অবশ্য কারোর কাছে যেতেও হয়নি সাহায্য চাইতে।

অরুণাভর সঙ্গে মামলা চলল আট বছর। এখনও পুরোপুরি মেটেনি। হাইকোর্টে হেরে গিয়ে অরুণাভ এবার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে।

অমরেন্দ্র এর মধ্যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ করেছে। সে অত্যন্ত ভদ্র ও বিনীত ছেলে, আবার মায়ের মতোই ভিতরে ভিতরে খুব দৃঢ়। এখন তো ব্যবসাপত্র দেখার অনেকটা ভার নিয়ে নিয়েছে।

মেয়ে কমলিকা পড়াশুনোয় আরও ভালো, সে এই বছরেই চলে গেল আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়ে। নিজেই সে স্কলারশিপ জোগাড় করেছে।

সাধারণত এই ধরনের পারিবারিক কাহিনিতে অনেক দুঃখ-দুর্দশা, ঝগড়া, বিচ্ছেদের ঘটনা থাকে। কিন্তু ঘোষাল পরিবারে বলা যেতে পুরোপুরি সাফল্যের কাহিনি।

পরিবারের প্রধান পুরুষটির মৃত্যুতে কোনো কিছুই অচল হয়ে যায়নি। এই ধরনের অন্য পরিবার তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ করছিল, শকুন্তলা কি সব দিক সামলাতে পারবে? কোথাও তালভঙ্গ হবে না?

না, হয়নি।

আর্থিকভাবে যথেষ্ট সচ্ছল। মা ও ছেলে-মেয়ের সম্পর্কে একটুও ফাটল ধরেনি। আশ্রিত জনেরাও কিছু নিন্দে রটায়নি। অরুণাভ ও তার দাদার মাসোহারা বন্ধ করে দিয়ে তাদের শত্রু বানিয়েছেন শকুন্তলা, কিন্তু কখনও একটুও দুর্বলতা দেখাননি। এবং প্রাপ্য নয় জেনেও তিনি কাকার মাসোহারা

বন্ধ করেননি। প্রত্যেক পয়লা বৈশাখ ও বিজয়া দশমীর পর তিনি কাকাকে প্রণাম করে আসেন। কাকাও সদয় ব্যবহার করেন তাঁর সঙ্গে।

একদিন রাত্তিরবেলা খাবার টেবিলে বসে মুখ নিচু করে মৃদু কণ্ঠে অমরেন্দ্র বলল, 'মা, একটা কথা বলব? তুমি রাগ করবে না? একটি মেয়ে, আমার খুব ভালো বন্ধু, তাকে আমি, মানে, ওর বাড়িতে একটা অসুবিধে হয়েছে, আমি যদি ওকে বিয়ে করতে চাই।'

শকুন্তলা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ছেলেও চুপ।

একটু পরে শকুন্তলা জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটি কে? আমি কি তাকে দেখেছি?'

অমরেন্দ্র বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছ, মানে, এ বছর দোলের দিন যে কিছু লোককে খাওয়ানো হল, আমার কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে তিনটি মেয়েও ছিল, তাদের মধ্যে একজন, তুমি হয়তো লক্ষ করনি।'

—তুই আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিসনি কেন?

—সেদিন অনেক লোক ছিল, তুমিও ব্যস্ত ছিলে।

—তোর সঙ্গে তার কতদিনের বন্ধুত্ব?

—প্রায় দু-বছর। আমার বন্ধু অরূপকে তো তুমি চেনো, তার মাসতুতো বোন। অরূপের বাড়িতেই প্রথম আলাপ। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। এবার এম. এ পরীক্ষা দিয়েছে হিস্ট্রিতে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শকুন্তলা বললেন, 'তুই কেন প্রথমেই জিজ্ঞেস করলি, আমি রাগ করব কি না? আমি যদি রাগ করি কিংবা আপত্তি করি, তা হলেও তুই ওকেই বিয়ে করবি।'

এবারে মুখ তুলে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে অমরেন্দ্র বলল, 'না। তুমি আপত্তি করলে ওকে বিয়ে করব না। তবে, অন্য কোনো মেয়েকেও বিয়ে করতে পারব না!'

অমরেন্দ্রর মতো উপযুক্ত ছেলের জন্যে এর মধ্যেই নানা জায়গা থেকে পাত্রীর প্রস্তাব আসছিল। শকুন্তলা তাদের সঙ্গে কথা বলছেন, তাও অমরেন্দ্র জানে।

শকুন্তলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি আমি রাগ করি, তা হলে কি তুই ওর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিবি?'

এর উত্তর দিল না অমরেন্দ্র। চুপ করে থেকে তার মনের ভাব বুঝিয়ে দিল।

শকুন্তলা বললেন, 'আমাদের মতো পরিবারের এত কাল বাবা-মায়েরাই ছেলে কিংবা মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছে। ছেলেমেয়ের নিজস্ব মতামত কখনও গুরুত্ব পায়নি। তুই কি ভাবলি, আমিও সেই যুগে পড়ে আছি? তুই কাকে বিয়ে করবি, সারা জীবন তুই কাকে নিয়ে কাটাবি, সেটা তো তুই-ই ঠিক করবি। আমার সঙ্গে যদি তার ভাব না হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। আমি একটু আলগা আলগা হয়ে থাকব।'

এবার অমরেন্দ্র জোর দিয়ে বলল, 'না, মা। তা হতেই পারে না। তোমার সঙ্গে যদি সে গোলমাল করে, তবে তাকেই সরে যেতে হবে। এটা আমার স্পষ্ট কথা।'

শকুন্তলা হেসে বললেন, 'মানুষের জীবন কখন কোন দিকে যে বয়ে যায়, তা আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। তোদের বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, আমি তো কোনো দায়িত্বই নিইনি, গায়ে ফুঁ দিয়ে থাকতাম। তখন কি একটুও বুঝেছিলাম যে এতগুলো পুরুষ মানুষের সঙ্গে আমাকে সমানভাবে টক্কর দিতে হবে। মেয়েটির নাম কী?'

—হৈমন্তী। জাতেরও কিছু মিল নেই। ওদের পদবি বসুচৌধুরী।

—খুকি আমেরিকায় থাকতে থাকতে যদি কোনো সাহেবকে বিয়ে করে, আমরা আটকাতে পারব? নাকি সেই সাহেবের জাত জিজ্ঞেস করব? এখন তো অনেক ছেলেমেয়ে বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকে। লিভিং টুগেদার। তাতেও তো আমি আপত্তির কিছু দেখি না। তুই যে বললি, মেয়েটির বাড়িতে কিছু অসুবিধে হয়েছে, সেটা কী?

অমরেন্দ্র বলল, 'হৈমন্তীর ছোট বোন অঞ্জনার সঙ্গে প্রদীপ নামে একটি ছেলের অনেক দিনের প্রেম। প্রদীপ ভালো চাকরি পেয়েছে সিঙ্গাপুরে। ওরা দুজনকে ছেড়ে থাকতে চায় না। প্রদীপ অঞ্জনাকে বিয়ে করে সিঙ্গাপুরে নিয়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু ওদের বাড়ির নিয়ম, বড় বোনের বিয়ে না হলে ছোট বোনের বিয়ে হতে পারে না। তাই হৈমন্তীকে সবাই মিলে চাপ দিচ্ছে।'

শকুন্তলা বললেন, 'তুই কালকেই হৈমন্তীকে এ বাড়িতে নিয়ে আয় একবার। আমি তার সঙ্গে কথা বলব।'

এরপর দেড় মাস ধরে হৈমন্তীকে প্রায় রোজই ডাকতে লাগলেন শকুন্তলা। তাঁর ব্যবহারে হৈমন্তীর আড়ষ্টতা ঘুচে গেল। তারপর কত রকমের গল্প। যেন দুটি বোন। একসঙ্গে নিউ মার্কেটে যাওয়া, থিয়েটার দেখা। হৈমন্তীর

বুদ্ধি, খাদ্যদ্রব্য-অপছন্দ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন শকুন্তলা।

তারপর আবার একদিন খাবার টেবিলে শকুন্তলা ছেলেকে বললেন, 'সামনের মাসে তিনটে তারিখ আছে, তোর কোন দিনটা সুবিধে বল। আমি কিন্তু সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান মেনেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে চাই।'

আগেকার সেই জমিদারি আর নেই, তবু জমিদারি আমলে যত ধুমধামের সঙ্গে বিয়ের উৎসব হত, তার চেয়েও অনেক বেশি জাঁকজমকের ব্যবস্থা করলেন শকুন্তলা। আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছেন, নিমন্ত্রণে কেউই বাদ গেলেন না। তা ছাড়া আমন্ত্রিত হলেন শহরের কিছু বিশিষ্টজন। সর্বত্র এই বার্তাটি পৌঁছে গেল যে, পদ্মনাভ ঘোষাল বেঁচে থাকলে একমাত্র পুত্র সন্তানের বিয়েতে যে আড়ম্বর করতেন, তাঁর বিধবা পত্নী তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম করেননি।

অমরেন্দ্রর সঙ্গে হৈমন্তীকে মানিয়েছেও খুব ভালো।

দুই

এক বছর নিরবচ্ছিন্ন সুখে কেটে যাওয়ার পর একদিন শকুন্তলা ছেলেকে বললেন, 'তুই তো বিজনেসের মোটামুটি ভার নিয়েছিস, সব কাজ জানিস। এখন তা হলে আমাকে ছুটি দিয়ে দে।'

অমরেন্দ্র বলল, 'তুমি অনেক খেটেছ। এখন আর তোমার রোজ অফিস যাওয়ার দরকার নেই। রিল্যাক্স করো। কিন্তু মাথার ওপর তুমিই থাকবে। গাইড লাইন তুমিই ঠিক করবে।'

শকুন্তলা বললেন, 'গাইড লাইন আমি কী আর বুঝি! তোর বাবার গাইড লাইনই তো আমি এতদিন ফলো করেছি।'

—আমার কলেজ জীবনে তো দেখেছি, তুমি রাত জেগে জেগে কাজ করতে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে আমি তোমায় ডেকে আনতাম।

—তখন কাজের নেশায় পেয়ে বসেছিল। এখন সব কিছুই অনেকটা শেপে এসে গেছে। আর অত পরিশ্রম করার দরকার নেই।

—সেই সঙ্গে সঙ্গে তো তুমি মামলাও চালিয়ে এলে—

—মামলা চালিয়েছে উকিলরা। আমি উকিলদের চালিয়েছি। ব্যারিস্টারের মেয়ে তো, অসুবিধে হয়নি।

—অরুণকাকু কিন্তু আমার বিয়েতে এসেছিলেন। কী একটা ঢাউস জিনিস উপহারও দিয়েছেন।

—তা আনবেন না কেন? তুইও যখন ওঁর সঙ্গে দেখা হবে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবি। ভদ্র ব্যবহার করবি, মামলার কথা সামনা সামনি কক্ষনো উচ্চারণও করবি না। আবার কোর্ট কেসে ঢিলেও দিবি না। আর শোন, অফিসেই নিমাই পাল নামে যে একজন সাপ্লায়ার আসে, ওর ওপর ম্যানেজারবাবুকে নজর রাখতে বলবি, ও অরুণাভর চর। ভেতরের খবর জানার চেষ্টা করে।

হৈমন্তী বলল, 'তোমরা দুজনে বড্ড বেশি কাজের কথা বলো। মা, চলুন না, আমরা সবাই মিলে কোনো এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।'

শকুন্তলা বললেন, 'হ্যাঁ গেলেই হয়। ঘাটশিলায় আমাদের একটা বাড়ি তো খালিই পড়ে আছে। কতদিন যাওয়া হয়নি। অমু যদি সময় করতে পারে...'

হৈমন্তী বলল, 'চলুন, চলুন, ঘাটশিলা খুব ভালো জায়গা, এই বর্ষাকালে আরও ভালো লাগবে।'

বিয়ের পর হৈমন্তী আর অমরেন্দ্র মধুযামিনী কাটাতে গিয়েছিল সিঙ্গাপুর-হংকং-ব্যাঙ্ককে। পনেরো দিনের ট্রিপ হওয়ার কথা ছিল, ফিরল বাইশ দিন পর।

আর এই ন'বছর শকুন্তলা সব কিছু সামলাবার জন্যে এমনই কাজে ডুবে ছিলেন যে, একদিনের জন্যেও কোথাও যাওয়া হয়নি। অথচ এক সময় স্বামীর সঙ্গে তিনিও কত জায়গায় ঘুরেছেন।

হৈমন্তী বেড়াতে ভালোবাসে। বাচ্চা বয়স থেকে কত জায়গা সে ঘুরেছে, সেই গল্প করে। ঘাটশিলা ঘোষালদের নিজেদের বাড়ি, সেখানে তো মাঝে মাঝে যেতেই পারে। হৈমন্তী যে শাশুড়িকেও সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলল, তা শুনে বেশ খুশি হল শকুন্তলা।

ঘাটশিলার বাড়িটার এক অংশে অমরেন্দ্রর দূর সম্পর্কের এক পিসি তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকেন। তাই বাড়িতে অন্য অংশটা জবরদখল হয়ে যায়নি। সেই অংশটা তালাবন্ধ হয়েই থাকে।

সেই অংশটা পরিষ্কার টরিষ্কার করে বাসযোগ্য করে রাখার জন্যে একজন কর্মচারীকে পাঠানো হল ঘাটশিলায়।

হৈমন্তী সিনেমা দেখতেও ভালোবাসে। কিন্তু অমরেন্দ্র খুব ভালো ফিল্ম

ছাড়া যেতেই চায় না। কিন্তু বাংলায় ভালো ফিল্ম আর কটা হয়? সত্যজিৎ, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটকের ফিল্মের জন্যে হাপিত্যেশ করে থাকতে হয় সারা বছর।

তেমন নাম করা নয় এমন এক পরিচালকের একটা সিনেমা খুব জনপ্রিয় হয়েছে, সেই সিনেমার কাহিনি আর গান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে খুব। দু-খানা টিকিট কাটিয়ে শকুন্তলাকে প্রায় জোর করেই সেই ছবি দেখাতে নিয়ে গেল হৈমন্তী।

ফিরে এসে দু-জনের সে কী হাসি। সিরিয়াস ছবি, শেষটা বিয়োগান্ত। একটা আবেগময় লম্বা গান দিয়ে সমাপ্তি। অনেক দর্শক শেষ দৃশ্যে কেঁদেছে, আর শকুন্তলা-হৈমন্তীর হাসি পেয়েছে। অধিকাংশ সংলাপই বোকা বোকা, বেশি বেশি সেন্টিমেন্টাল। এই দুই রমণীই উচ্চশিক্ষিত, তাদের রুচি অন্যদের মতো নয়।

ছবির কাহিনি শাশুড়ি আর পুত্রবধূর মনোমালিন্য, ঝগড়া ও শেষপর্যন্ত আত্মত্যাগ। শাশুড়ি শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করলেন বটে, কিন্তু তিনিই দর্শকদের মন জয় করে নিলেন।

দুপুরের শো দেখে বাড়ি ফিরে চা খেতে খেতে শকুন্তলা বললেন, 'হ্যাঁ রে, হৈমন্তী, তোর সঙ্গে আমার ঝগড়া কবে থেকে শুরু হবে বল তো?'

হৈমন্তী হাসতে হাসতে বলল, 'তাই তো, ঝগড়ার কোনো লক্ষণই দেখছি না।'

শকুন্তলা বললেন, 'প্রথম শুরু হল কী নিয়ে? রাত্তিরবেলা ভাত না রুটি খাওয়া হবে, তরকারিতে ঝাল...'

হৈমন্তী বলল, 'বাঙালিদের কতকগুলো ভুল ধারণা আছে। যেমন সৎমা হলেই খারাপ হবে। ননদ বউদির সম্পর্ক কিছুতেই ভালো হতে পারে না। আর শাশুড়ি-ছেলের বউয়ের সঙ্গে তো ঝগড়া হবেই। অথচ আমি জানি—'

শকুন্তলা বললেন, 'সবই মেয়েদের সম্পর্কে। এই পুরুষ প্রধান সমাজ মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের লড়িয়ে দিতে চায়। যেন মেয়েরা মিলেমিশে থাকতে পারে না। শুধু পুরুষরাই পারে।'

হৈমন্তী বলল, 'মেয়েরা তো তবু ঝগড়া করে বাড়ির মধ্যে। আর পুরুষরা সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ-দাঙ্গা বাধিয়ে কত মানুষ যে মারে!'

শকুন্তলা আর একটু চা ঢেলে নিয়ে বললেন, 'ও সব বলতে গেলে তো

অনেক কিছু বলতে হয়। এই যে সিনেমাটায় শাশুড়ি-বউয়ের দ্বন্দ্বটা দেখাল, ওরা কিন্তু আসল ব্যাপারটাই ধরতে পারেনি। দ্বন্দ্বটা প্রথমে শুরু হয় হয় কেন? মা তার সন্তানকে জন্মের পর থেকে লালন-পালন করে, সন্তানের জন্যে কত দুশ্চিন্তা থাকে, তার একটু অসুখ হলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, যেন নিজের আয়ু দিয়েও সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়—

এ তো প্রকৃতির ব্যাপার। মাদারলি ইন্সটিংক্ট! মা যে ছেলেমেয়েদের ভালোবাসে, ভালো না বেসে তো তার উপায় নেই। প্রকৃতি এটা তার রক্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, তা ঠিক। অনেক মা-ই তা জানে না। ছেলে আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে। তখনও ছেলেকে ঘিরে মায়ের কত স্বপ্ন থাকে। তারপর ছেলের জীবনে একটি মেয়ে আসে, ছেলের বিয়ে হয়, তখন ছেলে আস্তে আস্তে দূরে যেতে থাকে। সেটাও প্রকৃতির ব্যাপার। কিন্তু ছেলের জীবনে অন্য একটা বাইরের মেয়ে এসে ভাগ বসাচ্ছে, কোনো কোনো মা এটা সহ্য করতে পারে না। বাচ্চা বয়েসে ছেলে শোয় তার মায়ের পাশে, তারপর সেই ছেলে শোয় অন্য একটা মেয়ের পাশে, এটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিলে আর কোনো ঝঞ্ঝাটই থাকে না। যে মা এটা বোঝে না, সে তখনও ছেলেকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইলে বিপত্তির শুরু হয়।'

—মা, একটা ব্যাপার ভেবে দেখেছেন? ছেলে আর মেয়ে তো মায়ের কাছে সমান হওয়া কথা। কিন্তু তা কেন হয় না? ছেলের বিয়ে দিয়েও মা ছেলেকে আঁকড়ে ধরতে চায়, আর মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর সে যখন অন্য বাড়িতে চলে যায়, তাতে মায়ের ততটা দুঃখ কিংবা ক্ষোভ হয় না কেন? মেয়েও তো দূরে যাচ্ছে, অন্য পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শুচ্ছে।

—ছেলে আর মেয়ের মধ্যে খানিকটা তফাত আছে। ছেলেদের সম্পর্কে প্রকৃতির যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব আছে। ছেলেরাই নতুন প্রাণের জন্ম দেয় কি না!

—এটা আপনি ঠিক বললেন না মা। পুরুষেরা নতুন প্রাণের জন্ম দেবে কী করে মেয়েদের বাদ দিয়ে? আগেকার দিনে মনে করা হত, মেয়েরা শুধুমাত্র আধার আর পুরুষেরাই প্রাণের স্রষ্টা ; কিন্তু এখন আমরা জানি, প্রাণের সৃষ্টি আসলে এক্স আর ওয়াই ক্রমোজোমের মেলামেশার খেলা। এতে পুরুষ আর নারীর সমান ভূমিকা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা অবশ্য তুই ঠিকই বলেছিস হৈমন্তী। সব ব্যাপারে ছেলে

আর মেয়েরা সমান। কিন্তু মেয়েদের তো কতকগুলো সংস্কার আছেই। যেমন প্রায় জন্মের পর থেকেই আমরা জানি, মেয়েদের বাপের বাড়ি ছেড়ে অন্য একটা বাড়িতে চলে যেতেই হবেই। মেয়েদের পদবি বদলে যাবে। আর ছেলেরা বাইরে থেকে বউ আনবে, বাবা-মায়ের সঙ্গে থেকে বংশ রক্ষা করবে। এই বংশ রক্ষা করা ধারণাটাই ভুল।

যতদিন বিজ্ঞান সম্পর্কে ঠিকঠাক জানা হয়নি, ততদিন সব সমাজেই এই ভুল ধারণাটা চালু ছিল। এখন সেই ভুলটা ভাঙা দরকার। মেয়েরাও বংশ রক্ষা করতে পারে।

বিবাহিত ছেলেরা বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে। এক সঙ্গে থেকেও ভিতরে ভিতরে দূরত্ব তৈরি হয়। বাবার সঙ্গে বউয়ের তর্ক বাধে, মায়ের সঙ্গে বউয়ের খিটিমিটি শুরু হয়। মা আর বউয়ের মধ্যে নানারকম রুচির তফাত তো হতেই পারে। জানলাগুলোর পরদার রং কী হবে? একদিন সংসারটা ছিল শাশুড়ির হাতে, সে-ই পরদার রং ঠিক করেছে। এখন বউ সব আলমারির চাবি নিজের আঁচলে বাঁধতে চায়। পরদার রং ঠিক করা নিয়ে সে প্রথম অধিকার বোধ দেখায়। কিন্তু ছেলে যদি বিলেত-আমেরিকায় চাকরি পেয়ে বউ নিয়ে চলে যায়, তারপর বড় জোর বছরে একবার মাত্র কয়েক দিনের জন্য দেখা হয়, তাতে কিন্তু সম্পর্ক বেশ ভালো থাকে।

বিলেত-আমেরিকা কেন, আজকাল তো অনেকেই বেঙ্গালুরু কিংবা মুম্বই চলে যায় চাকরি নিয়ে।

তুই দেখবি, সেই সব ফ্যামিলিতে শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া নেই। পরদার রং নিয়ে মনোমালিন্যের প্রশ্ন নেই। দূরত্বই আসল কথা। সেই জন্যই ভাবছি, আমিও দূরে কোথাও গিয়ে থাকব।

খুব আগ্রহের ভাব দেখিয়ে হৈমন্তী বলল, 'তাই নাকি? কবে থেকে এ রকম ভাবলে?'

শকুন্তলা বললেন, 'এই ভাবছি মাঝে মাঝে!'

হৈমন্তী মুখটা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়ে থাকবে ঠিক করেছ?'

—সে একটা ব্যবস্থা করাই যাবে।

—আহা-হা, আবদার, তুমি অন্য জায়গায় গিয়ে থাকবে। শোনো, তুমি এর আগে যা বললে, সেটা জেনারালাইজেশন, মানে অনেক ক্ষেত্রেই এ রকম হয়। সব ক্ষেত্রে হতে পারে না। তোমার ছেলে তোমারই হাতে গড়া, সে

তোমাকে আলাদা জায়গায় থাকতে দেবে ভেবেছ?

—প্রথম কিছুদিন হয়তো অসুবিধে হবে।

—মোটেই না। ধরো তোমার সঙ্গে আমার একটু মন কষাকষি হল। তখন তোমার ছেলে বউয়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলবে? অসম্ভব। সত্যিকারের কোনো সভ্য, ভদ্র পুরুষ তা করতেই পারে না। বরং স্ত্রীকেই বোঝাবে। আর তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হওয়ার কোনোরকম সম্ভাবনাই নেই। আমি কিছু দোষ করলে, তুমি বকে দেবে, ব্যাস। আর তুমি যদি কখনও যুক্তিহীন জেদ করো, তুমি কখনও তা করবে না জানি, তবু যদি সে রকম কখনও হয়, আমি তোমাকে বলব, মা, আমি এটা চাইছি, তুমি আমাকে দেবে না? দিতেই হবে। আর যদি তাতেও রাজি না হও, তা হলে আমি তোমার দু-পা জড়িয়ে শুয়ে থাকব, ছাড়বই না। তখন তুমি কী করবে?

—যত সব পাগলামো মতন কথা! ভুল বোঝাবুঝি তো হতেই পারে। ভুল বোঝাবুঝি থেকেই যত রাজ্যের সমস্যা হয়!

—তোমার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিরও স্কোপ নেই। তোমার আলাদা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, তুমি তোমার ছেলের ওপর নির্ভরশীল নও। তুমি তো তোমার জন্যে আলাদা মহল করেই নিয়েছ, জানলার পরদার রং নিয়ে ঝামেলা হওয়ার প্রশ্নই নেই। এতগুলো রান্নার লোক, কাজের লোক, যদি খাওয়াদার ব্যাপারে রুচি আলাদা হয়, আলাদা আলাদা রান্নার পদ হতেই পারে। এখনও তো আমি একটু বেশি ঝাল খাই, তাই তোমার আর তোমার ছেলের জন্য যে সব তরকারি রান্না হয়, আমার জন্য একটুখানি আলাদা করে ঝাল মিশিয়ে দেওয়া হয়। তবে? বিষয়সম্পত্তি নিয়ে আমি কোনো দিন মাথা গলাব না। আর তুমি তো তোমার ছেলের ওপর সব ভার দিয়ে দিয়েছ। সে দিক থেকেও কোনো গণ্ডগোল নেই।

—তা হলেও!

—শোনো শোনো, আমার মা নেই। তুমিই আমার মা। তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। শাশুড়ি আর বউয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হবেই, এই বাংলা মিথটা আমি ভেঙে দিতে চাই। আমাদের কোনো দিন ঝগড়া হবে না। এই আমার চ্যালেঞ্জ! বুঝলে শকুন্তলাদেবী?

আরও একটা বছর কেটে গেল, সত্যিই এক দিনের জন্যও কোনো রকম অশান্তি হল না এই পরিবারে। হৈমন্তীও ব্যবহার ঠিক বউয়ের মতো নয়,

যেন এই পরিবারের মেয়েরই মতো। সে মাঝেমাঝেই শকুন্তলার কাছে নানারকম আবদার করে। তার জেদেই শকুন্তলাকে সাদা শাড়ির বদলে রঙিন শাড়ি পরতে হয়।

মাঝে মাঝে অমরেন্দ্র আর হৈমন্তীর বন্ধুরা বাড়িতে পার্টি করে। সেখানে নাচ-গান আর কিছুটা মদ্যাপনও হয়। শকুন্তলা আপত্তি করেন না। এ সবই এ যুগের কালচার। আপত্তি করাটা নির্বুদ্ধিতা।

শকুন্তলা সেই সময়টা পারতপক্ষে এ দিকে আসেন না। হৈমন্তীই এক একদিন তাঁকে জোর করে টেনে আনে, বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। সবার উদ্দেশে সে বলে, কারোর সিগারেট লুকোবার কিংবা গেলাস নামিয়ে রাখার দরকার নেই, মা কিছু মনে করেন না।

স্মিত হেসে শকুন্তলা সম্মতি জানান।

বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হল, শকুন্তলার শরীর থেকে এখনও রূপ একটুও ঝরে যায়নি। হৈমন্তী আর তিনি পাশাপাশি দাঁড়ালে অনেকেই মনে করে, যেন দুই বোন।

কিছুতেই এ সংসারে একটুও ফাটল ধরল না বলে শত্রুপক্ষের চোখ টাটায়।

এর মধ্যে সবাই মিলে একবার যাওয়া হল ঘাটশিলায়।

কর্তাদের আমলে তৈরি বাড়ি, সাড়ে চার বিঘে জমির ওপর, দু-পাশে ফল ও ফুলের বাগান ছিল। সম্ভবত সেকালে সপরিবার কুড়ি-পঞ্চাশজন এক সঙ্গে আসতেন, তাই এত বড় বাড়ির প্রয়োজন হয়েছিল। তখন কাকা-জ্যাঠা, মা, মাসি-পিসি সবাই ছিল পরিবারের অন্তর্গত।

বাড়িটি দু-মহলা। পদ্মনাভ ঘোষাল বেঁচে থাকতে শকুন্তলা স্বামীর সঙ্গে বছরে অন্তত একবার আসতেন। তারপর আর আসা হয়নি এতগুলো বছরের মধ্যে। গ্র্যাজুয়েশনের পর অমরেন্দ্র একবার এসেছিল কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে।

পরিচর্যার অভাবে আগেকার বাগান আর নেই। দু-চারটে বড় বড় গাছ শুধু আছে কম্পাউন্ডের মধ্যে। ইউক্যালিপটাস গাছগুলো এতই লম্বা যে মনে হয় আকাশ ছুঁতে আর বেশি বাকি নেই। সুবর্ণরেখা নদী এ বাড়ির সীমানা থেকে বেশি দূরে নয়।

পদ্মনাভর আমলে তাঁর বাবার এক মামাতো বোন সুলেখা হঠাৎ বিধবা হয়ে বেশ দুরবস্থায় পড়েছিলেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ির ব্যবহার ভালো ছিল না। তিনটি সন্তান সমেত সেই পিসিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই ঘাটশিলার

বাড়িতে। মাসোহারা পাঠানো হত নিয়মিত। বছরে একবার বাড়ি ও বাগান সংস্কারের জন্যেও টাকা বরাদ্দ ছিল। সে টাকার বিশেষ সদ্ব্যবহার না হলেও পরিবারটি দাঁড়িয়ে গেছে। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে জামশেদপুরে, এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, অন্য জন ব্যবসায়ী এবং সার্থক। সুলেখা পিসি বেঁচে আছেন আজও।

মানুষজন অনেক বেড়েছে ঘাটশিলায়। এক কালের নিরিবিলি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এখন আধা-শহর।

গাড়ি থেকে নেমে দোতলায় উঠে বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে অমরেন্দ্র বলল, 'আহ্ কী টাটকা বাতাস! মা, এখানে যে ক'দিন থাকব, আমি কিন্তু কোনো কাজ করব না। কলকাতার অফিসকে বলে দিচ্ছি, ফোনেও যেন আমাকে বিরক্ত না করে। এখানে আমি শুধু ঘুমোব।'

হৈমন্তী বলল, 'যাঃ! শুধু ঘুমিয়ে জীবনের সুন্দর সময় কেউ নষ্ট করে নাকি? আমরা এখানে খুব বেড়াব।'

অমরেন্দ্র বলল, 'তোমাদের ইচ্ছে করে, তোমরা বেড়াও। আমি আর ঘোরাঘুরির মধ্যে নেই। আমার বিশ্রাম দরকার।'

হৈমন্তী বলল, 'বিশ্রাম মানে ঘুম নয়। বিশ্রাম কিসে হয় জানো, তুমি রোজ রোজ যে কাজ করো, তার বদলে অন্য কিছু করা। সেটাই রিলাক্সেশন। এখানে তুমি ঘুরে ঘুরে বাগান দেখতে পারো, গাছে জল দেবে, মাটি খুঁড়বে।'

অমরেন্দ্র বলল, 'ওরে বাবা। ও সব আমার দ্বারা হবে না!'

দোতলা একটা চওড়া বারান্দা। এক পাশে বেশ কয়েকটা বেতের চেয়ার। এখানে বসলে অনেক দূর দেখা যায়। এ দিকটায় এখনও বেশি বাড়িঘর ওঠেনি।

হৈমন্তী শকুন্তলাকে জিজ্ঞেস করে, 'মা, আপনার ছেলেকে তো আপনি অনেক লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আর কিছু শেখাননি? গান গাওয়া, ছবি আঁকা...'

শকুন্তলা বললেন, 'অমুর খেলাধুলোতে খুব ঝোঁক ছিল। কলেজে এক বছর ক্যাপ্টেন হয়েছিল ক্রিকেট টিমে।'

অমরেন্দ্র ঈষৎ গর্বের সঙ্গে বলল, 'আমি একবার সাঁতারের কম্পিটিশনেও একটা মেডেল পেয়েছিলাম। ইচ্ছে করলে আমি ভালো পোর্স্টসম্যান হতে পারতাম, বুঝলে? নেহাত ব্যবসার কাজে জড়িয়ে পড়তে হল।'

হৈমন্তী বলল, 'এখন তো মাঝে মাঝে টেনিস খেললেও পারো।'

হঠাৎ স্মৃতিকাতর হয়ে অমরেন্দ্র বলল, 'মা, একবার বাবার সঙ্গে এসেছিলাম, আমার বোধহয় তখন দশ-এগারো বছর বয়েস, তুমি তো ছিলেই, ছোটদাদু আরও কে কে যেন এসেছিল। একদিন সন্ধেবেলা এখানে বসে অনেক গল্প হল। বাবা আমাকে একটা গল্প শোনাচ্ছিলেন, কোন দূর দেশে সমুদ্রে মাছ ধরার গল্প।'

শকুন্তলা স্মিত হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তোর মনে আছে?'

অমরেন্দ্র বলল, 'কী যেন ছিল গল্পটা! একটা বুড়ো জেলে আর প্রকাণ্ড বড় একটা মাছ।'

শকুন্তলা বললেন, "আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দা সি।' বইটা খুব বিখ্যাত হয়েছিল।"

অমরেন্দ্র বলল, 'বুড়োটা সেই মাছটার সঙ্গে কথা বলছিল, তাই না? তারপর কী যেন হল শেষটায়? একটু বলে দাও তো।'

শকুন্তলা কিছু বলার আগেই হৈমন্তী বলল, 'অ্যাই, না, মা বলবেন না। তুমি বইটা পড়ে নাও। বাবার কাছে গল্প শুনেছিলে বাচ্চা বয়েসে, এখন বুড়োধাড়ি হয়েছ, এখন বই না পড়লে এ সব গল্পের ঠিক রস পাওয়া যায় না। ঠিক বলছি না মা?'

শকুন্তলা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। তুমি বইটা ওকে জোগাড় করে দিও।'

হৈমন্তী এবার জিজ্ঞেস করল, 'মা, আপনি কখনও ওকে গল্প শোনাননি?'

অমরেন্দ্রই বলল, 'ইস্কুলে ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়া পর্যন্ত মা রোজ আমাকে ঘুম পাড়াবার জন্যে গল্প শোনাতেন। ইস্কুলের বই ছাড়া অন্য বই পড়ার তো অভ্যেস ছিল না আমার।'

—মা কী কী গল্প শুনিয়েছিল, তার একটাও মনে আছে?

—হ্যাঁ, মনে আছে। সেলফিশ জায়েন্টের গল্প। সেই যে দৈত্যটার বাগানে কোনো বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ঢুকতে দিত না। তারপর ইউলিসিস আর রামায়ণ। সিন্দবাদের গল্প আমার বার বার শুনতে ইচ্ছে করত।

—বড় হয়েও তুমি কোনো বই পড়োনি?

—কাজের বই, কত জার্নাল তো রোজই পড়ছি।

শকুন্তলা বললেন, 'গল্পের বই পড়া অভ্যেস করেনি, ও আর পড়বে না। হৈমন্তী, তুই ওকে মাঝে মাঝে নতুন বইয়ের গল্প শোনাবি।'

হৈমন্তী বলল, 'দেখো না, আমি ওকে ঠিকই বই পড়ার অভ্যেস করিয়ে দেব। বাচ্চা ছেলের মতো একটা বই দিয়ে দু-তিনবার বাদে পড়া ধরব।'

অমরেন্দ্র বলল, 'যদি রোজ রোজ ফেল করি, তা হলে কি শাস্তি দেবে নাকি?'

কয়েকটা দিন বেশ চমৎকার কাটল।

তার পর তো ফিরতেই হবে। অমরেন্দ্র ফোন করতে-বারণ করছিল, অফিস থেকে জরুরি কাজের বার্তা নিয়ে একজন কর্মচারী ট্রেনে করে হাজির।

শকুন্তলা ছেলেবউকে বললেন, 'তোরা যা, আমি ভাবছি আরও কয়েকটা দিন থেকে যাব। কিছুদিন ধরে আমার হজমের গণ্ডগোল চলছিল, এখানকার জলে খুব উপকার হয়েছে। ভালো করে সারিয়ে নিই। আর বাগানটারও যদি কোনো ব্যবস্থা করা যায়। অতবড় বাগান রেখেই বা কী হবে? শ্রীকুমার বলছিল, রেল লাইনের দিকটায় নাকি রাত্তিরে বদ লোকেরা ঘাপটি মেরে বসে থাকে। বিক্রি করে দেওয়াই মনে হচ্ছে ভালো।'

অমরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, 'তুমি একা থাকবে?'

শকুন্তলা বললেন, 'বাঃ, একা আবার কী? রতনলাল থাকছে, ও কতকালের বিশ্বাসী, তা ছাড়া পাশেই কাকিমারা রয়েছেন, আমার কোনো অসুবিধেই হবে না।'

হৈমন্তীও শাশুড়ির দেখাশুনো করার জন্য থেকে যেতে চাইছিল, শকুন্তলা তাকে প্রায় জোর করেই পাঠিয়ে দিলেন।

শকুন্তলা একা থাকতেও চেয়েছিলেন। হজমের ব্যাপার কিংবা বাগান-টাগান নিতান্তই অজুহাত।

কলকাতার বাড়ির সংসারের পুরোপুরি ভার তিনি হৈমন্তীকে দিয়ে দিতে চান, কিন্তু সে কিছুতেই নেবে না। জোর করতে গেলেই সে ঝকঝকে হাসি দিয়ে বলে, 'বাড়িতে মা থাকতে মেয়ে সংসার চালায়, এরকম কেউ কখনও শুনেছে? তুমি ওরকম শাশুড়ি-শাশুড়ি ভাব করবে না তো সব সময়! তুমি যেমন অমরের মা, তেমনি আমারও মা। বুঝলে! সংসারের ভারটি তোমার ঘাড়েই চাপানো থাকবে!'

কিন্তু এ সব বললে কি চলে? হৈমন্তীকে সংসারের ব্যাপার তো শিখতেই হবে। শকুন্তলা তো চিরদিন থাকবেন না। হৈমন্তীর কলেজ-টলেজের কয়েকজন বন্ধু এ বাড়িতে এলেও তার বাপের বাড়ির বিশেষ কেউ আসে

না। তার বাবা, দুই দাদা-বউদিরা, তাদের ছেলেমেয়েরা আসে না, তারা কি কোনো কারণে সঙ্কোচ বোধ করে?

হৈমন্তীর যে বলে, সে শকুন্তলাকে শাশুড়ির মতো দেখে না, মায়ের মতো ভাবে। কিন্তু মা আর মেয়ের মধ্যেও কি বিবাদ বাধে না? সম্পর্ক তিক্ত হয় না? ক'দিন ধরেই তো কাগজে বেরুচ্ছে, কলকাতার একটি নামকরা পরিবারে মা আর মেয়ের মামলা হচ্ছে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে। মেয়ে তার মায়ের চরিত্র নিয়েও অপবাদ দিয়েছে।

এখনও পর্যন্ত হৈমন্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিখুঁত, কিন্তু ভবিষ্যতে যে কখনও চিড় ধরবে না, তা কে বলতে পারে? নদীর মতোই। মানুষের মধ্যে সম্পর্কেও কখন কোথায় যে ফাটল ধরবে, তা কিছুতেই আগে থেকে বোঝা যায় না। তাই শকুন্তলার ধারণা, এখন থেকেই একটু একটু দূরত্ব রাখা ভালো। বছরে কয়েক মাস অন্তত তিনি যদি ঘাটশিলায় এসে থাকেন, তা হলে ছেলে-বউ নিজেদের মতো জীবন কাটাতে পারবে।

মেয়ে আর ছেলেকে ঠিকভাবে মানুষ করার জন্যে শকুন্তলা নিজের জীবনের আর কোনো সুখভোগের কথা ভাবেননি। এ ব্যাপারে তিনি সার্থক, মেয়ে পড়াশুনোতে নাম করেছে খুব। ছেলেও খুব ভালোভাবেই ব্যবসাপাতির হাল ধরেছে। এদের ভবিষ্যৎ জীবন এরাই গড়ে নেবে, শকুন্তলা তাতে সামান্য বিঘ্ন ঘটাতেও চান না।

ঘাটশিলায় একা একা থাকাটাও শেষ পর্যন্ত সুখকর হল না।

পিসিমার বড় ছেলে শ্রীকুমার ভালো ব্যবসা করে। তার ব্যবহার-ট্যাবহারও ভদ্র। কিন্তু আসলে মানুষটা সুবিধের নয়। সে অমরেন্দ্ররা চলে যাওয়ার পর প্রত্যেক সন্ধেবেলা এসে বসে থাকতে শুরু করল। অমরেন্দ্ররা থাকার সময় সে দু-একবার দেখা করতে এসে একটু পরেই চলে যেত। এখন ঘন্টার পর ঘন্টা কাটায়, তার ধারণা শকুন্তলার দেখাশুনো করার দায়িত্ব তার ওপর।

তিন বছর আগে তার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, কাজের লোকেরা বলেছে একটি আদিবাসী মহিলার সঙ্গে নাকি তার সম্পর্ক আছে। প্রতিদিন মদ্যপান করে, এক একদিন বাড়াবাড়িও করে ফেলে।

শকুন্তলার সঙ্গে গল্প করার নামে সে নানারকম আদিরসাত্মক ইঙ্গিত শুরু করে দেয়। তার দৃষ্টি ভালো নয়। ওই দৃষ্টি মেয়েরা ঠিক বোঝে।

কয়েকদিন পরই শকুন্তলা ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে লাগলেন

সন্ধেবেলা। কাজের লোককে দিয়ে শ্রীকুমারকে জানিয়ে দিলেন, দেখা হবে না।

তাও পর পর তিন সন্ধে এল শ্রীকুমার। এর পরেও সে হাল ছাড়ল না।

শকুন্তলা সকালবেলা নিজে বাজার করতে যান। অমরেন্দ্র গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে, সুতরাং এখানে চলাফেরায় তাঁর কোনো অসুবিধে নেই। এখানকার বাজারের টাটকা ফলমূল ও সবজি দেখতে তাঁর খুব ভালো লাগে। এক একদিন বড় বড় মাছও ওঠে।

বাড়ির কাছাকাছি একটা প্রাইমারি স্কুলে বাচ্চাদের খিচুড়ি খাওয়ানো হয়, শকুন্তলা দেখেছেন। বাচ্চাদের খলখল হাসি তাঁর কানে মধুর লাগে। এক একদিন তিনি কিছু একটা তরকারি কিংবা মাছ রান্না করিয়ে পাঠিয়ে দেন সেই স্কুলে।

কোথা থেকে খবর পেয়ে শ্রীকুমার বাজারেও এসে ধরে শকুন্তলাকে। কিছুতেই তার পিছু ছাড়ে না। শকুন্তলা কঠোর কথা বলতে পারেন না। বিরক্ত প্রকাশ করলেও শ্রীকুমার বোঝে না।

আর একজন লোক, মাঝবয়েসি কার্তিক চেহারা, তার নাম নন্দলাল, দু-হাতের আঙুলে চার-পাঁচটা আংটি। সেই নন্দলালও শকুন্তলাকে দেখলেই বউদি বলে বিগলিতভাবে হাসে। এ লোকটি নাকি অমরেন্দ্রর বাবাকে ভালোই চিনত।

এই নন্দলালকে দেখলেও বিরক্ত হন শকুন্তলা। এরও দৃষ্টি ভালো নয়।

শকুন্তলা নিজের ওপরেই রাগ হয়। তাঁর এখন একান্ন বছর বয়েস, মেনোপজ হয়ে গেছে, তাঁর তো এখন বৃদ্ধা হওয়ার কথা। তবু এই সব লোক কেন তাঁকে যুবতী মনে করে? তাঁর মুখের চামড়া কুঁচকোয়নি, গায়ের রং টসকায়নি বলে?

স্বামীর মৃত্যুর সময় তিনি পূর্ণ যুবতী ছিলেন, তখনও কি কোনো কোনো পুরুষ তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেনি? স্বামীর বন্ধু, আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও কেউ কেউ। শকুন্তলা কঠোরভাবে এইসব লোকের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করেছেন। নারীত্বের চেয়েও তাঁর মাতৃত্ব ছিল প্রবল। কোনো পুরুষের কাছেই কোনো কারণেই মাথা নত করেননি। আর এখন, এতদিন বাদে, এই মফস্সলের একটা রাস্তার লম্পট তাঁর দিকে এগোতে সাহস পায়!

তবে, এ কথাও ঠিক, শকুন্তলা উপলব্ধি করলেন, শরীরে যৌবন আর কিছু রূপ থাকলেও এ দেশে কোনো মহিলার পক্ষে একা থাকা বড় ঝামেলার।

পুরুষরা বিরক্ত করবেই।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি মনে মনে বলেন, কবে এই মুখের চামড়া কুঁচকোবে? স্থবিরতা, কবে তুমি আসবে বলো তো?

তিন

বিয়ের আড়াই বছর বাদে হৈমন্তী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল। তার নাম রাখা হল অগ্নি, ডাক নাম জোজো।

কলকাতা শহরে তখন প্রায় প্রতিদিনই চলছে ধুন্ধুমার কাণ্ড। পুড়ছে ট্রাম-বাস, বোমা ফাটছে, কে কোথায় কাকে ছুরি মারছে তার ঠিক নেই। বড় বড় কোম্পানি তাদের হেড অফিস সরিয়ে নিচ্ছে এই শহর থেকে। বেশ কয়েকটা বিমান কোম্পানিও এখান থেকে উড়ান বন্ধ করে দিল। অমরেন্দ্রদের কোম্পানির বিলিতি পার্টনাররাও তাদের শেয়ার সারেন্ডার করে চলে গেল। বন্ধ হল অনেক জুট মিল, কিছু চা-বাগান।

সেই অবস্থাতেই ব্যবসাটাকে ধরে রাখার জন্য প্রাণপণ খাটতে হল অমরেন্দ্রকে।

এইরকম সময়ে ছেলের অন্নপ্রাশনে বেশি আড়ম্বর করতে চাইল না হৈমন্তী। আমন্ত্রিত মাত্র দুশো জন। তবু অনুষ্ঠানটি হল বেশ সুচারু। বড় হলঘরটায় ফুটফুটে চেহারার নাতিকে কোলে নিয়ে বলে রইলেন শকুন্তলা। অনেকেই বলতে লাগল, এ যেন দেবজননীর কোলে এক দেবশিশু। সত্যি ভারি নয়নমুগ্ধকর দেখাচ্ছিল শকুন্তলাকে।

একটি পরিবারে একটি শিশু থাকা আর না-থাকার মধ্যে অনেক তফাত। শিশুটি যতক্ষণ জেগে থাকে, ততক্ষণ সবার মনোযোগ তার দিকে। সে ঘুমিয়ে থাকলে অন্য কারোর শব্দ করা নিষেধ, সবাই কথা বলে ফিসফিসিয়ে, আর সে জাগ্রত অবস্থায় নিজেই নানা শব্দ করে মাতিয়ে রাখবে বাড়ি।

আবার তার যদি জ্বর হয়, কিংবা পেট ব্যথার জন্য কাঁদে, তা হলে সবাই সন্ত্রস্ত।

প্রয়োজন নেই, তবু এই সব বাড়ির প্রথা অনুযায়ী প্রথম দু-জন আয়া রাখা হয়েছিল শিশুটির জন্যে। ঠাকুমা সব সময় বাচ্চাটিকে কোলে রাখছেন, তার মা ঘড়ি ধরে ঠিকঠাক সময়ে খাওয়াচ্ছে তাকে, আয়ারা শুধু পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক বছর পর একজন আয়াকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল।

মানুষের জন্মের যতই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাক, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে বাচ্চাদের ঘুমের বহর দেখে অনেকেরই মনে হয়, তারা যেন বহু দূর থেকে আসছে। চলছে জেট ল্যাগ। এই বাচ্চাটির মা এবং ঠাকুমা দু-জনেই উচ্চশিক্ষিত, তবু তাঁরা শিশুদের ঘিরে নানারকম মিথ ঠিক অস্বীকার করতে পারেন না। যেমন অগ্নির তিন মাস বয়েসে, একজন বৃদ্ধা আত্মীয়া এসে বলেছিলেন, ও মা, একি করেছিস! কপালটা একেবারে খালি! তিনি অনেকখানি কাজল লাগিয়ে দিয়েছিলেন শিশুটির কপালে। চোখের কাজল নয়, কাজলের টিপও নয়, কপালের একপাশে বেখাপ্পা খানিকটা কালো। এরকম না লাগিয়ে রাখলে শিশুর ওপর নজর পড়ে। কার নজর? অনেকেই জানে না। এটা একটা মিথ। আসলে এর পিছনে আছে শনি ঠাকুরের গল্প। নজর দিলেই বা কী হয়? সেটাও আর একটা মিথ। শকুন্তলা কিংবা হৈমন্তী কিন্তু সেই ঢ্যাপলা কালো রং তুলে ফেলেনি। মেনে নিয়েছে। শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার ইনস্টিংক্ট এমনই প্রবল যে মা-ঠাকুমার মনে হয়, আছে থাক না, ক্ষতি তো নেই।

দেড় বছর বয়েসে শিশুর একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। ততদিনে সে মরাঘুম থেকে মুক্ত। এই সময় তাকে জোর করে ঘুম পাড়াতে গেলেও সে ঘুমোবে না। এক একদিন তার ঘুমের সময় পেরিয়ে গেলেও মাঝরাত্তির পর্যন্ত জেগে থেকে খটখট করে হাসবে। খাওয়াতে গেলে চামচ সরিয়ে দেবে। ছোট্ট মুষ্টি দিয়ে মাকে, বাবাকে মারবে।

এই সময় থেকে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে এক অদ্ভুত ভাষা। গড়গড় করে সে কথা বলে যাবে। যার একটি অক্ষরও বোঝা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, অনেক কথা যাও যে বলি, কোনো কথা না বলি। তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি...। এটা এই বয়েসের শিশুদের সম্পর্কে একেবারে সঠিক বর্ণনা।

কোথা থেকে তারা নিয়ে আসে এই ভাষা, যা মা-বাবাও বোঝে না!

আশ্চর্যের ব্যাপার, পুত্রসন্তানের তুলনায় কন্যাসন্তানেরা আগে আগে হাঁটতে শেখে। আগে আগে কথা বলতে শেখে। দেড় বছরের ছেলে হামাগুড়ি দিচ্ছে, ওই বছরেরই মেয়ে দৌড়চ্ছে। দু-বছরের ছেলে পৃথিবীর ভাষা জানে না, ওই বয়েসের মেয়ে দিব্যি বাবা-মায়ের সব কথা বোঝে। পুত্রসন্তানদের

শৈশব কেন দীর্ঘায়িত, কে জানে।

শকুন্তলা এখন নাতিকে নিয়েই সর্বক্ষণ মেতে থাকেন। মিশন রো-র অফিসে তিনি একেবারে যাওয়া বন্ধ করেছেন। ছেলে ব্যবসার ব্যাপারে মাঝে মাঝে পরামর্শ নিতে আসে, তাও কমে যাচ্ছে দিন দিন। এখন অমরেন্দ্র নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়। হৈমন্তী অবশ্য আজও সংসারের ভার নেয়নি। আজকালকার দিনে আলমারির চাবি আঁচলে বাঁধার রেওয়াজ আর নেই, তবু ম্যানেজারকে নির্দেশ দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকেই। শুধু সেইটুকু দিয়ে বাকি সমস্ত সময় শকুন্তলা নাতিকে নিয়েই কাটান।

এই বয়েসের বাচ্চাদের প্রতিটি মুহূর্তই নাটকীয়। এই যে খেলনা নিয়ে খেলছে, আবার সেগুলিই ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে দূরে। তারপর হঠাৎ উঠে দৌড়তে শুরু করে। তখন ধর, ধর রব ওঠে। আয়া ছুটে যায়। আয়ার ওপর পুরোপুরি ভরসায় রাখতে না পেরে মা-ঠাকুমাও ছোটেন।

তার দুর্বোধ্য ভাষার মধ্যে যদি হঠাৎ শোনা যায় মাম্‌মা কিংবা ঠাম্‌মা, তখনই আনন্দের রব ওঠে। কান্নাটা যে একটা অস্ত্র, তা এই বয়েসের শিশু বুঝে যায়। যখনই দেখে, অন্যরা তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, তখনই সে কান্না শুরু করে। এখন তার আবদারও অনেকরকম।

শকুন্তলার এখন সারাদিনই কেটে যায় নাতিকে নিয়ে। তিনি এখন বাচ্চার মনস্তত্ত্ব অনেকটা বুঝে নিয়েছেন। শ্রীমান জোজো এক এক সময় কিছুতেই খেতে চায় না। হাত-পা ছোড়ে। শকুন্তলা দেখেছেন, তখন তাকে গুনগুন করে গান শোনালে সে শান্ত হয়ে যায়। আর খাবার মুখে দিতে আপত্তি করে না।

এখন সে নিজেই চামচ ধরতে শিখেছে। ছোট্ট ছোট্ট দুটি হাতে কাঁপা-কাঁপাভাবে চামচটা ধরে খাবার ঠিক মুখে দিয়ে দেয়। তখন তাকে গান শোনাতে হবেই, তাও রেকর্ডের গান চলবে না, ঠাকুমাকেই গাইতে হবে।

বিয়ের আগে গান শিখেছিলেন শকুন্তলা। তারপর অনেক বছর গান করেননি, কিন্তু গলায় এখনও সুর আছে। মনে করে করে তিনি বাচ্চাদের গান নিচু গলায় গাইছেন নাতির সামনে। তার মধ্যে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান/ শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান...' এই গানটা জোজোর বেশি পছন্দ। বার বার শুনতে চায়। শকুন্তলা অন্য গান শুরু করলেও সে উঁ-উঁ করে আপত্তি জানায়।

অবস্থাটা এমন দাঁড়াল, সে আয়ার হাতে খাবে না, মায়ের হাতেও খাবে না। ঠাকুমাকে চাই-ই চাই। আয়ার কোলে তো সে যাবেই না, মায়ের কোলে গেলেও সে ঝাঁপিয়ে ঠাকুমার কোলে আসতে চায়।

কিছুদিন পর শকুন্তলা বুঝলেন, বাচ্চাটা মায়ের চেয়েও ঠাকুমাকে বেশি চিনেছে, এ জন্য তো মায়ের মনে দুঃখ হতেই পারে। তাই তিনি একটু একটু সরে থাকতে লাগলেন। নিজের ঘরে বই পড়ায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

কিন্তু একটু বাদে বাদেই কান্নার শব্দ ভেসে আসে, ওমনি দারুণ উতলা হয়ে ওঠেন শকুন্তলা। কান্নারও ভাষা আছে। শকুন্তলা বুঝতে পারেন, এটা পেট ব্যথা নয়, খিদে নয়, ঘুম নয়, এটা ঠাকুমাকে দেখার আবদার।

আর স্থির থাকতে পারেন না শকুন্তলা ছুটে চলে যান।

নিজের ছেলেমেয়েকে তো মানুষ করেছেন তিনি। কিন্তু নাতির সঙ্গে মায়ার বন্ধন যেন অনেক বেশি।

হৈমন্ত শিশু পালন বিষয়ে ইংরেজি-বাংলা বহু বই পড়ে ফেলেছে। সে প্রতি পদে পদে নিয়ম মেনে চলতে চায়। যেমন বাচ্চাকে যখন তখন বিস্কুট কিংবা চকোলেট দেওয়া চলবে না। তাকে খাওয়াতে হবে ঘড়ি ধরে।

শকুন্তলা আর হৈমন্তী দুপুরবেলা এক টেবিলে খেতে বসেন। জোজো যদি তখন না ঘুমোয়, সেও পাশে বসে থাকবে। তার জন্যে একটা উঁচু চেয়ার করা হয়েছে, আর খেলনার তো ছড়াছড়ি।

একদিন সে ঠাকুমার খাবারের দিকে বার বার থাবা দিতে লাগল।

শকুন্তলা আলুর তরকারি আর পরোটা খাচ্ছিলেন। খানিকটা পরোটা ছিঁড়ে একটু আলু মাখিয়ে জোজোর মুখে পুরে দিলেন।

হৈমন্তী প্রথমটা দেখতে পায়নি, মুখ ফিরিয়ে ছেলেকে কিছু চিবুতে দেখে আঁতকে উঠে বলল, 'ও কী খাচ্ছে, কী খাচ্ছে?'

শকুন্তলা বললেন, 'খুব চাইছিল, তাই এই একটুখানি পরোটা ছিঁড়ে দিয়েছি।'

হৈমন্তী বলল, 'পরোটা? সর্বনাশ! ও একটু আগেই নিজের খাবার খেয়েছে, আর ঘিয়েভাজা পরোটা। একেবারে বিষের মতো!'

শকুন্তলা হালকাভাবে বললেন, 'ওইটুকুতে কিছু হয় না। তা ছাড়া আস্তে আস্তে তো ওকে শক্ত খাবার খাওয়ানো অভ্যেস করাতেই হবে।'

হৈমন্তী বলল, 'না, না এখন...ঘিয়েভাজা...'

সে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ছেলের মুখ থেকে ওই খাবার বার করার চেষ্টা করতে লাগল।

ছেলে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, তবু অবশিষ্ট অংশ বার করে ফেলল হৈমন্তী। খুব জোরে কেঁদে উঠল জোজো।

নিজের খাওয়া ছেড়ে জোজোকে কোলে নিয়ে চলে গেল হৈমন্তী।

শকুন্তলা অনেকটা অপরাধীর মতো বসে রইলেন চুপ করে।

কয়েকদিন পর সারা বিকেল নাতিকে গান শোনালেন শকুন্তলা। এখন বাচ্চাটার মুখে দু-একটা করে মানুষের ভাষা ফুটছে। মা, টাপুর টুপুর, দুধ এই সব বলতে পারে। সেই সব আধো আধো কথাই খুব মধুর লাগে।

আজ সন্ধের সময়ই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল জোজোর। অসময়, তবু জোর করে জাগিয়ে রাখা ঠিক নয়। জোজোকে কোলে নিয়ে পিঠ চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন শকুন্তলা।

তারপর তাকে হৈমন্তীর ঘরে নিয়ে এলেন শুইয়ে দেওয়ার জন্যে।

জানলার ধারে একটা চেয়ারে বসে আছে অমরেন্দ্র। টেবিলের ওপর একগাদা হিসেবের খাতা। সে মন দিয়ে হিসেবপত্র দেখছে। হৈমন্তীর হাতে একটা বই।

শাশুড়ির কোলে ঘুমন্ত জোজোকে দেখে হৈমন্তী উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'একী, এখন ঘুমিয়ে পড়ল?'

শকুন্তলা বললেন, 'হ্যাঁ। আপন মনে কথা বলছিল, হঠাৎ দেখি!'

হৈমন্তী বলল, 'এরকম অসময়ে ঘুম, ভালো নয়, জ্বরটর হয়নি তো?'

শকুন্তলা বললেন, 'না, না, জ্বর হয়নি। কিছু হয়নি। আমাদেরও তো এক একদিন অসময়ে ঘুম আসে—'

তাতেও আশ্বস্ত না হয়ে হৈমন্তী উঠে এসে ছেলের কপালে, সারা গায়ে হাত দিয়ে দেখল।

শকুন্তলা বললেন, 'এখন একটু ঘুমোক। একটু বাদে আবার নিশ্চয়ই জেগে উঠবে, তখন খাবার খাইয়ে দিলে হবে।'

মস্ত বড় পালঙ্কে বাবা-মায়ের বিছানা। পাশে একটা ছোট্ট বিছানায় শিশুটির ঘুমের জায়গা।

শকুন্তলা এগিয়ে গেলেন সে দিকে। হৈমন্তীও ছেলেকে কোলে নিতে

চাইল। এর মধ্যে হঠাৎ জেগে ধড়মড়িয়ে উঠল জোজো।

ঠাকুমা কিংবা মা কে তাকে ধরবে, তা ঠিক হওয়ার আগেই সে দু-জনেরই হাত ছাড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

অতটা উঁচু থেকে, জোরে ঠুকে গেল তার মাথা।

বাচ্চাদের একটা কান্না থাকে, অ্যাঁ করে চেঁচিয়ে আর থামতেই চায় না, অত দম তারা কোথায় পায়। ভয় লাগে তখন। ভয় লাগারই তো কথা।

শকুন্তলার আগে হৈমন্তীই তাকে তুলে নিল কোলে। কপাল-টপাল ফাটেনি, রক্ত বেরোয়নি। সত্যিকারের ভয় থাকে, যদি এই সময় বাচ্চারা বমি করে। তখন ডাক্তারের কাছে ছুটতেই হয়।

না, বমিও করছে না জোজো। এখন যে কাঁদছে, সেটা আকস্মিকতা ও ব্যথার কান্না। এর আগেও দু-বার সে চেয়ার থেকে পড়ে গেছে। এই বয়েসের শিশুদের তো মাঝে মাঝে টুকটাক লাগবেই, নইলে শরীর শক্ত হবে কী করে?

কান্না শুনে অনেকেই ছুটে এসেছে। এক পাশে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শকুন্তলা। যদিও তিনি জানেন, হৈমন্তী হাত না বাড়ালে বাচ্চাটা ওভাবে পড়ে যেত না। ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার।

শকুন্তলা জোজোকে কোলে নিয়ে গান শোনালে হয়তো তার কান্না তাড়াতাড়ি থামানো যেত, কিন্তু এই সময় মায়ের কোল থেকে ছেলেকে নেওয়া যায় না।

তারপর কান্না থামল একসময়, জোজো ঘুমিয়েও পড়ল।

ঘর থেকে চলে গেল অন্যরা। শকুন্তলাও যাবেন ভাবছেন, তখন হৈমন্তী ছেলেকে শুইয়ে দিতে দিতে বলল, 'মা, তোমারও তো বয়েস হচ্ছে, সর্বক্ষণ ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘুরলে তো তোমারও অসুবিধে! আয়ার কাছে থাকতে তো ওকে শেখাতে হবে। তুমি কেন এত কষ্ট করবে।'

শকুন্তলা বললেন, 'না, আমার আর কষ্ট কী!'

হৈমন্তী বলল, 'তোমারও তো কাজকর্ম আছে। কাল থেকে তুমি বরং ওর খাওয়ার সময় আর বিকেলে যখন মেঝেতে সব কিছু ছড়িয়ে খেলা করে...'

হিসেবের খাতা থেকে মুখ তুলে অমরেন্দ্র বলল, 'হ্যাঁ, মা, ওকে কোলে নিতে আমিও তো ভয় পাই, মাঝে মাঝে এত ছটফট করে। তুমি আর ওকে এত আদর দিও না। কোলে উঠতে চাইলেও নেবে না। আর একটু বড় হোক,

তখন ওকে গল্প শোনাবে।'

অমরেন্দ্রর গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল, এই বিষয়ে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে আগেই আলোচনা হয়েছে।

হৈমন্তী বলল, 'এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছে, এরপর হাঁটতে শিখবে—'

শকুন্তলা আর কিছু বললেন না। ঘুমন্ত নাতির কপালে একটু চুম্বন দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সাবধানতার জন্যে পারিবারিক ডাক্তারকে একবার আসতে বলা হল। তিনি দেখে সহজে অভয় দিয়ে গেলেন, শিশুটির কিছু হয়নি।

শকুন্তলা মাঝে মাঝে রাত্তিরে কিছু খান না, আজ রাতেও তিনি খাবার টেবিলে এলেন না।

মাঝরাত্তিরের দিকে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। বজ্রগর্জনে কেঁপে উঠতে লাগল দরজা-জানলা। কোথাও একটা জানলার পাল্লা পড়ছে দড়াম দড়াম করে। বাজের আওয়াজে মনে হয় কোথাও একটা যুদ্ধ লেগে গেছে।

সে সব থামল ভোর রাতে।

শকুন্তলার বেশ সকাল সকাল ঘুম ভাঙে। সকাল সাতটা-সাড়ে সাতটাতেও চায়ের টেবিলে তাঁকে দেখা গেল না।

কাগজ পড়তে পড়তে অমরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, 'মা-র ঘুম ভাঙেনি আজ?'

হৈমন্তী বললেন, 'বাবাঃ, কাল রাতে যা কাণ্ড গেছে, আমি তো ঘুমোতেই পারিনি ভালো করে। মা বোধ হয় আজ একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছেন এখন।'

সাড়ে আটটাতে, শকুন্তলা এলেন না। একজন পরিচারিকাকে খোঁজ নিতে পাঠানো হল।

সে ফিরে এসে জানাল, মা ঘরে নেই। বিছানা দেখলে মনে হয়, সারা রাত কেউ শোয়নি ওখানে।

যাঃ, তা আবার হয় নাকি? তা হলে নিশ্চয়ই মা অন্য দিনের মতো ভোরেই উঠে বিছানা পাট করেছেন। তারপর গেছেন কোথাও। কোথায় যাবেন?

সারা বাড়িতে তিনি কোথাও নেই। তিনি তো ইদানীং একা একা বাড়ির বাইরে যান না। ড্রাইভারদের কাছে খোঁজ নেওয়া হল, তারা কিছুই জানে না।

বেলা বাড়তে লাগল, এর মধ্যে একবারও নাতিকে দেখতে এলেন না শকুন্তলা। কোথায় তিনি, তাঁর কোনো চিহ্নই নেই।

অমরেন্দ্র অফিস গিয়েও দুপুরবেলা ফিরে এল তাড়াতাড়ি। সে কিংবা হৈমন্তী কিছুই বুঝতে পারছে না। সকালবেলা কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবু খোঁজ নেওয়া হল সর্বত্র।

বিকেলের দিকে খবর দেওয়া হল স্বয়ং পুলিশ কমিশনারকে। তারপর ফোন করে দেখা হল সব কটা হাসপাতাল আর নার্সিংহোমে।

পরের দিনও শকুন্তলার কোনো খবর পাওয়া গেল না। লোক পাঠানো হল ঘাটশিলায়। কাশীতে থাকেন বড় মামার এক গুরুদেব, সেখানেও যাননি শকুন্তলা।

দিনের পর দিন, সপ্তাহ, মাস কেটে গেল। শকুন্তলা নিরুদ্দেশ। তাঁর ঘরে গয়নাগাটি জিনিসপত্র যা ছিল সবই আছে। কোনো কারণে কেউ যদি তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো মুক্তিপণটন কিছু চাওয়া হবে। তাও না।

ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শকুন্তলা একটা টাকাও তোলেননি।

সারা ভারত তোলপাড় করে দেখা হল, শকুন্তলা যেন বাতাসে মিশে গেছেন।

শোকে ভেঙে পড়ল অমরেন্দ্র আর হৈমন্তী দুজনেই। অমরেন্দ্র সারা জীবনেই কখনওই মাকে ছেড়ে এক মাসও থাকেনি।

কী হল শকুন্তলার? বাড়িতে কারওর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়নি। হৈমন্তী কখনও কোনো খারাপ ব্যবহার করা দূরে থাক, একদিনও শাশুড়ির মুখে মুখে তর্কও করেনি। আর অমরেন্দ্রর মায়ের সঙ্গে অনুচিত ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না। এ সংসারের তিনি ছিলেন রাজেন্দ্রাণীর মতো।

আজকাল ডিপ্রেশন বলে একটা রোগের কথা শোনা যায়। এই রোগের মাত্র খুব বেড়ে গেলে মানুষ আত্মহত্যাও করে ফেলে। শকুন্তলার সে রোগের বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা যায়নি কখনও। তাঁর খুব ঠান্ডা মাথা, শক্ত মন। আর ও রোগ তো একদিনেই হঠাৎ চরম হয়ে ওঠে না!

বাচ্চাটা প্রথম প্রথম ঠাকুমাকে খুঁজেছে নিশ্চয়ই। তার ভাষা নেই, সে কথা সে জানাবে কী করে? হঠাৎ হঠাৎ আপন মনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। টলটলে পায়ে ঘুরেছে এ ঘর ও ঘর। কয়েক মাস পরে সে আর ও সব করে না।

দেখতে দেখতে বছরও ঘুরে গেল। শকুন্তলা নেই তো নেই। একেবারেই

নেই। পুরো ব্যাপারটা একটা ধাঁধা হয়ে রইল। একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে শুধু, শকুন্তলা নিজেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন! কিন্তু সব কিছু ফেলে রেখে কেন চলে গেলেন, তা অমরেন্দ্র কিংবা হৈমন্তী কিছুতেই বুঝতে পারে না।

অমরেন্দ্রর মনে হল, এর চেয়ে তবু কোথাও যদি মায়ের মৃতদেহ পাওয়া যেত, তা হলেও কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। যত টাকা খরচ হয় হোক, মায়ের উপযুক্ত শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করত সে।

পরক্ষণেই সে মনে মনেই জিভ কাটল। নিজের মা সম্পর্কে এরকম কথা চিন্তা করাও পাপ।

এক একসময় জোজোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অমরেন্দ্র। আড়াই বছর বয়েস হয়ে গেল, এখন সে ভালোই হাঁটতে পারে। বেশ কথাও বলে। কিন্তু ঠাকুমার কথা একবারও বলে না। এদিক-ওদিক খোঁজেও না।

ঠাকুমা যে ওকে কত ভালোবাসতেন, তা কি ও মনে রাখতে পারবে? দু-বছর বয়েসের ঘটনা, না, মনে থাকে না, অসম্ভব মনে রাখা।

সেইটুকুই যা সান্ত্বনা!

বন্ধ দরজা, খোলা দরজা

গানের মাঝখানে ঝুপ করে অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার ওরকম শব্দ করে আসে না। তবে, হঠাৎ আলো চলে গেলে মানুষরাই একরকম শব্দ করে।

অন্ধকার আর মাইক বন্ধ। গায়কও থেমে গেলেন। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, অপূর্ব, অপূর্ব!

একটু গানের শেষে কেউ অপূর্ব বললে, মনে করা যেত যে কেউ মুগ্ধতা জানাচ্ছে। গানের মাঝখানে এই একই শব্দ শুনে বোঝা যায়, কেউ ডাকছে ওই নামের কারওকে।

প্রীতিময়ের ভাগ্নের নাম অপূর্ব, সে এ বাড়ির কার্যত ম্যানেজার। সুতরাং জেনারেটরের ব্যবস্থা করার ভারও তার ওপর।

জেনারেটার চালু হতে মিনিট তিনেক সময় লাগল, ততক্ষণে গায়কের মুখের রেখা অনেকটা কুঁচকে গেছে। লোডশেডিং নামে পরিচিত এই আকস্মিক অন্ধকারের উৎপাত অনেকদিনই গা-সহা হয়ে গেছে, তবু হঠাৎ গান থামাতে হলে একজন গায়কের মেজাজ তো খিঁচড়ে যাবেই।

আলো ফিরে আসার পর দেখা গেল, কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়েছে, বাকিরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে গল্প শুরু করলেও চুপ করল এখন।

প্রীতিময় বললেন, গান চলুক। সত্য, আবার শুরু কর।

সত্যব্রত রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন, তাতে কয়েক বিন্দু ঘাম মোছা যায়, বিরক্তি মুছে ফেলা যায় না।

তিনি বললেন, নাঃ, আর থাক। এবার অন্য কেউ।

প্রীতিময় বললেন, এই গানটা অন্তত শেষ কর।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক নারী বলল, আমরা আরও গান শুনব।

সত্যব্রত দু দিকে মাথা নাড়লেন। তবলা কিংবা তানপুরা ঠিক মতন সুরে বাঁধা না থাকলে যেমন গান জমে না, এখন পিছন দিকে জেনারেটারের গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে, এর মধ্যে গান হয়!

যে মহিলাটি আরও গান শোনার ইচ্ছে প্রকাশ করল, সে কি সত্যিই সত্যব্রতর গান খুব ভালোবাসে, না ভদ্রতার অনুরোধ জানাল? সে যাই হোক, সব অনুরোধ অগ্রাহ্য করে সত্যব্রত হারমোনিয়াম ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অন্তরঙ্গ মহলে সবাই জানে, সত্যব্রত দাশগুপ্ত বদরাগি ও জেদি মানুষ। নমনীয় ভদ্রতার ধার ধারেন না।

নিতান্তই ঘরোয়া আসর, মঞ্চটঞ্চ নেই। বড় হল ঘরটায় কার্পেট ও চাদর পাতা। দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটা চেয়ার, বয়স্ক এবং যাঁদের হাঁটুর ব্যথা, তাঁদের জন্য। সব মিলিয়ে তিরিশ-পঁয়তিরিশজন আমন্ত্রিত। উপলক্ষও বিশেষ কোনো উৎসব নয়, প্রীতিময় সোনারপুরে এই বাগানবাড়িটি কিনেছে কিছুদিন আগে, নতুন রং করে, সাজিয়েগুছিয়ে তার দ্বার-উদ্‌ঘাটন হয়েছে গত রবিবার। আজ ইংরেজি মতে যাকে বলে বাড়ি গরম করার খাওয়াদাওয়া। গতকাল আত্মীয়স্বজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, আজ শুধু কয়েকজন বিশিষ্টবন্ধু, আর শহরের গণ্যমান্য নারীপুরুষ।

প্রীতিময় ও সত্যব্রত এক স্কুলের সহপাঠী, পাশাপাশি বসত। দুজনেই জীবনে দুরকমভাবে সার্থক, প্রীতিময় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বেশ কিছুদিন চাকরি করে, তারপর ব্যবসা শুরু করেছে। পাঁচ বছরের মধ্যেই তার কম্পানির শেয়ারের দাম টানা ঊর্ধ্বমুখী, সে কম্পানির টিভি সেটের চাহিদা বাংলার বাইরেও যথেষ্ট। আর গায়ক হিসেবে সত্যব্রতকে কে না চেনে!

প্রীতিময় জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি এখনই খেয়ে নিবি, না আর একটা ড্রিংক নিবি?

সত্যব্রত বললেন, কোনওটাই না। আমি এখন যাব।

সে কী! এত তাড়াতাড়ি চলে যাবি কেন? বেশি রাত হয়নি। আরও

অনেকে আসবে। সবাই তোর গান শুনতে চাইছে। তুই বরং একটা স্কচ নে, একটু পরে আবার গাইবি।

না রে, আমাকে যেতে হবে। একজন তেলুগু ফিল্মের প্রোডিউসারের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

একটি তরুণী মেয়ে সত্যব্রতর কাছে এসে বলল, অটোগ্রাফ প্লিজ।

সবুজ সিল্কের শাড়ি পরা মেয়েটির হাতে একটি ছোট খাতা। আঙুলে সবুজ নেলপালিশ।

সত্যব্রত জিজ্ঞেস করলেন, বেঙ্গলি না ইংলিশ?

তরুণীটি বলল, আপনার যেটা ইচ্ছে।

সত্যব্রত বাংলাতেই লিখলেন, সবুজ মেয়েকে শুভেচ্ছা। তারপর খাতাটি ফেরত দিতে দিতে বললেন, এই গরমে সিল্কের শাড়ি পরে আছ কী করে?

তরুণীটি বলল, এটা সিল্ক নয়, ইজিপশিয়ান কটন। আর রংটাও তো ঠিক সবুজ নয়, লাইট ব্লু। আপনিও বুঝি নীল আর সবুজের তফাত বোঝেন না?

আপনিও মানে?

অনেক পুরুষই...রবীন্দ্রনাথ যেমন নীল রং ঠিক চিনতেন না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে, নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাই রে...আষাঢ় মাসের আকাশ যদি পুরোপুরি মেঘে ঢাকা থাকে, তা হলে সেটা নীল হবে কী করে? মেঘের রংও নীল হয়?

তোমার কাছ থেকে এটা শিখলাম, থ্যাঙ্ক ইউ। ক্ষণিক আগে তাঁর মুখে যে বিরক্তির রেখা ছিল, তা অন্তর্হিত হয়ে গেল। কেউ অটোগ্রাফ না চাইলে তিনি আরও অনেকক্ষণ অপ্রসন্ন হয়ে থাকতেন। এ মেয়েটির বদলে কোনও পুরুষ হলেও তিনি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতেন না।

তিনি অবশ্য আর দাঁড়ালেন না, এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

পাশে পাশে প্রীতিময় ঘোষ। সহ ব্যবসায়ী মহলে অবশ্য কেউ এই পুরনোগন্ধী নাম উচ্চারণ করে না, তাদের কাছে তিনি পি এম ঘোষ, বা শুধু পি এম।

তিনি বললেন, দাঁড়া, এক মিনিট দাঁড়া। তোর জন্য সামান্য উপহার আছে।

অপূর্ব, অপূর্ব!

বাল্যবন্ধু হোক আর যাই-ই হোক, একজন গায়ককে কিছু দিতে হবে না?

প্রীতিময় নব্যধনী, তিনি পুরানো বাংলা কালচার ফিরিয়ে আনতে চান।

অপূর্ব দ্রব্যগুলি নিয়ে এল। একটি গোলাপের তোড়া। গলায় পরিয়ে দেওয়া হল রঙিন উড়নি। সোনালি কাগজে মোড়া একটি ব্ল্যাক লেবেল স্কচের বোতল, একটি প্যাকেটে একটি নীল রঙের পাঞ্জাবি, সামনের দিকে অনেকখানি রূপোলি জরির নকশা। সেটা দেখবার মতন, তাই প্যাকেট খুলে দেখানো হল।

একটু দূর থেকে সেই তরুণীটি বলল, ওটা কী রঙের বলুন তো?

সত্যব্রত মৃদু হেসে বললেন, আমার রং চিনতে একটু-আধটু ভুল হয় ঠিকই। তবে, এটা নিশ্চয়ই টকটকে লাল।

অনেকেই হেসে উঠল।

সত্যব্রত জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? তুমি কি গান করো?

সে বলল, আমার নাম কুলসম খান রেণু।

পাশ থেকে একজন বলল, ও রেজওয়ানা চৌধুরীর ছাত্রী। দারুণ গান করে।

সত্যব্রত বললেন, সময় থাকলে তোমার গান শুনতাম। কিন্তু আজ আমাকে এখন যেতেই হচ্ছে।

সত্যব্রত উপহারের কোনওটিই হাতে নিলেন না। সেগুলি অপূর্ব গাড়িতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

তিনি মূল দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এর মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। খুব জোরে নয়। এই জন্যই এতক্ষণ গুমোট গরম ছিল।

সত্যব্রত পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে আগে বন্ধুর দিকে হাতটা এগিয়ে দিলেন।

প্রীতিময় বললেন, আমি তো কবেই ছেড়ে দিয়েছি রে। তুই-ও এবার ছাড়।

দুই বন্ধুর চেহারায় যথেষ্ট অমিল।

প্রীতিময় বেঁটেখাটো মানুষ, অনেকদিন আগেই টাক পড়েছে। মুখ-চোখ দেখলেই বোঝা যায়, তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি প্রবল। কোনও অচেনা মানুষের দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই তিনি বুঝে নিতে পারেন, তার দৌড় কতখানি।

সত্যব্রত দীর্ঘকায়, রাশভারী চেহারা। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও মাথায় বাবরি চুল। তিনি ভোগী পুরুষ, খাদ্য-পানীয় ও রাত্রি জাগরণে অনেক অনাচার করেছেন,

তার কিছুটা ছাপ পড়েছে চোখের নীচে।

অপূর্ব তার হাতের জিনিসগুলো গাড়িতে রাখতে গিয়েও ফিরে এসে জানাল যে, সত্যব্রতর ড্রাইভারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রীতিময় জিজ্ঞেস করলেন, ড্রাইভারের মোবাইল নেই?

সত্যব্রত মাথা নাড়লেন।

প্রীতিময় বললেন, তা হলে ভেতরে একটু বসবি চল।

সত্যব্রত বললেন, না, ও হিসিটিসি করতে গেছে বোধ হয়। এসে পড়বে।

জেনারেটারে সব আলো জ্বলেনি। দরজার ওপরে একটা ফ্লাড লাইট, তাতে একটা আলোর বৃত্ত তৈরি হয়েছে। বাকি বাগানটা অন্ধকার।

সেই অন্ধকার থেকে আলোর বৃত্তে প্রবেশ করলেন এক পুরুষ ও রমণী। এখনও অতিথিরা আসছে। পুরুষটির চেয়ে রমণীটি একটু উঁচু, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। পুরুষটি হৃষ্টপুষ্ট, দাড়ি গোঁফ ভরটি মুখটার সঙ্গে কার্ল মার্ক্সের খুব মিল, হাতে চুরুট।

মোরাম বিছানো পথ দিয়ে তাঁরা হেঁটে এলেন ধীর পায়ে। সত্যব্রত কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইলেন তাঁদের দিকে।

তাঁরা কাছে আসতেই প্রীতিময় আপ্যায়ন করে বললেন, অনসূয়া, এসো, এসো। আসুন, আসুন।

সত্যব্রতকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই এঁদের চিনিস?

প্রীতিময় নিশ্চয়ই পুরুষটির নাম ভুলে গেছেন, তাই পরিচয় করালেন না।

অনসূয়া সত্যব্রতর চোখের দিকে কয়েক পলক স্থিরভাবে তাকিয়ে নম্র গলায় জিজ্ঞেস করল, ভালো আছেন, সত্যদা?

সত্যব্রত বললেন, হ্যাঁ, তুমি ভালো তো?

পুরুষটি চুরুট সমেত হাত তুলে বললেন, নমস্কার।

প্রীতিময় সত্যব্রতকে বললেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি? চল না ভেতরে।

সত্যব্রত বললেন, ওই তো আসছে।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে তাঁর ড্রাইভার নিত্যানন্দ।

প্রীতিময় বন্ধুকে এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, তেলুগু ফিল্মের প্রোডিউসার তোর কাছে আসবে কেন?

সত্যব্রত বললেন, আমি দু-একটা তেলুগু ছবিতে প্লেব্যাক করেছি।

তুই তেলুগু ভাষা জানিস নাকি?

লতা মুঙ্গেশকার কি বাংলা জানে? রোমান হরফে গানটা লিখে দেয়, উচ্চারণ কারওর কাছ থেকে শিখে নিই। অনেকে জানে না, হিন্দি ছবির চেয়েও তেলুগু ছবিতে অনেক বেশি টাকা দেয়।

বাংলা ছবিতে কত দেয়?

খারাপ না। বাজেটের তুলনায় ভালোই দেয়। অনসূয়ার সঙ্গে ওই লোকটি কে রে? ওর হাজব্যান্ড নাকি?

না, বিয়ে হয়নি বোধ হয়।

সত্যব্রত গাড়িতে উঠে বললেন, তুই যা, বৃষ্টিতে ভিজিস না।

গাড়ি ছাড়ার পর নিত্যানন্দ জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব?

সত্যব্রত সঙ্গে সঙ্গে মন বদলে ফেললেন। যাওয়ার কথা গ্র্যান্ড হোটেলে, রাত দশটায়। কিন্তু এখন তাঁর মনে হল, কালকেও সময় আছে। বাড়ি ফিরে ফোন করে দিলেই হবে।

তিনি অনুভব করলেন, বুকের মধ্যে একটু চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। অ্যানজাইনা? এরকম মাঝে মাঝে হয়। কিন্তু এটা তা নয়। অনেকদিন পর দেখলেন অনসূয়াকে। তার সঙ্গের পুরুষটির জন্য কি তাঁর ঈর্ষাবোধ হচ্ছে?

তিনি ঈষৎ হাসলেন।

অনেক পুরুষই মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে। মনের মধ্যে দুটি সত্তা তৈরি হয়ে যায়। দু পক্ষের উকিল একই বিষয় নিয়ে দুরকম বিপরীত যুক্তি দেয়।

মেয়েদের মনের মধ্যেও এরকম উলটো টানাপোড়েন হতে পারে অবশ্যই, কিন্তু পুরুষরা তা জানে না।

এখন সত্যব্রতর একবার ঈর্ষা কথাটা মনে হতেই তাঁর অন্য সত্তা বলল, একজন অচেনা দাড়িওয়ালা লোকের ঈর্ষা? সত্যব্রত দাশগুপ্ত এমন দুর্বল চিত্তের মানুষ নাকি?

তা ছাড়া অনসূয়ার সঙ্গে তো তাঁর আর কোনো সম্পর্ক নেই। দেখা হল প্রায় আড়াই-তিন বছর পর। তার সঙ্গে একজন দাড়িওয়ালা কিংবা টাক মাথা লোক থাক, তাতে সত্যব্রতর কী আসে যায়!

তবু দৃশ্যটি তাঁর চোখের সামনে আর একবার ফিরে এল। অন্ধকার থেকে আলোর বৃত্তে এসে ঢুকল অনসূয়া আর চুরুট-ফোঁকা লোকটি। অনসূয়া একটি

কালচে রঙের শাড়ি পরা। যারা বর্ণকানা, তাদেরও কালো রং চিনতে ভুল হয় না। তা ছাড়া, অনসূয়া বরাবরই কালো রং বেশি পছন্দ করে। পুরুষটি পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। ওরা নিজেদের মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে খুব ধীর পায়ে হাঁটছিল। একেবারে কাছে এসে অনসূয়া দেখতে পায় সত্যব্রতকে। মুখ তুলে কীরকম যেন একটা গলায় জিজ্ঞেস করল, ভালো আছেন সত্যদা?

ওরকম গলায় অনসূয়া আগে কখনও সত্যব্রতর সঙ্গে কথা বলেনি।

যাই হোক, যাই হোক, এটা এমন কিছু মনে রাখবার মতন ব্যাপার নয়।

বরং ওই কুলসম মেয়েটি বেশ অন্যরকম। অটোগ্রাফ নিতে এসে তাঁকে কালার ব্লাইন্ড বলে দিল!

কুলসম। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে কারওর কারওর নাম খুব মিষ্টি হয়। যেমন মরিয়ম। যেমন সুরাইয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও একটা উপন্যাসে কুলসম নামে একটি চরিত্র আছে। 'চন্দ্রশেখর' কী? খুব ছোটবেলায় সত্যব্রত চন্দ্রশেখর নামে একটা বাংলা সিনেমা দেখেছিলেন, মনে আছে আজও। নবাব মীর কাশিম-এর এক বেগমের নাম ছিল কুলসম, তাই না?

মেয়েটি গান গায়। সত্যব্রত ওর গান শোনেননি। বাংলাদেশের অনেক মেয়েই খুব ভালো গান গাইছে। বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীত। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদেরই বেশি নাম শোনা যায়।

একটু চেষ্টা করলেই এই কুলসমের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। ওর সঙ্গে আর একবার দেখা হলে মন্দ হয় না।

বাড়ি পৌঁছে সত্যব্রত ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

পুরনো আমলের তিনতলা বাড়ি। একতলায় দুটি বসবার ঘর। গোটা বাড়িটাই আসলে সমান দু ভাগে ভাগ করা। যদিও কোনও দেওয়াল তোলা নেই। কয়েকটি ঘর তালা বন্ধ।

বিদিশার ছোট বোন গার্গী থাকে সুইডেনে। এক বছর-দেড় বছর অন্তর একবার আসে। এ বাড়ির অর্ধেক অংশ তার। ওদের একটি ভাইও ছিল, সে আর নেই।

সত্যব্রতকে দরজা খুলে দিল প্রীতম। সে থাকে দোতলার একটা ঘরে, কিন্তু সিগারেট টানার জন্য ঘন ঘন নীচে নেমে আসে। তার মা সিগারেটের গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারে না। এ বাড়ির কাজের লোকরা কেউ থাকে

না রাত্তিরে।

প্রীতমের মা রেণু, সত্যব্রতর পিসতুতো বোন, একেবারে সমানবয়সী। তার স্বামী গত আট বছর ধরে রয়েছে নরেন্দ্রপুরের এক উন্মাদ আশ্রমে। তার ভালো হওয়ার আশা নেই বললেই চলে। স্বামীহীন শ্বশুরবাড়িতে রেণুকে নানা হেনস্তা সহ্য করতে হত। বিদিশা যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন তার দেখাশুনো করার জন্য রেণু এ বাড়িতে চলে আসে। তারপর সে আর ফিরে যায়নি। এখন রেণুই এ বাড়ির হাউজকিপার, সব দিক সামলায়। আপন পিসতুতো বোনকে তো মাইনে দিয়ে কাজের লোক হিসেবে রাখা যায় না, আত্মীয় হিসেবেই সে আছে। সত্যব্রত অবশ্য রেণুর নামে একটা ব্যাঙ্ক আকাউন্ট খুলে দিয়েছেন, প্রতি মাসে তার নামে দু হাজার টাকা জমা হয়। প্রীতমও হাতখরচ পায় এক হাজার টাকা।

তিনতলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে সত্যব্রতর এখন একটু একটু হাঁপ ধরে। কিন্তু তিনতলাই তাঁর পছন্দ, দক্ষিণ দিকটায় এখনও কোনো বড় বাড়ি ওঠেনি, অনেকটা ফাঁকাই আছে। একটু দূরেই একটা মাঠ, ওখানে পাড়ার ক্লাব, খুব ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হয়, ও মাঠের দখল আর কেউ নিতে পারবে না।

বিদিশা আর সত্যব্রতর শয়নকক্ষ আলাদা, অনেকদিন ধরেই এই ব্যবস্থা।

নিজের ঘরে বসে টিভি দেখছেন বিদিশা। এইচবিও চ্যানেলে ইংরেজি ছবি। মহাকাশ অভিযানের কাহিনি।

সত্যব্রত সে ঘরে ঢুকে একটুক্ষণ দাঁড়ালেন।

বিদিশা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? মোটে তো সাড়ে নটা বাজে!

সত্যব্রত চেয়ারের পেছন দিকে এসে বিদিশার কাঁধে হাত রেখে বললেন, পার্টিটা ঠিক জমল না। বার বার লোডশেডিং। প্রীতিময় তোমার জন্য এক বাক্স চকোলেট পাঠিয়েছে।

বিদিশা আবার বললেন, চেনাশুনো অনেকে এসেছিল?

সত্যব্রত বললেন, হ্যাঁ, প্রতু-সীমন্তিনী, অশোক-রেবেকা, অনেকদিন পর দেখলাম শৈবাল আর জুলেখাকে। বাড়িটা বেশ সুন্দর, সঙ্গে একটা পুকুর আছে, প্রীতিময় বলল, আমরা ইচ্ছে করলে যে-কোনও সময় ওখানে উইকএন্ড কাটিয়ে আসতে পারি নিরিবিলিতে। রান্নাবান্না করে দেওয়ার লোক আছে।

এরকম টুকটাক আরও কিছু কথা বলে সত্যব্রত চলে এলেন পাশের ঘরে।

বেশি কথা বললে বিদিশার সিনেমা দেখার ব্যাঘাত হয়।

কিন্তু বাইরের পোশাক ছেড়ে বাড়ির জামা-পাজামা পরতে পরতেই সত্যব্রত দেখলেন, দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন বিদিশা। নিশ্চয়ই এখন বিজ্ঞাপনের বিরতি।

সেই অসুখের সময় খুব রোগা হয়ে গিয়েছিলেন বিদিশা, এখন স্বাস্থ্য ফিরেছে। তবু একটু অস্বাভাবিক ফোলা ফোলা দেখায়। মাথার চুল কমে গেছে অনেক। প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়লেও এখনও বোঝা যায়, বিদিশা একসময় অতীব রূপসী ছিলেন। নায়িকা হয়েছিলেন দুটি বাংলা ফিল্মের।

বিদিশা বললেন, তুমি নিশ্চয়ই ওখানে ডিনার করোনি। রাত্রে কিছু খাবে তো?

সত্যব্রত বললেন, হ্যাঁ, ওখানে বিশেষ কিছু খাইনি। রেণুকে বলে দাও, দুটো চিজ-স্যান্ডুইচ বানিয়ে দেবে। আর ভাতটাত খাব না।

বিদিশা বললেন, রুমুলা ফোন করেছিল, সামনের মাসে তিন তারিখে আসবে।

একা আসছে?

ওর সেই যে বান্ধবী, অল্‌কা, সে-ও আসতে চায়।

ঠিক আছে, আসুক। তখন ডেভিডদের একদিন ডাকতে হবে। তোমার তো ডেভিডকে খুব পছন্দ।

আমার পছন্দ হলে কী হবে? মেয়ে যদি অন্য কিছু ঠিক করে থাকে।

রুমুলা ওঁদের মেয়ে, এখন আছে বার্লিনে। বাবা-মায়ের মনে সে একটা দারুণ অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে, তা নিয়ে কোনো আলোচনা করা যায় না।

বিদিশা আবার টিভির কাছে ফিরে যাওয়ার পর সত্যব্রত কাবার্ড খুলে একটা হুইস্কির বোতল বার করলেন। একটুও নেশা জমেনি, আধখ্যাঁচড়া হয়ে আছে।

এ ঘরে একটি খাট ও একটি দোলনা চেয়ার ছাড়া অনেকরকম বাদ্যযন্ত্র দেয়ালে এবং মেঝেতে। সব মিলিয়ে উনিশটি, তার মধ্যে হারমোনিয়ামই তিনটে। সুরবাহারও আছে। সিন্থেসাইজারও আছে। সবগুলোই যে সত্যব্রত বাজান তা নয়, তবু এগুলো চোখের সামনে রাখতে তাঁর ভালো লাগে।

হুইস্কির গেলাসে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে সত্যব্রত একটা এসরাজ নিয়ে চেয়ারে বসলেন। গুনগুন করতে লাগলেন একটা তেলুগু গানের সুর।

হঠাৎ তাঁর চোখে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য। বাগানের অন্ধকার দিক থেকে আলোর বৃত্তে ধীর পায়ে এসে ঢুকছে অনসূয়া আর তার খর্বকার সঙ্গী। বৃষ্টির মধ্যেও তাদের কোনো ব্যস্ততা নেই।

ওরা কি গাড়িতে এসেছে, না ট্যাক্সিতে? সঙ্গের লোকটাই বা কে?

সত্যব্রত আপন মনে হাসলেন। অনসূয়া ট্যাক্সিতে না গাড়িতে এসেছে, তা জানার কী এখন দরকার তাঁর। সঙ্গীটি সম্পর্কেই বা এত কৌতূহল কেন? শুধু শুধু মনঃসংযোগ নষ্ট হচ্ছে।

তিনি একটি বৃন্দাবনী সারং সুর ভাঁজতে লাগলেন।

দুই

ঠিক দু বছর আট মাস আগে অনসূয়ার বিছানায় শেষবারের মতন শুয়েছিলেন সত্যব্রত।

তারপর বিচ্ছেদ।

কোনো রকম প্রতিশ্রুতিভঙ্গ নয়, রাগারাগি নয়, মান-অভিমান নয়, সহজ-শান্তভাবেই দুজনে ঠিক করেছিলেন, আর তাঁদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আর গোপন মিলনের প্রশ্ন নেই। তাঁরা স্বেচ্ছায় পরস্পরের কাছ থেকে মুক্ত।

বিছানা থেকে নেমে, একটা চেয়ারের ওপর রাখা তাঁর জামাটা তুলে নিয়ে পরতে পরতে সত্যব্রত বলেছিলেন, আমি আর আসব না, কিন্তু, আই ওয়ান্ট ইউ হ্যাপি। তোমার জীবনে নিশ্চয়ই অন্য কেউ আসবে, কোনও প্রিন্স চার্মিং।

বিছানার ওপর হাঁটুতে থুতনি রেখে বসেছিল অনসূয়া। শুধু সায়া আর ব্রা পরা, যদিও সে দিন তাদের কোনো শরীরের খেলা হয়নি।

সামান্য হেসে সে বলেছিল, প্রিন্স চার্মিং? আমার সহ্য হবে না। বরং কিছুদিন চেষ্টা করে দেখি, কোনো পুরুষ মানুষ ছাড়াই আমি বাঁচতে পারি কি না।

সত্যব্রত বলেছিলেন, না, না, সেটা ঠিক নয়। ফেমিনিস্টরা যাই-ই বলুক, প্রেম ছাড়া জীবনটা বড় নীরস হয়ে যায়।

অনসূয়া বলেছিল, আমি তেমন ফেমিনিস্ট নয় মোটেই। আমার তো একজন প্রেমিক আছেনই। রবীন্দ্রনাথ। তিনি তো আমাকে এখনই প্রায়ই কাঁদান।

রাস্তায় বেরিয়ে সে দিন সত্যব্রত অনেকটা ভারমুক্ত বোধ করেছিলেন। টানা চার বছরের সম্পর্ক শেষ। একটু একটু মন খারাপ কি লাগেনি? সেটাও তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনসূয়াকে তো তিনি সত্যিই ভালোবেসেছিলেন। তবু সম্পর্ক ভাঙতে হল।

শুরুটা হয়েছিল অকস্মাৎ।

সত্যব্রত সুদর্শন, সুপুরুষ না হলেও দীর্ঘকায় সবল, সুস্থ পুরুষ। গায়ক হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। কিছুটা ক্লাসিকাল ট্রেনিং আছে, এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং ফিল্মের গান, দু রকমেরই সার্থক। অনেকটা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতন। লোকের সঙ্গে ব্যবহার ভালো, আড্ডাতেও জনপ্রিয়। এরকম শিল্পীদের প্রতি যুবতীরা অনেকেই আকৃষ্ট হয়।

নতুন অভিনেত্রী বিদিশা যখন তাঁর প্রেমে পড়ে, তখনও সত্যব্রতর একটা খ্যাতি হয়নি। বিদিশার দিক থেকে নিছক আকর্ষণই ছিল না, ছিল খাঁটি প্রেম। সত্যব্রতই কিছুটা অস্থির ও নিজের কেরিয়ার তৈরির জন্য ব্যস্ত, বিয়ের কথা চিন্তা করেননি, কিন্তু বিদিশার আন্তরিকতার সৌরভে মুগ্ধ না হয়ে উপায় রইল না।

বিয়ের পর বিদিশা ফিল্মের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিল। এমনকী সে সময় মুম্বইয়ের একটা হিন্দি ফিল্মে ডাক পাওয়ার সুযোগ এসেছিল। বিদিশা তা নিল না। সত্যব্রতর কোনো আপত্তি ছিল না, বরং সে উৎসাহই দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বিশাখা সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মেয়ে, সিনেমায় হইহল্লোড়ের জগতের সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি, সে গানবাজনা ভালোবাসে, তার মা-ও ভালো গায়িকা ছিলেন। বিয়ের ঠিক দু বছর পর তার যমজ সন্তান হয়, দুইটি মেয়ে। সেই মেয়ে দুটির মা হয়ে সে পুরোপুরি সংসারী হয়ে যায়।

বিদিশা আর সত্যব্রত আদর্শ দম্পতি। সত্যব্রতর খ্যাতি ও উপার্জন বৃদ্ধির মূলে আছে বিদিশা, এমন মনে করত অনেকেই। সত্যব্রতকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয় প্রায়ই, কলকাতাতেও স্নান-খাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে না, স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য সময় দিতে পারেনি, তবু তা নিয়ে কক্ষনো মেজাজ খারাপ করেনি বিদিশা। বরং সত্যব্রত যখন কিছু কিছু গানে নিজেই সুর দিতে শুরু করলেন, তখন তাঁকে সাহায্য করত বিদিশা, তার সুর জ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ। সত্যব্রত প্রকাশ্যেই স্বীকার করতেন তাঁর স্ত্রীর সাহায্যের কথা।

প্রায় ষোলো বছরের নিরবচ্ছিন্ন সুখী দাম্পত্য জীবনের পর একটার পর

একটা ধাক্কা লাগতে শুরু করে।

মাঝে মাঝে বাইরের কোনো গানের আসরে আমন্ত্রণ পেলে সত্যব্রত তাঁর স্ত্রী আর মেয়েদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বেড়িয়ে আসতেন কয়েকদিনের জন্য। সেরকমই একবার গেলেন শিলচর। দু দিন গানের প্রোগ্রাম, তারপর উদ্যোক্তাদের একজন নিয়ে গেলেন এক চা-বাগানে।

মার্চ মাসের প্রথম, তখনও গরম পড়েনি। চা-বাগানের বিশাল বাংলোর তিন দিকে অপূর্ব ফুলের সমারোহ! এমন তকতকে নীল আকাশ কলকাতায় দেখা যায় না। এমন উজ্জ্বল চাঁদও ওঠে না কলকাতার আকাশে।

মেয়ে দুটি সবে চোদ্দো বছর বয়েসে পা দিয়েছে। মায়ের মতনই তারা সুন্দর, তারা ফুলের মতন ফুটে উঠছে। দুজনের একইরকম চেহারা, বাইরের লোক আলাদাভাবে চিনতে পারে না। দুজনে যখন নাচে, তখন মনে হয় ঠিক যেন দুটি পরি। পরিদের রূপও তো একইরকম হয়।

বাংলোর পেছন দিকেই একটা নদী, খুবই সরু, এক হাঁটু জল, কিন্তু স্রোত আছে। এত ছোট নদী কাজরী আর রুমুলা কখনও দেখেনি। পরিষ্কার টলটল জল, তলার পাথর স্পষ্ট দেখা যায়, দু-একটা ছোট ছোট মাছও চিকচিক করে। ঠিক যেন নিজস্ব একটা পোষা নদী। দুই বোন সেই নদীকে নিয়েই বেশি সময় কাটায়। এই বয়েসের মেয়েরা জলের স্রোত খুব ভালোবাসে।

চা-বাগানের ম্যানেজার অখিল দত্ত সত্যব্রতর গানের ভক্ত ঠিকই, তা ছাড়াও সে বিদিশাকে চিনতে পেরেছে। সে ছাত্রবয়েসে 'মায়ামৃগ' নামে একটা বাংলা সিনেমা দেখেছিল, সেই সিনেমার নায়িকার কথা তার আজও মনে আছে। সে প্রসঙ্গ উঠলে বিদিশা লজ্জা পায়। কিন্তু অখিল বারবার সেই কথা বলে। তাতে বেশ মজা পান সত্যব্রত।

এক সন্ধেবেলা কাজরীর জ্বর হল। বেশি না, নিরানব্বই পয়েন্ট পাঁচ। তার পরদিন একশ তিন। তার পরের দিন একশ পাঁচ পয়েন্ট আট।

চা-বাগানের ডাক্তার দ্বিতীয় দিনই ওষুধ দিয়েছিলেন, চতুর্থ দিন সকালে বললেন, লক্ষণ ভালো দেখছি না। কলকাতায় নিয়ে যায়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করতে আর একদিন দেরি হয়ে গেল। কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি বেল ভিউ নার্সিং হোম। আর একবেলাও চিকিৎসার সময় পাওয়া গেল না।

এরকম মৃত্যু তো কতই ঘটে, কিন্তু যে বাবা-মায়ের কাছ থেকে এরকমভাবে সন্তান চলে যায়, তাদের আঘাত যে কতখানি, তা অন্য কারওর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। না, তিনজন। রুমুলাও প্রথম দিন খুব কান্নার পর চুপ করে গিয়েছিল একেবারে।

এই সময় সত্যব্রত প্রায় তিন মাস কোনো গানের অনুষ্ঠানে যাননি। বাড়ি থেকে বেরুতে চাইতেন না। বিদিশাই তাঁকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে বলেছে।

পরের বছরই বিদিশার স্তনের ক্যানসার ধরা পড়ল।

প্রথম প্রথম ডাক্তাররা বলেছিলেন, এমন গুরুতর কিছু না। খুব সহজ অপারেশন। তাও ব্যস্ততার কিছু নেই। সামনের শীতকালেই ভালো হবে। এখন ওষুধ চলুক।

দুর্গাপুজোর পরই বিদিশার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল হঠাৎ। যখন তখন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। ব্লাড প্রেশার অত্যন্ত কম। ডাক্তারদের ভুরু কুচকে গেল।

বিদিশার বোন গার্গী আজ দেশে এসেছে। তার স্বামী সুইডিশ, ভাসুর একজন নামকরা সার্জন। গার্গী খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে বিদিশা আর মেয়েকে নিয়ে চলে গেল সুইডেন।

বিদিশা আর রুমুলা স্টকহল্‌মে রয়ে গেল ন মাস। লন্ডনে একটা অনুষ্ঠান করতে গিয়ে সত্যব্রতও ওদের দেখে এলেন সাতদিনের মতো। সেখানেই সত্যব্রত প্রথম তাঁর স্ত্রীর একটা পরিবর্তন লক্ষ করলেন। বিদিশা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যেন লজ্জা পায়, চোখাচোখি হলে চোখ নামিয়ে নেয়। বিদিশার বুকের একদিকে একটা স্তন নেই, এটাই কি লজ্জার কারণ? যাঃ, এর কোনো মানেই হয় না।

সুইডেন থেকে বিদিশা ফিরে এল, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে। তবে নিয়মিত চেক-আপ করিয়ে যেতে হবে। টানা দু বছর প্রতি মাসে চেক-আপ করিয়েও সেই রোগের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। তবু, বিদিশার সর্বক্ষণ কেমন যেন একটা মনমরা ভাব। কিছুতেই সে। স্বাভাবিক হতে পারছে না।

এর পরের ধাক্কাটা আরও প্রচণ্ড।

বিদিশার ছোট ভাই স্বরূপ থাকে বেঙ্গালুরুতে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি নিয়েছে সেখানে। খুবই শান্ত, ভদ্র ছেলে, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কম্পানি তাকে একটা ফ্ল্যাট দিয়েছে, ভালো পাড়ায় তিন কামরার ফ্ল্যাট, তার কলেজের বন্ধুবান্ধবরা প্রায় সেখানে যায়। সত্যব্রতও একবার বেঙ্গালুরুতে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে ছোট শ্যালকটির কাছে দিন তিনেক থেকে এসেছিলেন।

স্বরূপের এক বন্ধু নীলাঞ্জন আর তার স্ত্রী শ্রীলা দিন সাতেক ছিল তার ফ্ল্যাটে। নীলাঞ্জন গিয়েছিল তার অফিসের কাজে, স্বরূপই তার বন্ধু-দম্পতিকে হোটেলে থাকতে দেয়নি। গাড়ি নিয়ে তিনজনে মাইসোর আর বেলুড়-হলিবিড বেড়াতে গিয়েছিল।

নীলাঞ্জনেরা ফিরে আসার দু দিন পরে স্বরূপকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। আকস্মিক অসুখ নয়, খুন নয়, নিশ্চিত আত্মহত্যা। খাটের নীচে পড়েছিল আর্সেনিক বিষের শিশি।

স্বরূপ কেন আত্মহত্যা করল, তা জানা যায়নি। আপাতত কোনো কারণই নেই। তার চাকরিতে কিংবা সামাজিক জীবনে কোনো রকম সঙ্কট দেখা দেয়নি। স্তম্ভিত, মর্মাহত নীলাঞ্জন আর শ্রীলা বারবার বলেছে যে তারা স্বরূপকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দেখেছে। তবে! মানুষ কেন আত্মহত্যা করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ঠিক ঠিক কারণ কি বোঝা যায়? হৃদয়ের অনেক জটিল রহস্যের কথা অন্যের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

এই আঘাতে বিদিশা একেবারে ভেঙে পড়েছিল।

তার মতো একটি সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন নারীর পরপর এতগুলি আঘাত মোটেই প্রাপ্য ছিল না। কিন্তু জীবন যে কার প্রতি কখন অতি নিষ্ঠুর হয়, তাও তো বলা যায় না। এটা অন্যায়, প্রকৃতি বা নিয়তি যাই হোক, তার খুবই অন্যায়। ভগবান বলে কিছু থাকলে তা হলে তো সেই ভগবানকেও ক্ষমা করা যায় না এ জন্য!

বিদিশা নিজের মেয়েকে হারিয়েছে, তারপর তার শরীরের একটি সুন্দর অঙ্গ, তার একটি স্তন বাদ গিয়েছে। এবার তার ছোট ভাই...। এতগুলি আঘাত সহ্য করা সব মানুষের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

বিদিশা বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল একেবারে। সে কোথাও যায় না, বাড়ি থেকে বেরুতেই চায় না পারতপক্ষে, টেলিফোন ধরে না। রেণু আর তার ছেলে না থাকলে এ বাড়ির গৃহস্থালি চালানোই অসম্ভব হত।

সত্যব্রতও এই সব ঘটনায় উদ্‌ভ্রান্ত ও আহত হয়েছিলেন কিছুদিন।

গানবাজনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েকটা রেকর্ডিংয়ের ডেট ক্যানসেল করেছেন। বাড়িতে থেকে সাহচর্য দিতেন স্ত্রীকে।

কিন্তু সত্যব্রত তাঁর স্ত্রীর মতন অত কোমল, অন্তর্মুখী মানুষ নন। বাইরের জীবনের উদ্দামতা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সুতরাং বেশিদিন আর তিনি বাড়িতে বসে থাকবেন কী করে? গানও তিনি ছাড়তে পারবেন না। শুধু তো নির্জনে সঙ্গীতসাধনা নয়, মঞ্চে বসে গান গাইবার পর শ্রোতাদের হাততালিও একটা মোহ আছে। টাকাপয়সাও তো উপার্জন করতে হবে।

পারফর্মিং আর্টসে কোনো শিল্পীর দীর্ঘকালের অনুপস্থিতি জনসাধারণ মেনে নেয় না। প্রবাদটি তো আছে, জনগণের স্মৃতি অতি সংক্ষিপ্ত। মঞ্চ থেকে একবার স্বেচ্ছায় বিদায় নিলে ফিরে আসা খুবই শক্ত। কিন্তু সত্যব্রত ফিরে আসতে পারলেন, অচিরেই পুনরুদ্ধার করলেন তাঁর আগেকার খ্যাতি। আবার বাইরের নানা শহরের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাগলেন। ফিল্মের গানের রেকর্ডিংয়ের জন্য চলে যান মুম্বই কিংবা চেন্নাই।

এখনও মাঝে মাঝে তাঁর মন খারাপ হয়, মনে পড়ে যায় মেয়ের কথা, স্বরূপের কথা। বিদিশার বিষাদমাখা মুখখানা দেখে তাঁর বুক মুচড়ে ওঠে। তখন নিজেরও হাত-পা যেন অবশ হয়ে যায়, গলা দিয়ে সুর বেরুতে চায় না। তবু দু-একদিনের মধ্যেই মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে সেই অবসাদ কাটিয়ে ওঠেন, দু-একটা পার্টিতে গিয়ে হল্লোড় করেন খুব, মদ্যপানের বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

এইরকমই একটা সময়ে তাঁর জীবনে আসে অনসূয়া।

প্রথম দেখা হয় একটি গানের আসরে। মণ্টু, তার ভালো নাম শোভন সরকার, সে সত্যব্রতর একরকম চেলা। সত্যব্রতর সঙ্গে দুর্গাপুর, বহরমপুরের অনুষ্ঠানে গিয়ে নিজেও দু-একখানা গান গাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

সেই মণ্টুই একদিন শিশির মঞ্চে উইংসের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, সত্যদা, এ আমার বোন অনসূয়া, আপনার খুব ভক্ত, একবার আপনার সামনাসামনি এসে দেখতে চেয়েছিল।

এরকম তো কতবারই হয়। অনেক মেয়েই আলাপ করতে আসে, দাদা-টাদার সঙ্গে নয়, নিজেরাই আসে। কেউ কেউ বেশি স্মার্ট, কেউ কেউ আবার প্রথমেই আহ্লাদে গলে পড়ে।

তবু যতবারই কেউ এসে বলে, আপনার ভক্ত, ততবারই শুনতে ভালো লাগে। কোনো মেয়েই কি, 'আপনি কী সুন্দর' এই কথাটা বার বার শুনলেও ক্লান্ত

হয়? সেরকমই। শিল্পীরাও ভক্তের তালিকা যতই বাড়ে, ততই আনন্দ পায়।

প্রথম দেখায় মেয়েটির সে রকম কোনো বিশেষত্ব চোখে পড়েনি। নতমুখী, লাজুক। সে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল, সত্যব্রত বাধা দিয়ে একটু পিছিয়ে গেলেন। তিনি প্রণাম-ট্রনামের ধার ধারেন না।

মণ্টু আবার বলল, ও রবীন্দ্রভারতীতে মিউজিকের কোর্স করেছে। আপনার কথা এত বলে...

মেয়েটি বলল, আমার দিদি আমার চেয়েও আপনার বেশি ভক্ত।

শুধু ওই একটি কথা। অতি তুচ্ছ। মঞ্চে উঁকি পড়ল, সত্যব্রত ভেতরে চলে গেলেন। এবং ভুলে গেলেন মেয়েটির কথা।

কয়েকদিন পরেই আবার দেখলেন অনসূয়াকে রবীন্দ্রসদনের সামনের দিকের সিটে। প্রথমে তিনি চিনতে পারলেন না যথারীতি। কিন্তু একটি মেয়ে তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বলে তাঁর একটু খটকা লাগল।

আবার তাকে দেখলেন দু দিন বাদেই বসুশ্রী সিনেমার লবিতে। এই এক মজা। পনেরো দিন আগেও মেয়েটির কোনো অস্তিত্বই ছিল না সত্যব্রতর কাছে। একবার আলাপ হওয়ার পর ঘন ঘন দেখা হয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে। অনেক শব্দ নতুন লিখলেও এরকম হয়। তারপরেই শব্দটি খবরের কাগজ কিংবা বই খুললেই চোখে পড়ে।

মেয়েটি কি তাকে অনুসরণ করছে? তা নিশ্চয়ই নয়। তার কোনো কারণই নেই। সে আর কথা বলতে আসেনি। সত্যব্রতই কাছে এগিয়ে ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেমন আছ?

পঞ্চমবার পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হল। সে দিন মহাজাতি সদনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি অনসূয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে গানবাজনার আসরে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না! ইদানীং দেখছি কয়েকবার।

অনসূয়া বলল, আমি কিছুদিন বাইরে ছিলাম।

বাইরে ছিলে? কোথায়?

এই কলকাতার বাইরে। তা ছাড়া তারও আগে চাকরি করতাম।

এখন আর চাকরি করো না?

কিছুদিন করছি না।

তুমি বলেছিলে, তোমার দিদি গানটান বেশি ভালোবাসেন। তিনি আসেন না?

দিদি এখন দুর্গাপুরে। একদিনের মধ্যেই ফিরবে।

তুমি কোথায় থাকো?

যোধপুর পার্কে।

আচ্ছা, চলি।

মেয়েটি বেশি কথা বলে না, প্রশ্নের ছোট ছোট উত্তর দেয়। সত্যব্রত লক্ষ করলেন, ওর কোমর ও বুকের গড়ন বেশ লীলায়িত।

সে দিন সত্যব্রত নিজের গাড়ি আনেননি। উদ্যোক্তারা এনেছে, পৌঁছে দেবে।

পাশের গলি থেকে বড় রাস্তার বাঁকের মুখে গাড়িটা আসার পর সত্যব্রত দেখলেন অনসূয়া দাঁড়িয়ে আছে বাসের অপেক্ষায়।

বৃষ্টি পড়ছে। অনেকেরই মাথায় ছাতা। মেয়েটি ভিজছে।

জানলার কাচ নামিয়ে সত্যব্রত জিজ্ঞেস করলেন, তোমায় লিফট দেব? যেখানে বলবে, আমি নামিয়ে দিতে পারি।

অনসূয়া বলল, না, না, আমার কোনো অসুবিধে নেই।

সত্যব্রত বললেন, আমি অনেকটা ওই দিকেই যাব। তুমি রাসবিহারীর মোড় পর্যন্ত যেতে পারো। কিংবা তোমার বাড়িতেও নামিয়ে দিয়ে আসবে এই গাড়ি।

আপনি কেন শুধু শুধু কষ্ট করবেন?

এর মধ্যে কষ্টের কী আছে? বৃষ্টি পড়ছে বলেই বলছি। এসো, উঠে এসো।

সত্যব্রত যখনই কোনো অনুষ্ঠানে যান, সঙ্গে একটা ব্যাগ রাখেন।

তার মধ্যে থাকে তাঁর নিজস্ব জলের বোতল, এলাচের কৌটো ইত্যাদি।

সিগারেট ধরাবার বদলে তিনি কৌটো খুলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এলাচ কিংবা লবঙ্গ নেবে?

অনসূয়া বলল, না।

মুখে দুটো লবঙ্গ দিয়ে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কলকাতার বাইরে কোথায় ছিলে?

এই, বাইরে।

বাইরে মানে, দেশের বাইরে?

ল্যাঙ্কাশায়ারে।

ও, ইংল্যান্ডে।

বিয়ের পরে গিয়েছিলে?

হঠাৎ এ কথা আপনার মনে হল কেন?

এরকমই তো হয়। আমাদের দেশের ভালো ভালো ছেলেরা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিদেশে গিয়ে সেটল করে। এক ফাঁকে দেশে এসে এক একটি বাছাই করা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যায়। এইভাবে শুধু ব্রেন-ড্রেন নয়, সুন্দরী মেয়েরাও পাচার হয়ে যাচ্ছে।

শুধু ছেলেরাই বিয়ের আগে বিদেশে যায়? আর মেয়েরা যায় বিয়ের পরে?

তুমি সে রকমভাবে যাওনি?

আমি ও দেশে পড়তে গিয়েছিলাম। তার পর অবশ্য ওখানেই বিয়ে হয়েছে।

তারপর দুজনেই ফিরে এসেছে? পার্মানেন্টলি?

আপনি এ সব জানতে চাইছেন কেন, বলুন তো?

সত্যি, এ সব জানার কোনো দরকার নেই আমার। এমনিই কৌতূহল। এক গাড়িতে যাচ্ছি, কিছু কথা না বলে চুপ করে বসে থাকা কি ভালো? আসলে, আমি তোমার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানিই না।

আমি তো বিশেষ কেউ নই, তাই জানবার মতোও কিছু নেই।

সকলেই বিশেষ।

গাড়ি যাচ্ছে ময়দানের মধ্য দিয়ে। বৃষ্টির জন্য জনবিরল। গাছপালাগুলো স্নান করে খুশি হচ্ছে বোঝা যায়।

পেছনের সিটে পাশাপাশি বসলে মুখটা দেখা যায় না ভালো করে। আঁচলের পাশে অনসূয়ার একটা হাত। তেমন ফরসা নয় মেয়েটি, মাজা মাজা রং। একটা সাদা ব্যান্ডের ঘড়ি পরা, কোনো আঙুলে আংটি নেই। তার আঙুলগুলো সুন্দর। নখে লালচে আভা, কিন্তু রং করা নয়।

সত্যব্রত একবার ভাবলেন, একটাও আংটি পরে না, এমন মেয়ে কি তিনি এর আগে দেখেছেন?

তিনি বললেন, তোমার অন্য হাতটা দেখি।

অনসূয়া ডান হাতটা তুলল, সে হাতেও আংটি নেই। সত্যব্রত তার হাতটা মুঠো করে ধরলেন।

অনসূয়া জিজ্ঞেস করল, এ কী, আপনি আমার হাত ধরলেন কেন?

সত্যব্রত বললেন, এমনিই, তোমার হাতটা সুন্দর।

এবার অনসূয়া বেশ ঝাঁঝাল গলায় বলল, এমনি এমনি হাত ধরবেন? সেই জন্য আপনি আমাকে গাড়িতে তুলেছেন?

আরে, শুধু হাত ধরায় দোষের কী আছে?

আপনি ধরবেন কেন? গাড়ি থামান, আমি এখানেই নেমে যাব।

কী মুশকিল, সামান্য ব্যাপারে তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছে কেন?

গাড়িটা থামাতে বলুন!

তুমি বেশি নাটক করে ফেলছ। বৃষ্টি পড়ছে, তুমি মাঠের মধ্যে নেমে পড়বে? সুযোগ পেলেই, ওই যে কী যেন বলে, মেয়েদের শ্লীলতাহানি করার অভ্যেস আমার নেই।

আমি এখানেই নেমে যেতে চাই।

ঠিক আছে, মোড়ের মাথা আসুক কিংবা রবীন্দ্রসদনের কাছে নেমে যেও। এরকম শুচিবাইগ্রস্ত মেয়ে তো আমি আগে দেখিনি।

রবীন্দ্রসদনে পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি বেড়ে গেল। আর একটাও কথা হয়নি দুজনের।

লাল আলোতে গাড়িটা থেমেছে।

সত্যব্রত শুষ্ক গলায় বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে এখানে নেমে পড়তে পারো। আর যদি বৃষ্টিতে ভিজতে না চাও, বস। কোথাও ভালো ছাউনি দেখে...

অনসূয়া বলল, আমি এখানেই নামতে চাই। বৃষ্টিতে ভিজতে আমার ভালো লাগে।

সত্যব্রত ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে নিজেই দরজাটা খুলে দিলেন। অনসূয়ার দৌড়ে যাওয়াটা তিনি আর দেখলেন না, সিগারেট ধরালেন অন্য দিকে তাকিয়ে।

এমন অনেক মেয়ে আছে, সত্যব্রত দাশগুপ্ত যাদের হাত ধরলে তারা গা এলিয়ে দেয়। ইচ্ছে করে বুক ঠেকায়। উরুতে হাত রাখলেও হাত সরিয়ে নেয় না। এ মেয়েটি তাদের তুলনায় এমন কিছু আহামারি নয়।

সত্যব্রত ভেবেছিলেন, আর কখনও দেখা হবে না। দেখা হলেও তিনি অনসূয়াকে না-চেনার ভান করবেন।

পরদিন সকালেই ফোন।

আমি অনসূয়া বলছি, মানে, কাল মহাজাতি সদন থেকে আপনার

সঙ্গে...আপনি কি আমায় চিনতে পারছেন?

সত্যব্রত গম্ভীরভাবে বললেন, হ্যাঁ, আজ আবার কী ব্যাপার?

না, মানে, আপনি কাল বৃষ্টির মধ্যে দয়া করে আমাকে আপনার গাড়িতে লিফট দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি...

থামলে কেন? বলো। কিন্তু আমি, কী?

আমি কাল অত্যন্ত অভদ্রের মতন, আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে, মানে আমার এত লজ্জা করছে।

বেশ তো লজ্জা করছে, সেই লজ্জা ধুয়ে খাও। আমি এখন ব্যস্ত আছি।

শুনুন, শুনুন, ফোনটা রেখে দেবেন না, আমি বেশি সময় নেব না, আমি শুধু বলতে চাই, আমি খুবই দুঃখিত আর ক্ষমা চাইছি, আপনার মতন মানুষের সঙ্গে ওরকম অভদ্রের মতন ব্যবহার করায়, ছি ছি, আমার দিদি এমন বলল, আই সিনসিয়ারলি অ্যাপোলোজাইস টু ইউ।

শোনো, অনুপমা না অনসূয়া, কী যেন তোমার নাম, তুমি কাল যা করেছ, খুব বুদ্ধিমতীর মতনই কাজ করেছ, যার তার কথায় এ রকম গাড়ির লিফট নিতে নেই, মাঝপথে নেমে যাওয়ার যে সাহস দেখিয়েছ...

না, না, এ কী বলছেন? আপনার মতন মানুষ, দিদি বলল যে আমাদের সৌভাগ্য।

আমাকে তুমি তো কিছুই চেনো না। কী রকম মানুষ আমি, কী করে জানলে? শোনো, আমি কাল যে গাড়িতে তোমার হাত ধরেছিলাম, তা এমনি এমনি নয়। সেটা সিডিউস করার ফার্স্ট স্টেপ। তুমি যদি তাতে আপত্তি না করতে, তা হলে আমি তোমার কোমর জড়িয়ে ধরতাম, তারপর—

না, না, প্লিজ এ রকম বলবেন না। জানি, আপনি আমার ওপর খুবই রেগে আছেন—

রাগের প্রশ্নই নেই। সকালবেলা ঠান্ডা মাথায় সত্যি কথা বলছি। আমি কতটা দুশ্চরিত্র তুমি ধারণাই করতে পারবে না। অনেকেই জানে, আমি একটা মাতাল, মেয়েবাজ, ফ্লেশ ইটার, শুধু মেয়েদের মাংস খেতে ভালোবাসি।

আমি ও সব শুনতে চাই না। আমি জানি আপনি একজন শিল্পী...

শিল্পী না ছাই। গান গাইলেই শিল্পী হয় না। লোকে যাদের শিল্পী বলে, তারা অনেকেই কুকুরে পেচ্ছাপ করা ধোওয়া তুলসীপাতা! এক একটা বদের হাঁড়ি! আর আমি সেই বদেদের চ্যাম্পিয়ন। কালকে আমার গাড়ি থেকে নেমে

গেছ, খুব ভালো করেছ। আর কক্ষনো আমার ধারেকাছে এসো না।

যাঁরা নিজেরা ওইরকম, তাঁরা কখনও নিজের মুখে ওই সব কথা স্বীকার করেন না। জানি, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। আমার ওপরে এখনও রাগ করে থাকাই স্বাভাবিক। আমি আর একটা কথা শুধু বলব। দুর্গাপুরে একজনের বাড়িতে আপনি অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে, দিদি ছিলেন সেখানে। দিদি জানেন, আপনি কেমন মানুষ। আমি আপনার পা ধরে ক্ষমা চাইতে রাজি আছি।

ও সব পা ধরা-টরা আমি গ্রাহ্য করি না।

আপনি আমাদের বাড়িতে একদিন আসবেন?

তার মানে। হঠাৎ তোমাদের বাড়িতে যাব কেন? আমার অন্যান্য বদগুণ যাই-ই থাক, আমার সময়েরও তো একটা দাম আছে। আফটার অল, আই অ্যাম প্রফেশনাল।

দিদি বলল, আপনি সব সময় প্রফেশনাল নন। টাকা ছাড়াও অনেক জায়গায় যান। পরশুদিন আমাদের বাড়িতে একটা গেট টুগেদার আছে, কয়েকজন বন্ধু আসবেন, আপনি যদি হঠাৎ এসে পড়েন, আমরা ধন্য হব।

তোমার দিদিকে আমি চিনতে পারছি না। মণ্টুও তোমার দিদি সম্পর্কে কিছু বলেনি কখনও। এনিওয়ে, তোমার দিদিই আমাকে ফোন করছেন না কেন?

আমি আপনার কাছে দোষ করেছি। দিদি তাই আমাকেই ফোন করতে বললেন। যোধপুর পার্কের ঠিক উলটো দিকে আমাদের বাড়ি। ইয়েলো রঙের, লোহার গেটের ওপর ময়ূরের ডিজাইন।

সরি, পরশু কোথাও যাওয়ার কোশ্চেনই ওঠে না। আমার রেকর্ডিং আছে সারা সন্ধে।

কিছুটা দেরি হলেও।

ইমপসিবল।

তা হলে তার পরের দিন? আমরা পার্টিটা পিছিয়ে দিতে পারি।

আমি কমিট করতে পারছি না। এরকমভাবে কোনো পার্টিতে যাওয়া...না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

ফোনটা রেখে দেওয়ার পরও কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইল সত্যব্রতর। মেয়েটির এরকম দুর্বোধ্য আচরণের জন্যই ওকে ভুলে যাওয়া সম্ভব হল না।

তারিখটা মনে আছে, ১৪ অগাস্ট। সেই দিনই রাত্তিরের ফ্লাইটে সত্যব্রতর দিল্লিতে যাওয়ার কথা। সেবারে সত্যব্রত রাষ্ট্রপতি ভবনে গান গাইবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। সে দিন একটা নতুন রেকর্ডিং স্টুডিওর উদ্বোধন হল। দুপুরে খাওয়াদাওয়া। যেতেই হয়েছিল সত্যব্রতকে। আহারান্তে বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন ভেবেছিলেন, স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, রাস্তার ঠিক উলটো দিকে একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অনসূয়া।

সত্যব্রত একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। সত্যি তো, এটা যোধপুর পার্ক, হলুদ রঙের বাড়ি, সামনের গেটের ওপর একটা লোহার ময়ূর।

বলাই বাহুল্য, এ বাড়ির কোনো পার্টিতে তিনি আসেননি। আজকেও, স্টুডিওটা যে এ পাড়াতেই তা খেয়াল করেননি তিনি।

কপালের কাছে হাত জোড় করে অনসূয়া বলল, এ বাড়িতে আমি থাকি।

সত্যব্রত বললেন, আচ্ছা।

অনসূয়া বলল, একবার আসবেন? যদি এক কাপ চা কিংবা কফি খেয়ে যান। অবশ্য তিনতলায় উঠতে হবে, যদি আপনার অসুবিধে না হয়—

সময় আছে কি না, যাওয়ার ইচ্ছে আছে কি না, তার চেয়েও তিনতলায় ওঠার অসুবিধেটা কি বড় হতে পারে?

তিনতলার সিঁড়ি ভাঙতে এখন বেশ হাঁপিয়ে যান ঠিকই, কিন্তু বাইরের কারওর কাছে তা স্বীকার করতে এখনও পৌরুষে বাধে।

ওই তিনতলা শব্দটার জন্যই তিনি রাজি হয়ে বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে, চলো। গুরুভোজ হয়ে গেছে, এর পর এক কাপ ব্ল্যাক কফি।

একটুও না থেমে অনসূয়ার পাশাপাশি উঠে এলেন তিনতলায়। হাঁপধরা ভাবটা যতদূর সম্ভব গোপন করার চেষ্টা করছেন, অনসূয়া চাবি দিয়ে দরজা খুলতে কিছুটা সময় নিল।

বেশ বড় ফ্ল্যাট। সামনের বসবার ঘরটায় এক দিকে চেয়ার-টেবিল, অন্য দিকে সোফা সেট, মাঝখানে কার্পেট পাতা, তার ওপরে একটা হারমোনিয়াম।

সত্যব্রত ভেতরে এসে বললেন, এটা তোমার দিদির ফ্ল্যাট?

অনসূয়া বলল, আমি আর দিদি একসঙ্গে থাকি।

দিদি কোথায়?

দিদি অফিসে। আজ তো ছুটির দিন নয়।

যদি জিজ্ঞেস করি, তোমার দিদি কী চাকরি করেন, তুমি চাকরি করো

না? ও, না, না, তুমি তো ইংল্যান্ড থেকে বেড়াতে এসেছ। সাধারণত এরকম গরমকালে শীতের পাখিরা আসে না।

আমি শীতের পাখি নই। আমি পাকাপাকিই চলে এসেছি। চাকরি খুঁজছি। দিদি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি।

কী নাম?

রুচিরা সোম।

অফ কোর্স, তোমার দিদিকে আমি চিনি। অনেকবার দেখা হয়েছে, মণ্টুর দিদি। মণ্টুর দিদি যে তোমারও দিদি, এটা কানেক্ট করতে পারিনি। হারমোনিয়াম দেখছি, কে গানের চর্চা করে? তুমি গান গাও?

দিদিই ভালো গাইতে পারে। বাইরে গায় না। আমি চেষ্টা করি, কিছুই পারি না। দাঁড়ান, কফির জল চড়িয়ে দিয়ে আসি।

রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে অনসূয়া দেখল, তখনও সত্যব্রত দাঁড়িয়ে আছেন, দেয়ালের ছবি দেখছেন।

অনসূয়া বলল, এ কী, বসুন!

সত্যব্রত মুখ ফিরিয়ে বেশ কয়েক পলক চুপ করে তাকিয়ে রইলেন অনসূয়ার মুখের দিকে।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, বসবার আগে, সে প্রশ্নটা আমার মনে ঘুরছে, সেটা জিজ্ঞেস করতে পারি?

অবশ্যই পারেন।

আমি ভাবছি, যে মেয়ে প্রকাশ্য জায়গায়, গাড়িতে ড্রাইভার আছে, সেখানে একজন লোক শুধু তার হাতটা ধরলে অতখানি রি-অ্যাক্ট করে, মাঝপথে নেমে যায়, সেই মেয়েই নিজের নির্জন বাড়িতে, আর কেউ নেই, তবু সেই একই লোককে স্বেচ্ছায় ডেকে আনবে কেন?

আপনি নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছেন, আমি একটা পাগল কিংবা ন্যাকা। কিংবা একেবারেই প্রাফ, খুব মরালিস্ট। আসলে সে দিনের ব্যবহার আমি ঠিক কীভাবে এক্সপ্লেন করব জানি না। সত্যি হয়তো বোঝাতে পারব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, প্রায় দেড় বছর, ঠিকঠাক বলতে গেলে এক বছর দশ মাস, কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে আমার সামান্য ছোঁয়াছুঁয়িও হয়নি, তাই আপনি হঠাৎ যখন আমার হাতটা ধরলেন আমি এমন চমকে উঠলাম, এমন একটা কিছু হল, হয়তো সেটা লুকোবার জন্যই।

কোনো পুরুষের সঙ্গে তোমার ছোঁয়াছুঁয়ি হয়নি? কেন? পুরুষ তোমার কাছে অস্পৃশ্য? তুমি কি, ওই যে কী বলে যেন, লেসবিয়ান?

না, মোটেই তা নয়। প্লিজ, ও সব কিছু ভাববেন না!

যেখান থেকে থেমেছিল, আমি সেখান থেকে আবার শুরু করতে চাই। আমি তোমার হাত ধরব। বসো।

পাশাপাশি বসার পর সত্যব্রত অনসূয়ার একটি হাত ধরলেন। তার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। অনসূয়ার হাতটা একটু কাঁপছে, কিন্তু সরিয়ে নেওয়ার কোনো চেষ্টা করল না।

সত্যব্রত ধীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

অনসূয়া ওঁর চোখে চোখ রেখে বলল, আমি একটি মেয়ে, খুব সাধারণ না, আবার অসাধারণও কিছু না।

কয়েক সপ্তাহ আগেও আমি তোমাকে চিনতাম না। তোমার এক ভাইকে চিনি, তোমাকে দিদিকেও দেখেছি কয়েকবার, কিন্তু তোমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না আমার জীবনে। অথচ এর মধ্যে ঘন ঘন দেখা হতে লাগল, আজকে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার বাড়ির দরজায়, এখন আমি তোমার সঙ্গে এই ঘরে, এর মধ্যে যেন কিছু একটা নিয়তির ব্যাপার আছে, যেন এটা প্রিডেস্টিন্‌ড, আমি এরকম বিশ্বাস করি।

না, সে রকম কিছু না। অনেকদিন দেশে ছিলাম না, তাই আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি, আমি আপনার গানের খুব ভক্ত।

হাত ধরতে দিয়েছ, যদি আমি এবার তোমার কোমর জড়িয়ে ধরি? তার আগে অবশ্য জানা দরকার, এতদিন পর আমার পুরুষের স্পর্শে তোমার গা গুলিয়ে উঠছে না তো? আমার যত দোষই থাক, আমি এ পর্যন্ত কোনো মেয়ের ওপর জোর করিনি—

না, সে দিনও ঠিক গা গুলিয়ে ওঠেনি, বরং উলটোটাই, সমস্ত শরীরটা ঝনঝন করে উঠল।

এরপর আর অনেকক্ষণ কোনো কথা নয়।

চুম্বকের টানের মতন এগিয়ে এল দুজনের ঠোঁট। সুদীর্ঘ চুম্বনের সময় রান্নাঘরে গরমজল ফুটে কেটলিতে বেজে উঠল হুইশল। অনসূয়া তা শুনতে পেয়ে নিজেকে ছাড়াতে গেলেও সত্যব্রত ছাড়লেন না।

এরপর যা ঘটল, তাকে ঠিক যুদ্ধ বলা চলে না। বরং দুজন বুভুক্ষু মানুষের

কাড়াকাড়ি করে অমৃতপানের মতন। যে অমৃত রয়েছে দুজনেরই শরীরে।

প্রায় দু বছর কোনো পুরুষের সংসর্গ হয়নি অনসূয়ার, সত্যব্রতর ঠিক অতদিন না হলেও মাস ছয়েক তো হবেই, সুতরাং দুজনে অবশ্যই বুভুক্ষু।

মেঝেতে কার্পেটের ওপর হারমোনিয়ামটা সরিয়ে দুজনের শয়ান শরীর। মৃদুকণ্ঠে গল্প।

ইংল্যান্ডেই বিয়ে হয়েছিল অনসূয়ার। মাত্র তিন বছরের বিবাহিতজীবন। তার স্বামী গুজরাতি, খুব গুণী মানুষ, কিন্তু রুচির মিল হয়নি একেবারেই। বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর একেবারেই সহ্য নয়। বিচ্ছেদ হয়েছিল খানিকটা তিক্ততার মধ্যে। অনসূয়া নিজেও চাকরি করত, ইচ্ছে করলে আলাদা থাকতে পারত, কিন্তু ও দেশে তার আর মন টেকেনি।

দু ঘণ্টা পরে আবার মিলন হল ওদের।

এবার ঠিক পারস্পরিক অমৃতপান নয়, যেন দুজনের নিভৃত সাঁতার। সব সুতো থেকে মুক্ত শরীর, এ সাঁতার সহজে শেষ হতে চায় না।

অনসূয়ার দিদি ফিরে আসতে পারেন যে-কোনো সময়ে, সে সম্পর্কে কারওরই কোনো উদ্বেগ নেই। তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারিকে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য যেতে হয় সন্ধের পর, সেটা তাঁদের ডিউটির মধ্যেই পড়ে।

তিনি ফিরলেন রাত নটা বেজে দশে। ততক্ষণে সত্যব্রতর দিল্লির প্লেন ছেড়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি ভবনে গান গাইবার আমন্ত্রণের কথাও তিনি ভুলে গেছেন।

এর মধ্যে ফোন বেজেছে তিনবার, অনসূয়া ধরেনি।

রুচিরা যখন ফিরলেন, তার আগে দুজনে অবশ্য পোশাক পরে নিয়েছে। যে-কফি সত্যব্রতর দুপুর তিনটেয় পান করার কথা ছিল, সেই কফি তিনি পান করছেন তখন।

রুচিরা সত্যব্রতকে দেখে খুব খুশি।

রুচিরা মেয়েটিও অন্য ধরনের। সাধারণ কথাবার্তার যে ধার ধারে না। প্রথম একটুখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশের পরই সে বলল, আপনাকে এত কাছে পেয়েছি, এখন ছাড়ছি না। একটা ব্যাপার জেনে নিতেই হবে। আপনি "আমায় ব'লো না গাইতে ব'লো না" গানটা জানেন নিশ্চয়ই?

সত্যব্রত বললেন, তা জানি।

রুচিরা বলল, সিন্ধু, কাওয়ালি তাই তো? কিন্তু এই যে জায়গাটা, শুধু হাসিখেলা প্রণয়ের মেলা, এখানে মেলাটা একেবারে অন্যরকম, তাই না?

হ্যাঁ, অন্যরকম।

দুবার দুরকম? একটু প্লিজ গেয়ে শোনান। আমার কিছুতেই হচ্ছে না।

সত্যব্রতকে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতে হল। তারপর কেটে গেল আরও এক ঘণ্টা।

এরপর, চার বছর ধরে চলেছে অনসূয়ার সঙ্গে সত্যব্রতর গোপন সম্পর্ক।

প্রথম দিন তো বটেই, তার পরেও বেশ কয়েকটা দিন এই সম্পর্ক ছিল শুধুই শারীরিক। সম্ভোগের টান। প্রেম-ভালবাসার প্রশ্নই ছিল না।

আস্তে আস্তে একটা নতুন ঝরনার জন্মের মতন দেখা দিল প্রেম। পরস্পরকে জানার চেষ্টা। দুজনের বয়েসের তফাত একুশ বছর। সুতরাং সত্যব্রতর দিক থেকে শুধু প্রেম নয়, অনেকটা স্নেহও বটে।

অনসূয়া কিছুই চায় না, তবু সত্যব্রত তাকে কিছু দিতে চান। অনসূয়া স্বাবলম্বী, এর মধ্যে সে চাকরি পেয়েছে একটা ব্যাঙ্কে। সে দিক থেকে সাহায্য করার কোনো প্রশ্ন নেই, সত্যব্রত তাকে দীক্ষা দিলেন গানের জগতে। শুধু গান শেখানো নয়, তা তো অনেকেই পারে, সত্যব্রত তাকে দিলেন মন্ত্রগুপ্তি, তার কণ্ঠস্বর অনুযায়ী গায়কি, শেখালেন ফলসেটোর ব্যবহার।

রুচিরা বাইরে গাইতে চায় না, অনসূয়াকে সত্যব্রত বার বার বুঝিয়ে ভয় ভাঙালেন, কয়েকটা অনুষ্ঠানে গান গেয়েই অনসূয়া অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটা সিডি বেরুল তার, সত্যব্রতই ব্যবস্থা করে দিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ আড়াল থেকে, অনসূয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলেন না কারওকে।

বছর খানেক কাটল প্রবল উন্মাদনায়। তারপর সম্ভোগ ও ভালোবাসার পাশে জায়গা করে নিল অপরাধবোধ।

এ শুধু নৈতিকতা নয়। নিজের স্ত্রীকে সত্যিকারের ভালোবাসেন সত্যব্রত। তাকে তিনি কোনো ক্রমেই আঘাত দিতে চান না। যদি অনসূয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা জানাজানি হয়ে যায়, বিদিশা চ্যাঁচামেচি করবেন না, প্রকাশ্যে কান্নাকাটিও করবেন না, কোনোরকম নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টি করার বদলে স্বামীকে মুক্তি দিয়ে দেবেন। সে মুক্তিও নিতে পারবেন না সত্যব্রত। কোনো মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হলে তার জীবনটাই বিষিয়ে যায়।

অন্য দিক দিয়েও অপরাধবোধ আছে। প্রথম দিকেই তিনি অনসূয়াকে বলে দিয়েছেন, আমি তোমায় বিয়ে করতে পারব না, প্রকাশ্যে স্বীকৃতিও দিতে পারব না।

অনসূয়া বলেছিল, আমি ও সব কিছু চাই না।

কিন্তু এ তো কথার কথা! এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কী? এখনও তার বয়েস বেশি নয়। রূপ আছে, শিক্ষাদীক্ষা আছে, সে ইচ্ছে করলে কাউকে বিয়ে করতেই পারে। বিয়ে করতে যদি না চায়, তবু একজন জীবনসঙ্গী তো দরকার। সত্যব্রত তাকে আঁকড়ে থাকলে অন্য কোনো পুরুষ তার কাছে ঘেঁষবার সাহস করবে না। এটা কি সত্যব্রতর স্বার্থপরতা নয়!

এই অপরাধবোধ মনে এলে যৌন টানও কিছুটা কমে আসে।

একবার জামশেদপুরে তিনদিনের এক উৎসবে সত্যব্রত আর অনসূয়া দুজনেই আমন্ত্রণ পেলেন।

তার কয়েকদিন আগে, সম্ভোগপর্ব সারবার পর, পাশাপাশি দুজনে শুয়ে, সত্যব্রত বললেন, জামশেদপুরে দুজনের যাওয়া হবে না। এটা সম্ভব নয়।

অনসূয়া সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, কেন, সম্ভব নয় কেন? আমরা আলাদা আলাদা যাব। আরও তো কয়েকজন যাচ্ছে!

সত্যব্রত বললেন, তা হোক, সেখানে গিয়ে আমি তোমার সঙ্গে অচেনার মতন ব্যবহার করব, এ তো হিপোক্রিসি, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ওখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে আমি কথা না বললেই তো হল!

যাঃ, তা হয় নাকি? কথা না বলাটাও তো অস্বাভাবিক। আর তা ছাড়া, ওখানে অন্য কোনো মেয়ে যদি আমার সঙ্গে ন্যাকামি করতে আসে, তুমি সেটা সহ্য করতে পারবে?

ওতে আমার কিছু যায় আসে না।

ওখানে কোনো পুরুষ যদি তোমার পাশে এসে ঘোরে, সেটাও তো আমি সহ্য করতে পারব না। আমার ইগো যে বেশি বেশি। নাঃ, জামশেদপুরে তুমিই যাও বরং, আমি যাচ্ছি না।

তা হলে আমিও যাব না।

না, না, তোমার যাওয়া দরকার। আমি তো এরকম ফাংশানে কত গেছি, এখন তোমার মিস করা উচিত নয়। তোমার বেশ নাম হচ্ছে।

আমার নাম চাই না।

পাগলামি কোরো না। তুমি অবশ্যই যাবে।

কিছুতেই যাব না আমি!

এই নিয়ে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি। তারপর একটুখানি কেঁদে ফেলল অনসূয়া।

তখনই মন ঠিক করে ফেললেন সত্যব্রত।

নরম গলায় বললেন, একটু চেঁচিয়ে বলে ফেলেছি। ক্ষমা করে দাও আমাকে। তোমার যেটা ভালো লাগে, তাই করবে। আমি আর কখনও বাধা দেব না। ইন ফ্যাক্ট, আমাদের সম্পর্কটা এখানে শেষ হওয়াই ভালো। আমাদের আর দেখা হবে না। নো হার্ড ফিলিংস। আমি সব সময়েই চাইব, তোমার ভালো হোক। তোমার কোনো ভালো বন্ধু হোক। আমি বিদিশার কাছে ফিরে যাব। তুমি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছ, সে সব ঋণ কখনও শোধ করা যায় না। আই শুড নট সে এনিথিং এলস। গুড বাই, অনসূয়া।

অনসূয়া শুধু এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল, কোনো কথা বলেনি।

এরপর সত্যিই এক বছরের বেশি দুজনের আর মুখ দেখাদেখিও হয়নি। খুব সাবধানে এড়িয়ে গেছেন সত্যব্রত। দুজনের নাম জড়িয়ে কোনো গুজব বাজারে ছড়ায়নি। সত্যব্রত বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে ইয়ারকি-ঠাট্টা, মেলামেশা চালাতে লাগলেন, তবে কারওর সঙ্গেই গভীর সম্পর্ক নয়। তাঁর একটা হ্যাপি গো লকি ইমেজ তৈরি হয়ে গেল। মদ্যপানেও তিনি এখন অনেক সংযত।

তিন

ঠিক যেমন সেই এক সময় প্রথম দিন দেখা হওয়ার পর খুব ঘন ঘন দেখা হতে শুরু হয়েছিল অনসূয়ার সঙ্গে, এখন আবার সেইরকম।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। অনসূয়া যে তাঁর জগৎ থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তা তো নয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে দু-চারটে। সে এক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত গায়কের সঙ্গে একজন নবীন শিল্পীর সাধারণ সৌজন্যের কথা। অনসূয়ার সঙ্গে তখন প্রতিবারে নির্দিষ্ট কোনো সঙ্গী থাকত না।

এখন ঘন ঘন দেখা হচ্ছে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে, প্রত্যেকবারই অনসূয়ার পাশে ওই এক ব্যক্তি। যিনি কার্ল মার্ক্স, মুখে চুরুট।

লোকটির পরিচয় জানতে বেশিদিন লাগে না। কৃষ্ণরূপ সেন, ছবি আঁকার জন্য তাঁর বেশ নাম। কৃষ্ণরূপ থাকেন ভিয়েনায়, প্রায়ই যাতায়াত করেন এই দেশে, এখানে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। অনেকটা শক্তি বর্মনের মতনই খ্যাতি।

সত্যব্রতর ছবির জগতের সঙ্গে তেমন পরিচিত নন। শান্তিনিকেতনের দু-চারজন শিল্পীকে চেনেন। কৃষ্ণরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি খুশিই হলেন। অনসূয়া কোনো সাধারণ মানুষ, কিংবা ব্যবসায়ী-ট্যাবসায়ীর শরীরকে মূল্য দেয়। শরীরকে শরীরের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশের জাতীয়তা দিবসে বিরাট পার্টি, সেখানে গান গাইলেন সত্যব্রত। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল সব গানই গাইতে পারেন, তাই তাঁর খুব সমাদর। নরুলগীতিও গাইলেন চারখানা। খুবই সংবর্ধনা পেলেন সত্যব্রত।

তারপর মদ্যপানের আসরে অনসূয়া আর তার সঙ্গী কৃষ্ণরূপের সঙ্গে কথা হল অনেকক্ষণ। চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ। সত্যব্রত মনে মনে স্বীকার করলেন, অনসূয়া তার যোগ্য একজন সঙ্গীকেই পেয়েছে, যে একজন শিল্পী তো বটেই, মানুষ হিসেবেও বেশ ভদ্র ও আকর্ষণীয়।

সত্যব্রতর তো খুশি হওয়ারই কথা। তিনি তো অনসূয়ার এরকম একজন সঙ্গীই চেয়েছিলেন। ওরা পরস্পরের দিকে এমনভাবে তাকায়, যাতে বোঝা যায় যে দুজনের মনের গভীর মিল হয়েছে। বাঃ, খুব ভালো কথা।

ক্যালকাটা ক্লাবের একটা পার্টি থেকে বাড়ি ফিরছেন সত্যব্রত। ড্রাইভারকে বললেন, এই গাড়ি ঘোরা তো। আমি এখন একবার গঙ্গার ধারে যাব।

নিত্যানন্দ বিস্মিত হয়ে বললেন, গঙ্গার ধারে! এখন? সেখানে কী আছে? ফ্লোটেল বলে রেস্টুরেন্টটা তো চালু হয়নি, সামনের শনিবার।

সত্যব্রত ধমক দিয়ে বললেন, তুই চল তো!

হ্যাঁ। ফ্লোটেল নামে একটা ভাসমান রেস্তরাঁ চালু হবে, সেখানে সত্যব্রতর গান গাইবার কথা আছে। কিন্তু সে তো দু দিন পরে। নিত্যানন্দ ঠিকই জানে।

গাড়ি যখন সেখানে পৌঁছল, তখন চতুর্দিকে অন্ধকার।

গাড়িতে মাঝে মাঝে কোনো ভক্ত মেয়েকে তুলে এনে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে আসেন সত্যব্রত। দেড় মাস আগেও একজন এসেছিল। বাংলাদেশের গায়িকা কুলসম।

প্রীতিময়ের বাড়িতে অনসূয়া আর কৃষ্ণরূপকে দেখবার পর, বারবার ওদের

সেই অন্ধকার থেকে আলোর বৃত্তে আসবার ছবিটা মনে পড়ছিল সত্যব্রতর। সেই ছবিটা মুছে দেওয়ার জন্য তিনি অন্য মেয়েদের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। কুলসম প্রায় তৈরি। তার সঙ্গে একটা অ্যাফেয়ার তো করাই যায়।

কিন্তু সত্যব্রতর বুক জ্বলছে, ঈর্ষায়।

একটাই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে সত্যব্রতর মনে, ওই কৃষ্ণরূপ কি সত্যব্রতর চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় অনসূয়ার কাছে? এটা পৌরুষের তীব্র অভিমান।

গাড়ি থেকে নেমে অন্ধকার গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে সত্যব্রতর ভাবতে লাগলেন, আমি কেন এই জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি? আমি তো মুক্তি দিয়েছি অনসূয়াকে। আমি চেয়েছি তার একজন উপযুক্ত সঙ্গী হোক। অনসূয়ার যথেষ্ট বুদ্ধি ভাষ্য আছে, সে নিশ্চয়ই বুঝেসুঝেই এ ছবি আঁকিয়েটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। সে লোকটাও প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিচ্ছে তাকে। এতে তো সত্যব্রতর খুশি হওয়ারই কথা।

কেন তবু বুক জ্বলছে?

সত্যব্রতর অস্তিত্বের মধ্যে পক্ষে ও বিপক্ষে নানারকম যুক্তি তর্ক চলতে লাগল অন্ধকার গঙ্গা নদীর দিকে তাকিয়ে। তার মনের শুভবোধ বলছে, ভুলে যাও, অনসূয়ার কথা ভুলে যাও! তার ভালোর জন্য, আর তোমার ভালোর জন্য, আর তাকে নিয়ে টানাটানি কোরো না।

কিন্তু অহং কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না।

হঠাৎ সত্যব্রতর মনে হল, আমি যদি অনসূয়াকে বলি, আমি তোমাকেই চাই। তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। তা হলে কি সে আমার কাছে আবার ফিরে আসবে না? ওই লোকটাকে ছেড়ে?

এটা তাঁর খুবই জানা দরকার। যেন এটা জীবন মরণের প্রশ্ন।

তিন বছর কোনো যোগাযোগ নেই। তবু মোবাইল নাম্বারটা মুখস্ত আছে। তিনি সেই নাম্বারে ডাকলেন।

এখন রাত পৌনে এগারোটা। মোবাইল ফোনে কে কোথায় থাকে, তা জানা যায় না।

সাড়া দিয়ে অনসূয়া বলল, কে?

সত্যব্রত বললেন, আমি তোমার যম।

এর মধ্যে গাড়ি থেকে একটা হুইস্কির পাইট নিয়ে কাঁচা খানিকটা চুমুক

দিয়েছেন সত্যব্রত। মাথার চুল খাড়া, কণ্ঠস্বর উগ্র।

যম কথাটা শুনে একটু হাসল অনসূয়া। তারপর বলল, আপনি কোথায় সত্যদা?

সত্যময় বললেন, তুমি কোথায়, তা তো আমি জানতে চাইনি। ধরো, আমি আছি মহাশূন্যে। এরকম সময় তোমাকে ফোন করা উচিত হয়নি। তাই না?

আমরা কি আগে কখনও উচিত অনুচিতের কথা ভেবেছি?

তা ভাবিনি। কিন্তু এখন অনেক কিছুই বদলে গেছে। সত্যি কথা বলছি অনসূয়া, আমার ভয় করছে। আমি হঠাৎ তোমাকে ফোন করেছি, একটাই প্রশ্নই করার ছিল তোমাকে। কিন্তু এখন ভাবছি, না, না, ভুল করেছি, আমি সহ্য করতে পারব না।

ভুলের কী আছে? আপনি ফোন করলেন, কী বলবেন, সত্যদা?

কিচ্ছু না।

তিনি ফোন কেটে দিলেন।

দু-এক মুহূর্ত বাদে আবার ফোন বেজে উঠল। সত্যব্রত ধরলেন না। আবার ফোন। আবার কেটে দেওয়া। সত্যব্রত যেন নিজের মুখোমুখি। এ কী সাঙ্ঘাতিক ভুল করতে যাচ্ছিলেন তিনি!

অনসূয়াকে ফিরে আসার জন্য জোর করলে, যদি কৃষ্ণরূপকে ছেড়ে আসতে রাজি না হত সে, সেই অপমান কি সত্যব্রত সহ্য করতে পারতেন?

আর অনসূয়া যদি রাজি হত? আবার সে ফিরে আসতে চাইত, তা হলে কি তাকে গ্রহণ করতে পারতেন সত্যব্রত? তা হলে একসময় ছেড়ে এসেছিলেন কেন?

বার বার ফোন বাজছে, প্রত্যেকবার কেটে দিচ্ছেন সত্যব্রত। অনসূয়ার উত্তরটা তিনি জানতে চান না।

পাঁইটটা চুমুক দিচ্ছেন আর কাঁদছেন তিনি। একা একা। তেজি, জবরদস্ত, ভোগী পুরুষ সত্যব্রতকে কেউ কখনও কাঁদতে দেখেনি।

শেষ হয়ে যাওয়া বোতলটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সত্যব্রত ফিসফিসিয়ে বললেন, অনসূয়া, এবার ফাইনাল, আর কখনও ডাকব না। ইউ বি হ্যাপি, তোমার জীবনে আমি কেউ না, প্লিজ প্লিজ।

রুমাল দিয়ে তিনি চোখ মুখ মুছলেন। স্বাভাবিকভাবে গাড়িতে ফিরে এসে

ড্রাইভারকে বললেন, চল রে, বাড়ি চল। রাস্তায় এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিস।

বিদিশা এই সময় টিভি দেখে। বেশি রাত্রে হিস্ট্রি চ্যানেলে ভালো ছবি থাকে।

যত রাতই হোক, সত্যব্রত বাড়ি ফিরে বিদিশার ঘরে এসে দু-চারটে কথা বলেন। বিদিশাও কোনো দিন জিজ্ঞেস করে না, কেন এত দেরি হল!

একটা চেয়ার টেনে বিদিশার পাশে বসে সত্যব্রত জিজ্ঞেস করলেন, কী দেখছ?

বিদিশা বলল, সেন্ট পিটারের জীবনী। তুমি খেয়ে এসেছ? নাকি কিছু খাবে? রেণুকে বলব কিছু খাবার গরম করে দিতে?

সত্যব্রত বললেন, বিদিশা, আমি যদি কোনো রাত্তিরে আর বাড়িতে ফিরে না আসি, কোনো অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাই, তা হলেও তুমি সারা রাত বসে এরকম টিভির সিনেমা দেখা যাবে!

পাশ ফিরে স্বামীর দিকে গাঢ় চোখ মেলে বিদিশা বলল, আর ও রকম কথা বোলো না। আমি জানি, তুমি ঠিক আমার কাছে ফিরে আসবে। সেইজন্যই তো আমি জেগে বসে থাকি।

বিদিশার কাঁধে একটা হাত রেখে সত্যব্রত বললেন, খুকু, চল, আমরা কিছুদিনের জন্য কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি। অনেকদিন তুমি বাড়িতে বসে আছ।

বিদিশা বলল, চোখ বোজো, আলো নিভিয়ে দাও তারপর আমরা কত বেড়াবার গল্প করতে পারব। তোমার এত ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে কেন গো। তুমি কি কোনো কারণে খুব উত্তেজিত হয়ে আছ?

সত্যব্রত বললেন, হয়তো তাই। আমার মনের মধ্যে নানারকম ওঠাপড়া চলছে, এক্ষুনি তোমাকে বলতে পারছি না। পরে এক সময় বলব।

বিদিশা বলল, তোমার বাইরের জীবনে এরকম তো হতেই পারে। কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনে...আমাদের মেয়ে রুমুলার কথা আজ কি একবারও ভেবেছ? সে কি দারুণ সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে?

সে আসবে ঠিক করেছিল। আসছে না?

আসতে পারে। তার আগে আমাদের মতামত জানতে চেয়েছে। ও কিছু গোপন করতে চায় না। কিছুতেই মিথ্যে কথা বলতে চায় না।

খুকু, তুমি মেনে নিতে পারবে?

এখনও ঠিক নিজের মনটাই বুঝতে পারি না। যুক্তি দিয়ে মনে হয়, আমাদের আপত্তি করার কী আছে, এটা ওর জীবন। কিন্তু চোখের সামনে যদি দেখি..

যুক্তি দিয়ে অনেক সময়ই আবেগকে চাপা দেওয়া যায় না।

দুজনেই চুপ করে রইলেন একটুক্ষণ। দুজনে একই কথা ভাবছেন।

সেই চা-বাগানে প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটি করত দুই কিশোরী।

একইরকম চেহারা, গলার আওয়াজও এক। সব সময় ঝলমল করত মুখ। তাদের মধ্যে একজন আর নেই। অন্যজন কৈশোর ছাড়িয়ে পূর্ণ যুবতী হয়েছে, বিদেশে নাম করেছে ভালো ছাত্রী হিসেবে।

কিন্তু যমজ বোনের মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকেই লক্ষ করা গিয়েছিল, রুমুলা কোনো ছেলের সঙ্গে মিশতে চায় না। ছেলেদের সঙ্গে পারতপক্ষে কথাও বলতে চায় না। শুধু অন্য মেয়েদের সঙ্গেই সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

প্রথম প্রথম মনে হত, সে বুঝি অন্য মেয়েদের মধ্যে নিজের বোনকেই খোঁজে। কিন্তু যৌবনে যৌনজীবনেরও তো একটা প্রশ্ন আসে। এখন বোঝা যাচ্ছে, পুরুষদের প্রতি তার শরীরেরও কোনো আকর্ষণ নেই। সে কোনো না কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। এমনকী দরজা বন্ধ করে দেয়।

এখন সে জানিয়েই দিয়েছে, অলকা গোয়েলকর নামে একটি মহারাষ্ট্রীয় মেয়ের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতন থাকতে শুরু করেছে বার্লিনে। একবার তারা কলকাতায় আসতে চায়। অলকাকে নিয়ে এ বাড়িতে উঠলে কি মা-বাবার আপত্তি আছে? যদি থাকে, তা হলে সে হোটেলেও উঠতে পারে।

একমাত্র মেয়ে, সে এসে উঠবে হোটেলে?

এ বাড়িতে এলে, কিছু আত্মীয়স্বজন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তো দেখা করতে আসবে। তাদের কাছে রুমুলা কিছু লুকোবে না। মাসি-পিসিদের কেউ না কেউ তার বিয়ের প্রশ্ন তুলবেই, সে তাদের মুখের ওপর বলে দেবে...।

শুধু মেয়ের কথা ভাবতে লাগলেন দুজনে। পাশাপাশি বসে রইলেন দুজন দুঃখী মানুষের মতন।

ভাঙা সেতু

এখন চিতলমারিতে নৌকো ছাড়া যাতায়াতের অন্য কোনো উপায় নেই। রাস্তা একটা আছে বটে, বাসও চলাচল করত, কিন্তু গত বর্ষায় আকস্মিক বন্যার সময় কেলেঘাই নদীর ওপর সেতুটা কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ একদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ভাগ্যিস সে সময় ওখানে বাসটা কিংবা অন্য গাড়ি-টাড়ি ছিল না, তাহলে কত মানুষের প্রাণ যেত কে জানে! সে সব ছিল না, শুধু গনি মিস্তিরির ছোট ছেলে মানকু একটা ছাগল নিয়ে ওদিক থেকে এদিকে আসছিল, আচমকা ওই কাণ্ড হওয়ায় ছাগলসুদ্ধু সে পড়ে গেল জলে, ওদিকের পাড়ে দাঁড়িয়ে কয়েকজন তা দেখেওছে।

মানকুকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনজন ডুবুরি অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিল। ছাগলটা কিন্তু উদ্ধার হয়েছে, গনি মিস্তিরির বাড়ির উঠোনে সেটা খুঁটিতে বাঁধা থাকে, সেটাকে আর বিক্রি করা হবে না।

ভাঙা সেতুটাকে এখন অদ্ভুত দেখায়। ওপাশ থেকে অনেকখানি ঠিকঠাক আছে, এপাশ থেকেও খানিকটা, মাঝখানটায় ফাঁক, প্রায় দশ ফুট। এমনও নয় যে এদিক থেকে ওদিক লাফিয়ে পার হওয়া যাবে।

এই সেতু সারানো হবে কবে?

বাপ-দাদার আমলে এখানে ছিল বাঁশের সাঁকো। দু'দিকের রাস্তাও ছিল কাঁচা। গাড়ি-ঘোড়া চলত না। সুরকি দিয়ে রাস্তা পাকা করার পর পাকা সেতুর

দাবিও উঠেছিল। অনেক আবেদন-নিবেদন, মিছিল হবার পর সেই সেতু তৈরি হতে সময় লেগেছিল দশটি বছর।

যে-সেতু তৈরি হতে দশ বছর লাগে, সেই সেতু আবার মেরামত করতে কত বছর লাগবে? আবার আবেদন-নিবেদন, মিছিল, পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও। দেখলে মনে হয়, দু'দিকে তো ঠিকই আছে। মাঝখানের ওই জায়গাটুকু ভরাট করতে তো খুব বেশি টাকা লাগার কথা নয়। কিন্তু চোখে দেখাটাই ঠিক দেখা হয় না সব সময়। সেতুতে এমনভাবে জোড়াতালি দেওয়া যায় না। কারুর মাজা ভেঙে গেলে হাত আর পায়েরও জোর চলে যায়। ইঞ্জিনিয়াররা এসে দেখে শুনে মতামত দিয়ে গেছেন, মাঝখানটা ভেঙে পড়ায় দু'দিকের খুঁটিগুলোও দুর্বল হয়ে গেছে, এখন পুরোটা ভেঙে ফেলে আবার নতুন করে বানাতে হবে।

আবার নতুন সেতু? তা এখন গভীর জলে।

মনিরুদ্দির খেয়া চালু হয়েছে আবার। মাঝখানে বেচারার ব্যবসা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। শুধু ধানের বস্তা পারাপার করত। এখন আবার আসছে দলে দলে মানুষ, স্কুলের ছেলেমেয়ে, একটু দেরি হলেই চ্যাঁচামেচি করে তারা। নৌকো এখন দুটো।

এটা অবশ্য ভাঙা সেতু কিংবা খেয়া নৌকোর গল্প নয়, মানুষের গল্প।

একদিন বিকেলে চিতলমারির খেয়াঘাটে নৌকো থেকে নামল একজন নতুন মানুষ।

আশেপাশের কয়েকখানা গ্রামের মানুষের প্রায় সকলেরই মুখ চেনা। কিংবা চেনা না হলেও স্থানীয় না বাইরে থেকে এসেছে, তা দেখলেই বোঝা যায়।

এই মানুষটি এদিককার নয়। বেশ হৃষ্টপুষ্ট যুবক, ধপধপে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর একটা জহর কোট পরা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। একটা বেশ ঝকঝকে লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরায়, নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। সে নাকের নীচে পুরুষ্টু গোঁফ। কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ।

নদী পেরুবার সময় সে অন্য কোনো যাত্রীর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। আজকাল গ্রামের লোকও চট করে কৌতূহল প্রকাশ করে না, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি তাকে।

নৌকো একেবারে ঘাটে ভেড়াবার পর মনিরুদ্দি জিজ্ঞেস করল, চিতলমারিতে যাবেন?

যুবকটি বলল, হ্যাঁ, এখানেই। ওই তো শিবমন্দিরটা দেখা যাচ্ছে—

চেহারার তুলনায় গলার আওয়াজটা সরু, উচ্চারণ একেবারে শহুরে।

অন্য অনেক যাত্রী উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে, আরও কিছু শোনার জন্য। কিন্তু সেই আগন্তুক আর বাক্যব্যয় না করে পকেট থেকে মানি-ব্যাগ বের করে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল।

তারপর এমনভাবে শিবমন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল, যেন এই গ্রামের পথ-ঘাট সব তার চেনা।

শিবমন্দিরটার কাছে গিয়ে সে থেমে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাছেই একজন লুঙ্গি পরা, গামছা-কাঁধে মানুষকে দেখে জিজ্ঞেস করল, ওহে কর্তা, ওই যে দুটো তালগাছের পাশে একটা টালির বাড়ি, ওইটা রাঘব দাসের বাড়ি নয়?

গামছা-কাঁধে মানুষটি মুখে কিছু না বলে দু'বার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

যুবকটি এগিয়ে গেল সেদিকে।

কোনো কারণ নেই, তবু গামছাকাঁধে মানুষটি গেল তার পিছু পিছু।

একটা তালগাছের ডগায় বসে আছে দুটো শঁচবক, নতুন মানুষ দেখে তারা ফরসা ডানা মেলে উড়ে গেল। একটা রোগা নেড়ি কুকুর একবার শুধু ভেউ করল, কিন্তু কাছে এল না।

যুবকটি গলা খাঁকারি দিল।

ডুরে শাড়ি পরা এক মাঝবয়েসি মহিলা বাড়ির ভেতর থেকে যুবকটিকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

যুবকটি শহুরে কায়দায় হাত জোড় করে বলল, নমস্কার, এটা কি রাঘব দাস মশাইয়ের বাড়ি? তিনি আছেন?

মহিলাটি মাথা নেড়ে বললেন, না, বাড়িতে নাই।

যুবকটি বলল, আমার নাম বিজয় সরকার। আমি অন্নপূর্ণার সঙ্গে এক অফিসে কাজ করি। আপনি বুঝি অন্নপূর্ণার মা?

মহিলাটি আপত্তি না করায় যুবকটি এগিয়ে এসে সেই মহিলার হাজা ধরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল এবার।

আজকাল অচেনা মানুষ দেখলেই কেমন যেন ভয় ভয় করে। কী উদ্দেশ্যে এসেছে কে জানে। তবে কেউ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে তার সম্পর্কে আশঙ্কা কিছুটা কমে যায়।

গরিব ঘরের মেয়ে হয়েও অন্নপূর্ণার লেখাপড়ায় মাথা আছে। রূপের অভাব কিছুটা পূরণ হয়েছে শিক্ষায়। মাধবপুর হাইস্কুল থেকে সে মাধ্যমিক পাশ করেছে। তারপর মহকুমা শহরে গিয়ে সে সমবায় ব্যাঙ্কে একটা চাকরিও জুটিয়ে ফেলেছে।

চিতলমারি গ্রামের আর কোনো মেয়ে এর আগে শহরে চাকরি করতে যায়নি। সেখানে অন্নপূর্ণা একটা উকিল বাড়িতে থাকার জায়গাও পেয়েছে, দুটি শিশুকে পড়াবার বিনিময়ে।

কিন্তু অফিসের কোনো পুরুষ সহকর্মী গ্রামে এসে একজন মেয়ের খোঁজখবর নিতে আসা অস্বাভাবিক নয়? কিছু গণ্ডগোল হয়েছে অফিসে? অন্নপূর্ণ কিসের যেন ছুটিতে দিন দশ-বারো রয়েছে বাড়িতে।

অমঙ্গলের ভয় ফুটে উঠল অন্নপূর্ণার মা লক্ষ্মীমণির মুখে-চোখে। তিনি বললেন, ওকে ডাকছি, কিছু হয়েছে?

বিজয় বলল, না, না, কিছু ব্যাপার নয়। আমি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, নিরুল্লার খামারে আমার একটা কাজ আছে, তাই ভাবলাম, আপনাদের গ্রামটা দেখে যাই।

অন্নপূর্ণা ছুটে এল রান্নাঘর থেকে, একেবারেই আটপৌরে আধময়লা শাড়ি পরা, হলুদের দাগ সমেত। যুবকটিকে দেখে তার মায়ের চেয়েও বেশি বিস্ময় আর আশঙ্কা ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে।

সে প্রথমে কথাই বলতে পারল না।

যুবকটি সহাস্যে বলল, কী রে, আমাকে চিনতে পারছিস না নাকি? আমি বিজয়, বিজয়, বিজয়দা! তোদের গ্রাম দেখতে এলাম। তাছাড়া, তোর কিছু টি-এ পাওনা ছিল অফিসে, সেটাও নিয়ে এসেছি।

ঝোলা ব্যাগ থেকে সে একটা মুখখোলা সরু খাকি খাম বার করল, তার থেকে বেরিয়ে আছে গোটাকতক পঞ্চাশ টাকার নোট।

গামছা-কাঁধে লোকটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে অদূরে, তার মুখটা একটু হাঁ করা। সে এখুনি সারা গ্রামে এই আগন্তুকের কথা ছাড়বে, তা বোঝাই যায়।

লক্ষ্মীমণি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, লেখন, তুমি যাবার পথে অন্নর বাবাকে একটু খবর দিয়ে যাবে, যেন তাড়াতাড়ি বাড়ি আসে।

তারপর অন্নপূর্ণাকে বললেন, ওনাকে ঘরে নিয়ে বসা। হাত-মুখ ধোবার জল দে, অতিথি এসেছেন—

গ্রাম্য পরিবার হিসেবে এ বাড়িতে লোকসংখ্যা যথেষ্ট কম।

লক্ষ্মীমণির তিনটি সন্তানের মধ্যে মধ্যমটি অকাল মৃত। বড় মেয়ে বিয়ের পর পরই বিধবা। কিন্তু সে বাপের বাড়ি ফিরে আসেনি, স্বামী-শ্বশুরের ভিটে সামলাচ্ছে। আর আছেন এক পিসশাশুড়ি, তিনি সম্পর্কে শাশুড়ি হলেও লক্ষ্মীমণির থেকে বয়েসে ছোট, তাঁর একটি মাত্র ছেলে সুধন্য।

চাকরি করা মেয়ে বলে অন্নপূর্ণার নিজস্ব ঘর আছে। সেই ঘরে সে বসাল অতিথিকে।

মা চোখের ও শ্রুতির আড়াল হতেই সে প্রায় কান্না গলায় বলল, এ কী করেছেন আপনি? এভাবে কেউ আসে?

বিজয় হাসিমুখে বলল, কেন, কী হয়েছে? চলে এলাম তোদের গ্রাম দেখতে। তোকেও কতদিন দেখিনি!

অন্নপূর্ণা বলল, তা বলে এরকম ফুলবাবু সেজে? ফিনফিনে পাঞ্জাবি, ধুতি!

বিজয় বলল, এমনই একটু সাজতে ইচ্ছে হল। হ্যাঁরে, রাত্তিরে থাকতে দিবি তো?

ভুরু অনেকখানি তুলে অন্নপূর্ণা বলল, তা হয় নাকি? সবাই কী বলবে!

বিজয় বলল, গ্রামের মানুষের বাড়িতে অতিথি আসে না? গ্রামের মানুষ কি অতিথি সেবা করতে ভুলে গেছে?

অন্নপূর্ণা বলল, তা বলে এইভাবে? কেউ যদি বুঝে ফেলে? না, না, না, আমার বাবা...

কেউ কিছু বুঝবে না। তুই সাবধানে থাকবি, অন্যদের সামনে সাবধানে কথা বলবি। তোর বাবাকে আমি ম্যানেজ করব।

আমাকে আগে চিঠি লিখতে পারতেন।

তোর জন্য হঠাৎ খুব মন কেমন করল রে অন্ন। কতদিন দেখিনি, কুড়ি-একুশ দিন তো হবেই। এর মধ্যে তুই বেশ রোগা হয়ে গেছিস।

আমার চাকরিটা তো...আর হবে না, তাই না? বাড়ির সবাইকে বলেছি, ছুটিতে আছি। ক'দিন পরেই বুঝে যাবে।

ও চাকরি তোর আর হবে না। টেমপোরারি ছিল। রেকর্ড সাপ্লায়ারের পোস্টটাই উঠে গেছে। তবে তোর চিন্তা নেই, অন্ন। আমি আসানসোলে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি। সেখানে তোরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আসানসোল? সে তো অনেক দূর। থাকব কোথায়?

আমার কাছে থাকবি। আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকব।

অন্নপূর্ণার বাবা রাঘব একটা মনিহারি দোকান চালান। সেতুতে ওঠার মুখে সেই দোকান, গত বছর পর্যন্ত ভালোই চলত, মানুষজনের যাওয়া-আসার পথে। বন্যার পর ওদিক দিয়ে আর কেউ যায় না, ফেরিঘাট থেকে রাস্তাটা অন্যদিকে।

রাঘবের জমি-জিরেত বেশি নেই, যে-টুকু ছিল বন্যার সময় ভাঙনে অনেকটাই চলে গেছে নদীর গর্ভে। সরকার থেকে কিছু রিলিফ দিয়েছে, তা যৎসামান্য। এখন তো বেশ আতান্তরেই পড়েছিলেন, তবে মেয়ের চাকরির জন্য সুরাহা হয়েছে কিছুটা।

পিসির ছেলে চাঁদুকে দোকানে বসিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি চলে এলেন রাঘব। তাঁর বাড়িতে তো সহসা কোনো অতিথি আসে না।

বিজয় রাঘবেরও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, আপনাদের এই গ্রামটি বেশ শান্ত, নিরিবিলি। আমি যেখানে থাকি, সেখানে সব সময় এত হৈ-হট্টগোল।

এই যুবকটি তাঁর মেয়ের অফিসের একজন অফিসার শুনে রাঘব বেশ আশ্বস্ত হলেন। তিনি জানেন, অফিসারদের সব সময় খাতির করতে হয়। টুকটাক দু'চারটে কথার পর তিনি খানিকটা গদগদভাবে বললেন, স্যার, সন্ধে হয়ে এসেছে, আজ আর যাবেন কোথায়? রাত্তিরটা এখানেই থেকে যান। আমাদের গরিবের বাড়ি।

বিজয় বলল, আমাকে স্যার বলবেন না। আমি আপনার মেয়ের সহকর্মী। আপনার বাড়িতে আমি বাড়ির লোকের মতনই থাকতে পারি। এদিককার দু'একটা গ্রাম একটু ঘুরে দেখারও ইচ্ছে আছে।

অতিথিকে খাতির করার জন্য সে রাতে একটা বাড়ির মোরগ জবাই হল।

অন্নপূর্ণার ঘরটা ছেড়ে দেওয়া হল অতিথিকে, অন্নপূর্ণা চলে এলো দিদার ঘরে। সব ঘরের বাতি নিভতে রাত হল বেশ।

এরপর চারদিন কেটে গেলেও যুবকটির যাবার কোনো নামই নেই। সে কয়েকখানা গ্রাম ঘুরে দেখবে বলেছিল, তারও তো কোনো উদ্যোগ নেই, মাঝে মাঝে শুধু হাঁটি হাঁটি পা পা করে নদীর ধারে যায়, আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসে।

তারপর সারাক্ষণই ঘরের মধ্যে অন্নপূর্ণার সঙ্গে কী সব গুজুর গুজুর ফুসুর

ফুসুর করে, কে জানে! একটি সোমখ মেয়ের সঙ্গে বাইরের একটা অনাত্মীয় ছোকরা এরকমভাবে সেঁটে বসে থাকলে দৃষ্টিকটু লাগবে না?

অন্নপূর্ণা যেখানে চাকরি করে, সেখানকার একজন অফিসারকে খাতির করতেই হয়, কিন্তু কতদিন?

অন্নপূর্ণা আর বিজয় যখন ঘরের মধ্যে বসে থাকে, তখন তার মা কিংবা দিদা পাশ দিয়ে দু'একবার ঘুরে যান, ওদের কথা শোনার চেষ্টা করেন। ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে কি না, তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়। দরজা অবশ্য ওরা বন্ধ করে না, কিন্তু সারাক্ষণ কী এত কথা? এক এক সময় মনে হয়, ওরা যেন তর্কাতর্কি করছে, অন্নপূর্ণা এক এক সময় কেঁদেও ফেলছে, এসবই তো সন্দেহজনক।

আজকাল কোনো মানুষকেই সহজে বিশ্বাস করা যায় না। ইদানীং এই সব গ্রামাঞ্চল থেকে মেয়ে পাচারের কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিছুদিন আগেই তো এই চিতলমারির নন্দ সাপুইয়ের বাড়িতেই তাদের এক দূরসম্পর্কের মাসির পরিচয় দিয়ে এসে উঠেছিল মধ্যবয়েসি এক স্ত্রীলোক, দেখতে শুনতে ভদ্রবাড়িরই মনে হয়। নন্দ সাপুইয়ের মেয়ে গৌরীর বয়েস সতেরো, মাজা মাজা গায়ের রং, সামান্য ট্যারা হলেও তাকে সুশ্রীই বলতে হবে, ক্লাস ফাইভের পরে অবশ্য পড়াশুনো আর করেনি। প্রায়ই তার বিয়ের কথা হয় আর ভেঙে যায়, তার বাবার বেশি পণ দেবার সামর্থ্য নেই। ভিনদেশি সেই মাসি বলল, এ মেয়ে শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকবে কেন, নার্সিং-এর ট্রেইনিং নিয়ে তো ভালোই রোজগার করতে পারে। সে-ই ব্যবস্থা করে দেবে। সেই মাসি নিয়ে গেল গৌরীকে।

গৌরী আর ফিরে আসেনি। কয়েক মাস বাদে আঁকাবাঁকা হাতের লেখায় একটা চিঠি এসেছিল। সে চিঠি চোখের জলে ভেজা। সেই মাসি আসলে রাক্ষুসী, তাকে বিক্রি করে দিয়েছে, সে এখন আছে মুম্বাইতে একটা নোংরা জায়গায়, তাকে মারধোর করে, তাকে দিয়ে পাপ কাজ করায়।

তাই নিয়ে থানা-পুলিশ হল, হৈ চৈ চলল কয়েকদিন। শেষ পর্যন্ত মুম্বাই-এর পুলিশ জানাল, ওই ঠিকানাতেও গৌরী নেই, তাকে পাচার করে দেওয়া হয়েছে অন্য কোনোখানে।

এটা মাস চারের আগের ঘটনা। উত্তেজনা এখনো থিতোয়নি।

অন্নপূর্ণার ব্যাপার নিয়ে আবার ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেছে।

নারী-পাচারের আসল পাণ্ডা তো পুরুষরাই। তারা নানান ছদ্মবেশে আসে। এই ছোকরাটি কি সত্যি সত্যি অফিসার? অফিসাররা তো সদা ব্যস্ত, তারা শুধু শুধু গ্রামে এসে পড়ে থাকে? অন্নপূর্ণাও কী এমন অফিসে চাকরি করে, এতদিন ছুটি দেয়?

রাঘবের দোকানে এসে কেউ কেউ অযাচিতভাবে বাঁকা সুরে কথা বলতে শুরু করেছে। গ্রামদেশে এইসব বাঁকা কথাই হঠাৎ একসময় ধারালো হয়ে উঠতে পারে। বিশেষত ভৈরব মণ্ডল নামে একজন নিজেই নিজেকে এখানকার মোড়ল ঠাউরেছে, তার কথা অনেকে মানে। সে এর মধ্যেই নন্দ সাপুইকে শাসিয়ে রেখেছে যে তার মেয়ে ফিরে এলেও যেন তাকে আর ঘরে না নেওয়া হয়।

রাঘবের মনেও খটকা লেগেছে। ব্যাপার-স্যাপার ভালো মনে হচ্ছে না। এ লোকটা যায় না কেন? মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেও সে কিছু বলে না, কেমন যেন থতোমতো খায়। রাঘবের বউ আর পিসিও সন্দিগ্ধ।

এক রাত্তিরে বউয়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর রাঘব ঠিক করলেন, পরদিন সকালে এই অতিথিকে মুখ ফুটে চলে যাওয়ার কথা বলতেই হবে। নইলে গ্রামের মানুষের মুখ চাপা দেওয়া যাবে না।

পরদিন সকালে সেই ঘরের সামনে রাঘব গলা খাঁকারি দিতেই বেরিয়ে এলো বিজয়।

রাঘব শুকনো গলায় বললেন, ইয়ে সরকারবাবু, আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা আছে, যদি একটু ওদিকপানে আসেন, মানে!

বিজয় সরকার বুদ্ধিমান। রাঘবের মুখ-চোখ দেখেই সে আঁচ করেছে যে রাঘব কী বলতে চান। সে এগিয়ে গিয়ে ঝুপ করে রাঘবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, মেসোমশাই, তার আগে আপনি আমার একটা কথা শুনবেন? ক'দিন ধরে আমি অন্নপূর্ণার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছি, আমরা বিয়ে করতে চাই। আপনারা যদি আশীর্বাদ করেন...

রাঘব দাসের চক্ষু কপালে ওঠার জোগাড়। বিয়ের প্রস্তাব? তাঁর মেয়ের সঙ্গে? অন্নপূর্ণার শরীর সৌষ্ঠবহীন নয় একেবারে, কিন্তু গায়ের রং কালো। কালো মানে কিরকুট্টি কালো। নাকটাও কিছুটা চাপা। অনেক টাকা পণ দিতে না পারলে এ মেয়ের বিয়ে হওয়া দুষ্কর। হবেই না ধরে নেওয়া হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি করাই তো ভালো।

কিন্তু বিয়েই একটা নারী জীবনের চূড়ান্ত। সমাজে এর বেশি মূল্য আর

কিছুতে নেই। বিয়ে না করে কোনো মেয়ে ইচ্ছেমতো বাঁচতে পারে না, সেই অবস্থায় কোনো পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়া অতি জঘন্য অপরাধ, কঠিন শাস্তিযোগ্য। কিন্তু একবার বিয়ে হয়ে গেলে স্বামী বউকে মারুক-ধরুক, খেতে না দিক, তা নিয়ে সমাজ মাথা ঘামাবে না।

বিয়ের প্রস্তাবে সব ব্যাপারটাই বদলে গেল।

মুহূর্তে সে খবর ছড়িয়ে পড়লো পাড়ায় পাড়ায়। রাঘব ও লক্ষ্মীমণির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হল বিজয়ের। এবার বিজয় জানিয়ে দিল যে অন্নপূর্ণার আপাতত চাকরি নেই, তার পদটাই ছিল অস্থায়ী। বিজয় অবশ্যই তার অন্য চাকরির জন্য চেষ্টা করবে।

বিজয়ের পরিচয়ও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। কয়েকটি কাগজপত্র সে দেখালো, বিজয় সরকার একটি সমবায় ব্যাঙ্কের অফিসার ঠিকই এবং শিগগিরই তার ট্রান্সফার হবে প্রমোশন পেয়ে।

বিজয় একথাও জানাল, অন্নপূর্ণা নতুন চাকরি পেলে বাড়িতে তো টাকা পাঠাবেই, যতদিন না চাকরি হয়, ততদিনও আগের টাকাটা পাঠিয়ে যাবে।

সবই তো আশাতীতভাবে ভালো, শুধু একটাই সমস্যা। বিজয় দু'-তিনদিনের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে চাইছে, রীতিমতন পুরুত ডেকে। গ্রামের মানুষের কাছে সেটাই বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু সেরকম বিয়েতে কিছু খরচ তো আছেই, দু'দশজন মানুষকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেও তো হয়। সে টাকা রাঘবের কাছে নেই, এত তাড়াতাড়ি জোগাড় করবেই বা কী করে?

বিজয় বলল, সে জন্যও চিন্তা নেই, খরচের ভার বিজয়ই নেবে, কারুকে জানাবার দরকার নেই।

এবার পাড়ার মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। আচম্বিতে ভাগ্য খুলে গেছে অন্নপূর্ণার, তার বিয়ে হবে কি না তারই ঠিক ছিল না, পাত্র জুটে গেল রাজপুত্রের মতন, চাকরিও ভালো করে, তার ব্যবহারেও সবাই মুগ্ধ।

এ কাহিনির এরকম একটা সুখের সমাপ্তি হওয়াই উচিত ছিল। জীবনে অনেক সময় এরকম ঘটে, আবার ঘটেও না।

বিয়ের দিনে সারা বাড়িতে সবাই ব্যস্ত, কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনও এসেছে, ভৈরব মণ্ডল নিজের উদ্যোগে মাছ আনার ব্যবস্থা করেছে, পাত্র নিজেও খাটাখাটুনি করেছে। বিপর্যয় ঘটল বিকেলের একটু পরে।

প্রথম সন্ধ্যাতেই লগ্ন, পাত্র-পাত্রী দু'জনেই তৈরি, পুরুতমশাইও এসে

গেছে। আজ হঠাৎ গরম পড়েছে খুব। বিজয় সব সময় পাঞ্জাবির ওপরে একটা জওহর কোট পরে থাকে, কিন্তু ওই পোশাকে তো বিয়ে হয় না। জওহর কোট খুলতে হয়েছে, কিন্তু পাঞ্জাবি খুলে খালি গা হতে সে রাজি হয়নি, তার ওপরে একটা চাদর জড়ানো। গরমে সবাই ঘামছে, বিজয়ের কপালে চন্দনের মতন বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা।

একসময় একটা বাচ্চা ছেলে হি হি করে হেসে উঠে বলল, ওমা, দ্যাখো, দ্যাখো, গোঁফটা দ্যাখো—

অনেকেই দেখলে, বিজয়ের একদিকের গোঁফ অর্ধেকটা খসে পড়েছে। অর্থাৎ সেটা নকল গোঁফ।

একজন অল্পবয়েসি পুরুষ মানুষ নকল গোঁফ লাগিয়ে আসবে কেন? তবে কি এটা ছদ্মবেশ? কিংবা লোকটা মাকুন্দ? দাড়ি-গোঁফ ওঠে না?

বিজয় ব্যস্ত হাতে গোঁফটা মেরামত করতে ব্যস্ত, বেশ কয়েকজন হাসছে। কয়েকজন ফিসফিস করে অন্য কী যেন আলোচনা করছে।

একটু পরে ভৈরব মণ্ডল কাছে এসে এক টানে বিজয়ের গা থেকে চাদরটা খুলে নিল। তার বুকের দু'দিক বেশ উঁচু। পুরুষমানুষের তো ওরকম হয় না।

ভৈরব জিজ্ঞেস করল, ও দুটোও আসল না নকল?

কয়েক মিনিট বিমূঢ় অবস্থায় থাকার পর বিজয় কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, স্বীকার করছি, আমি পুরুষ নই। আমার নাম বিজয়া। আমি অন্নপূর্ণাকে ভালোবাসি।

শেষের কথাটা কেউ শুনল না। মেয়ে? নিশ্চয়ই কোনো শয়তানি মতলব আছে। অফিসের যে-সব কাগজপত্র দেখিয়েছে, সেগুলোও জাল?

বিজয়া বলল, না, না। ইংরেজিতে বিজয় আর বিজয়া বানান তো একই। সে সত্যিই ব্যাঙ্কের অফিসার।

সে আরও বলল, অন্নপূর্ণার মুখে সে গ্রামের অনেক গল্প শুনেছে। সেই জন্যই সে এখানকার পথঘাট ছবির মতন চেনে। সে শুনেছে, একজন স্ত্রীলোক এ গ্রামের এক মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গেছে। সেইজন্যই সে পুরুষ সেজে এসেছে। সে সত্যিই অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই।

বিয়ে? মেয়েতে মেয়েতে বিয়ে হয়? শাস্ত্রে সেরকম কোনো নির্দেশ আছে? সেরকম বিয়ের কোনো মন্ত্র হয়? জোচ্চুরি, জোচ্চুরি! নিশ্চয়ই গভীর কোনো

মতলব আছে।

বিজয়া বলল, দয়া করুন, দয়া করুন। আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি সত্যিই ওকে ভালোবাসি। ওকে জিজ্ঞেস করুন।

অন্নপূর্ণা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে বলল, ওনাকে আমি চিনি, ওঁকে আমি সত্যিই ভালোবাসি, আমরা দু'জনে...

এরকম অবস্থায় ভালোবাসা শব্দটাই অশ্লীল মনে হয়। দারুণ পাপ। শুনলেই গা জ্বলে যায়। লক্ষ্মীমণি ছুটে এসে জোরে জোরে থাপ্পড় মারতে লাগলেন মেয়েকে।

কে একজন চেঁচিয়ে বলল, এইটা কি মেয়ে না হিজড়া?

একবার সে কথাটা উচ্চারিত হতেই সকলেই হৈ হৈ করে উঠল। হতেও পারে।

সেটা জানা যাবে কী করে? ওকে উলঙ্গ করে দেখতে হবে।

গ্রামে ইদানীং মেয়েদের নামে কোনো অপবাদ রটলেই তাকে উলঙ্গ করার জন্য অনেক লোক এগিয়ে আসে। এটা একটা নতুন রকমের মজা।

কয়েকজন লোক এগিয়ে আসতেই বিজয়া দারুণ ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, ছেড়ে দিন, আমায় ছেড়ে দিন।

অন্নপূর্ণাও যাতে না যেতে পারে, সেজন্য কয়েকজন তাকে জোর করে মাটিতে চেপে ধরে আছে।

দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে বিজয়া। পেছনের লোকরা ক্রমশই বাড়ছে। হিংস্র জনতা। এর মধ্যে ধুতিটা খুলে গেছে বিজয়ার। শুধু জাঙ্গিয়া পরা। সে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে সে উঠে পড়েছে ব্রিজের ওপর।

এই অবস্থায় কি মানুষের মনে থাকে যে এই সেতুর মাঝখানে অনেকটা শূন্যতা আছে : শুধু প্রাণ নয়, সে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য ছুটছে।

যারা তাড়া করে আসছিল, তারা একসময় থমকে থেমে গেল। বিজয়াকে আর দেখা গেল না।

বিজয়ার এই অপমৃত্যু কি বৃথা যাবে? বোধহয় না।

এই ঘটনার বিবরণ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। কাগজের রিপোর্টাররা আসবে। অনেক লেখালেখিও হবে। টিভিও আসতে পারে, এই ভাঙা সেতুর ছবি উঠবে চমৎকার।

হয়তো এরপর ওই ব্রিজটা সারাবার ব্যাপারে উদ্যোগও শুরু হতে পারে।

জামরুল গাছটা সাক্ষী ছিল

এক যে ছিল তাঁতির মেয়ে, তার ছিল খুব ভূতের ভয়। বনের ধারে বাড়ি, তাই অন্ধকার হলেই শুরু হয় একটু একটু ত্রাস।

দিনেরবেলা বনজঙ্গল দেখতে কার না ভালো লাগে! কিন্তু রাত্তিরে চেনা অরণ্যও অন্য রকম হয়ে যায়। কত অচেনা শব্দ। গাছের শুকনো পাতায় খড়মড়, আর বাতাসে নানা রকম ফিসফাস।

মেয়েটির নাম বেলি, বেশ চিকন চিকন চেহারা আর ডাগর ডাগর চোখ। বয়েস কত আর হবে, চব্বিশ কিংবা সাতাশ। একে তো পাড়াগাঁ, তাও গরিব ঘরের মেয়ে, তার বয়েসের কে ঠাহর রাখে! এই বয়েসের মেয়ের তো স্বামী-শ্বশুরের ঘরে থাকার কথা, কিন্তু বেলি থাকে তার বাপের সঙ্গে। তার বাপ কষ্টেসৃষ্টে মেয়ের উঠতি বয়েসে বিয়ে দিয়েছিল এক কুমোরবাড়ির স্বাস্থ্যবান ছেলের সঙ্গে। কিন্তু কপালে যদি কারও সুখ না থাকে, তবে তা খণ্ডাবে কে? অমন জলজ্যান্ত ছেলেটি খামোখা সাপের কামড়ে মারা গেল এক বর্ষার রাতে। বেলি তখন কেঁদে ভাসাল, কিন্তু শুধু কান্নায় তো মানুষ বাঁচে না। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কয়েকদিন পরেই বেলিকে পৌঁছে দিয়ে গেল তার বাপের বাড়িতে। রোজগারে স্বামীই যদি বেঁচে না থাকে, তা হলে শুধু শুধু তার বিধবার অন্ন জোগাবে কেন তারা?

বিয়ের আগেই বেলি মা-হারা। সংসারে শুধু বাবা। তার নাম হরিমাধব।

অমন একখানা গালভারী নাম নিয়েও সে জীবনে তেমন সার্থক হতে পারেনি। পুরুষানুক্রমে তারা পেশায় তাঁতি, কিন্তু মিলবস্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একালের তাঁতিদের টিকে থাকা বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। সুতোর যা দাম, তা পড়তায় পোষায় না। হরিমাধব তাই ধুতি-শাড়ির বদলে এখন গামছা-লুঙ্গি বুনে কোনওরকমে পেট চালায়।

খড়ের চালার বাড়ি, পেছনে ছোট উঠোন, তার এক দিকে রান্নাঘর, অন্য পাশে একটা গোয়াল ঘর। আর উলটোদিকে একটা জামরুল গাছের নীচে হরিমাধবের তাঁতঘর। এককালে সেখানে সারাদিনই প্রায় মাকুর ঠক-ঠাকং শব্দ শোনা যেত, এখন তত বায়না তো জোটে না, তাই তাঁতও চলে না। তবু দিনের বেশিরভাগ সময়ই সে তাঁতের সামনে বসে থাকে।

অতি ক্ষুদ্র সংসার, তার কাজকর্ম সব বেলিই দেখে। দু'টি মানুষের অন্ন, ডাল-ভাত-শাকচচ্চড়ি কিংবা ঝিঙে বা ধুঁধুলের ঝোল, তা রাঁধতে আর কতটুকুই বা সময় লাগে। তা ছাড়া ঘর ধোওয়ামোছা আর উঠোন নিকোনো, এই সব কাজের পরেও হাতে সময় থাকে। কাছাকাছি আর কোনো ঘরগেরস্থালি নেই, অন্য যে দু'ঘর তাঁতি ছিল, তারা চলে গেছে শহরে। বেলি কোনো কথা বলারও লোক পায় না। দুপুর-বিকেলে সে দাওয়ায় বসে বই পড়ে। রামায়ণ আর মহাভারত, এ ছাড়া অন্য বই নেই বাড়িতে। বেশ জোরে জোরে আর দুলে দুলে এই বই পড়তেই তার বেশ সুখ হয়। মাঝে মাঝে অদূরের জঙ্গলের দিকে সে তাকায়, গাছের পাতায় হিল্লোল দেখে, কত রকম পাখির ডাক শোনে, নাকে আসে বুনো ফুলের গন্ধ।

এ জঙ্গলে তেমন কোনো হিংস্র প্রাণী নেই, আছে কয়েকটা শেয়াল। এই শেয়ালগুলো জন্মচোর, রাত্তিরবেলা গেরস্থবাড়ির আশেপাশে ঘুর ঘর করে, কিন্তু এই তাঁতিবাড়িতে হাঁস-মুরগি নেই, মাছ-মাংসের এঁটোকাঁটাও থাকে না। এখানে আর শেয়ালেরা কী পাবে? শূন্য গোয়াল ঘরটা রয়ে গেছে, গরু নেই অনেক কাল।

জঙ্গল-জায়গায় সন্ধে হতে না-হতেই ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে। তারপরেই দাওয়া ছেড়ে উঠোনে পা দিতেও ভয় হয় বেলির। মেয়ের ভয় দেখে হাসে হরিমাধব। সে হাসতে হাসতে বলে, ওরে, গরিবের বাড়িতে চোর-ডাকাত আসে না, ভূতও আসে না। বড়লোকের বাড়ির গিন্নি ভূত দেখে মূর্ছা যায়, দিকে দিকে রটে যায় সে খবর, তাতে ভূতের কত সুনাম হয়। তোকে ভয় দেখিয়ে ভূতের লাভ কী? কেউ তো কিছু জানতেই পারবে না।

হরিমাধবের একমাত্র নেশা গাঁজায় দম দেওয়া। বিশ্বসংসারে এর চেয়ে সস্তার নেশা আর হয় না। তবে কোনো স্যাঙাত থাকলেই এ নেশা জমে। গ্রামের অন্য পিঠে শিবমন্দিরে চাতালে একটা গাঁজার আসর বসে, কিন্তু সেখানে হরিমাধব যায় না। মেয়ে ভয় পায় বলে সে বাড়িতে বসেই কলকে সাজে আর মেয়ের সঙ্গে গল্প করে। তারপর কেরোসিন বেশি খরচ করবে না বলে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে লণ্ঠন নিভিয়ে দেয়। বাবা-আর মেয়ে শোয় দুই ঘরে।

তবে সপ্তাহে দু'দিন হরিমাধবকে হাটে যেতেই হয়। মাল পৌঁছে দেয় পাইকারের কাছে। সাধ্যমতন কলাটা-মুলোটা কিনে আনে। দৈবাৎ বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লে জলের দামে ইলিশমাছও পেয়ে যায়।

গাঁজার নেশায় ঘুম আসে তাড়াতাড়ি। পাশের ঘরে হরিমাধবের নাক ডাকে, আর অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে ছটফট করে বেলি। ঘরের দরজায় আগল দেওয়া, সে তো আর সারা রাত বেরুবেই না। তবু সে জানলার পাশে হঠাৎ হঠাৎ ফিসফাস শব্দ শোনে, বেলির গা ছমছম করে, মনের ভুল নয়, গাছের পাতার শব্দ নয়, সে স্পষ্ট শোনে, কারা যেন দুপদাপ করে ছুটছে। এক এক দিন খুব জোরে ম্যাও ম্যাও শব্দ হয়, অথচ জঙ্গলে তো বেড়াল থাকে না, বেড়াল অত জোরে ডাকেও না।

সে তখন মনে মনে রামনাম জপ করে আর মনটাকে অন্য দিকে সরাতে চায়। দিনের পর দিন তার কি এইভাবেই কাটবে? কতদিন? বাবার যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তখন সে কী করবে?

বাবা কোনো একদিন থাকবে না ভাবতেই তার চোখে জল এসে যায়। একটুক্ষণ কাঁদলে মনটা হালকা হয়। নিজেকে বেশ শুদ্ধ শুদ্ধ লাগে। তখন সে দুশ্চিন্তা সরিয়ে অন্য কথা ভাবে। ভালো কথা। আশার কথা। এবার তার প্রথম কাজই হবে, ধারদেনা করে কিংবা যেমন করেই হোক, একটা গরু কেনা। সেই গরুর দুধ খাওয়াবে বাবাকে। যারা গাঁজা খায়, তাদের দুধ খেতে হয়, তাতে শরীরের তাগদ বাড়ে। দুধ খাওয়াতে পারলে বাবা বেঁচে থাকবে অনেক দিন। আর দুধ যদি খুব বেশি হয়, তাহলে তা বেচতেও পারবে, তাতে কিছুটা সুসার হবে সংসারের। তা ছাড়া, বাড়িতে আর একটা প্রাণী থাকাও তো কম কথা নয়। তাতে বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে না। বেলি নিজেই গরু চরাবে, গরুর জাবনা দেবে...

পরদিন বাবাকে কথাটা বলি বলি করেও বলা হল না। লজ্জা লাগে। টাকা পয়সার ব্যাপার তো! একটা গরুর দাম কত হয় কে জানে? কে যেন একদিন বলেছিল, বাড়িতে একটা মেয়ে মারা গেলে তেমন করে কে আর কাঁদে? কিন্তু একটা দুধেলা গাই হঠাৎ মরে গেলে পরিবারসুদ্ধু সবাই কেঁদে ভাসায়।

ওমা, কী আশ্চর্য কথা! দু'-চারদিন পর হরিমাধব নিজেই একদিন অল্প নেশার পর বলল, গোয়ালঘরটা খালি পড়ে আছে, ভাবি, যদি একখান গরু কেনা যায়, পাইকাররা যদি কিছু আগাম দেয়, পুরো টাকা না কুলালেও যদি ধীরে ধীরে শোধ করতে পারি...

বেলি আনন্দে প্রায় নেচে উঠল। তারপর থেকে রোজ ওই কথা হয়। হরিমাধবও হাটে গেলে গরুর খোঁজখবর করে। গরু কিনতে চাইলেই তো আর হুট করে কেনা যায় না। পছন্দ হওয়া চাই, দরদামে বনা চাই। তবে আশা আছে, এক পাইকার বলেছে কিছু টাকা দেবে।

প্রত্যেক হাটবারে উন্মুখ হয়ে থাকে বেলি।

এক হাটবারে হরিমাধবের যখন ফেরার কথা, তখনও সে ফিরল না। এদিকে আবার টিপির-টিপির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাবার জন্য যেমন দুশ্চিন্তা হয় বেলির, আবার তেমনই একটা আশার ঝিলিকও দেয়। আজই কি গরু নিয়ে ফিরবে তার বাপ?

দাওয়ায় ঠায় বসে আছে বেলি, চক্ষু দু'টি এমনই খর যেন আঁধারেও দেখতে পায়। হঠাৎ বনের মধ্যে কীসের শব্দ হল না? বুকটা তার ছ্যাঁত করে উঠল। ও আবার কীসের আওয়াজ, কারা যেন জঙ্গলে দাপাদাপি করছে। এদিকে আর মানুষজন নেই, ভূত ছাড়া আর কী হবে? বেলি বেশ জোরে জোরে রাম রাম বলতে লাগল।

একটুক্ষণ পরেই ঝোপঝাড় ঠেলে হুড়মুড় করে কী যেন ঢুকে পড়ল এ-বাড়ির উঠোনে। আজ একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার নয়, অল্প অল্প জ্যোৎস্না আছে, বেলি ডুকরে উঠল, ও মাগো, বাবাগো, বাঁচাও! ও রামরাজা, ও সীতা মা, ও লক্ষ্মণ, বাঁচাও বাঁচাও আমারে।

তখন কে যেন মানুষের গলায় বলল, অ্যাই, চোপ!

এবার বেলি দেখল, কোনো জানোয়ার নয়, ভূতপ্রেত নয়, একজন মানুষ। রীতিমতন ভদ্দরলোকদের মতন পোশাক, ধুতি আর কুর্তা পরা, পায়ে বোধহয় জুতোও রয়েছে।

ওমা, মানুষ! কোনো মানুষ তো এদিকে আসে না। কোনো পথিক পথ হারিয়ে এসে পড়েছে? মানুষ হলে তো আর ভয় পাবার কিছু নেই। ভূত হলে ঘাড় মটকে দিতে পারে, বাঘ-ভাল্লুক হলে কামড়ে দিতে পারে, মানুষ তো আর তা দেবে না।

ভয় ঝেড়ে ফেলে বেলি জিজ্ঞেস করল, তুমি কে গো?

সেই লোকটি জড়িত গলায় উত্তর দিল, আমি একটা রাক্ষস! তোকে খেতে এসেছি। হে-হে-হে-হে...

বেলি বলল, মোটেই রাক্কোস না। স্পষ্ট দেখছি, আমি অত সহজে ভয় পাই না, হি-হি-হি-হি...

লোকটি টলমলিয়ে এগোতে এগোতে বলল, পাকা আমটি হয়ে ঝুলছিস, তোকে আজ আর ছাড়ছি না।

বেলি বলল, এই রাতের বেলা জঙ্গলে কী করছিলে? ওখানে কত রকম ভয় আছে, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছ তুমি?

লোকটি বলল মোটেই রাস্তা হারাইনি। আমি আজ তোকে...

এগোতে এগোতে লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

বেলি এগিয়ে এসে বলল, ওমা, তোমার শরিল খারাপ বুঝি? এসো, এসো, এই দাওয়ায় বসো। লাগেনি তো? জল এনে দিচ্ছি।

লোকটি আবার উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে বেলির ওপর।

বেলি বলল, ওকি, একি, তুমি দাঁড়াতে পারছ না! এই যে আমি হাত ধরছি, তোমার কোনো ভয় নেই। একটুখানি বসো। আমার বাপ এসে পড়বে, তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবে।

লোকটি বলল, আমায় পথ দেখাবে? কোন্ শালা! তোর বাপ আর আসবে না। আজ আমি...

এবারে সে সত্যি সত্যি বেলির ঘাড়ের কাছটায় কামড়ে দিতে গেল।

বেলি তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, এ আবার কেমনতর ব্যাভার। বলছি, চুপ করে বসো সব ঠিক হয়ে যাবে।

লোকটি গলা তুলে বলল, চোপ মাগী।

নেশায় লোকটি প্রায় অন্ধ। কাণ্ডজ্ঞান একেবারে উধাও! সে আজ এই অসহায় মেয়েটিকে খাবেই ঠিক করেছে। সবলে বেলিকে আঁকড়ে ধরে খিমচে, কামড়ে দিতে লাগল।

এবার বেলি বুঝল তার বিপদের কথা। পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেয়েরা তো গায়ের জোরে পারে না, কিন্তু অতিরিক্ত নেশার জন্য এই লোকটির বাহু এখন অনেকটা শিথিল। বেলি তাকে ঠেলে সরিয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করল।

পারল না। টলতে টলতে এসে লোকটি খপ করে ধরে ফেলল তার চুলের মুঠি। টানতে টানতে বেলিকে নিয়ে এল উঠোনে।

বাড়িতে তো আর শায়া-বেলাউজ পরে না বেলি, শুধু ফেরতা দিয়ে শাড়ি পরা, তা খুলে ফেলার জন্য লোকটির কী টানাটানি। এক এক সময় সে যেন অসুর হয়ে ওঠে, আবার একটু পরেই রবারের তৈরি মানুষের মতন।

বেলি গড়াগড়ি দিতে দিতে আবার পালাল। সেই অবস্থাতেও সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগল, ওগো দয়া কর, ওগো, আমি তো তোমার কাছে কোনো দোষ করিনি! আমার সঙ্গে কথা বলো, আমাকে মেরো না...

উঠোনের মধ্যে একবার ধরা আর একবার ছাড়ার খেলা চলতে লাগল। যদিও মোটেই খেলা নয়। জামরুল গাছটা পর্যন্ত ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে এ দৃশ্য দেখছে।

বেলি একবার উঠে গেল রান্নাঘরের দাওয়ায়। লোকটিও গেল তার পিছু পিছু। এবার যেন তার শরীরে সত্যিই বাঘের মতন শক্তি ফিরে এসেছে। আবার মাটিতে পেড়ে ফেলল বেলিকে, দাঁত বসাল তার বুকে।

ছটফট করতে করতে আত্মরক্ষা করতে চাইল বেলি। কিন্তু এখন আর সে জোরে পারছে না। পাগলের মতন মাটিতে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে একবার তার হাতে কী যেন একটা ঠেকল। কিছু চিন্তা না করে সে সেই জিনিসটা তুলে নিয়ে মারল লোকটাকে।

সেটা একটা কুটনো কোটার বঁটি। খুব ধার। মোক্ষম কোপটা লাগল লোকটির ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে গেল মাথাটা। বলি দেওয়া পাঁঠার মতন কয়েক মুহূর্ত ছটফট করে নিস্পন্দ হয়ে গেল লোকটা।

বেলি প্রথমটার কিছু বোঝেনি। লোকটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে একটু দূরে হাঁটু মুড়ে বসে ফোঁপাতে লাগল। একটু পরে তার খেয়াল হল, লোকটা আর নড়েচড়ে না, ধেয়েও আসে না কেন? চতুর্দিক একেবারে রক্তারক্তি। একটু একটু করে আবার কাছে এসে লোকটির নাকের কাছে আঙুল নিয়ে দেখল, নিশ্বাস নেই।

মরে গেছে! সত্যিই? সর্বনাশ! বেলি জানে, মানুষ খুন করা মস্ত অপরাধ। আর সবাই জানে, যেখানে যাই-ই ঘটুক, লোকে মেয়েমানুষের নামে সব দোষ দেয়। থানা-পুলিশ এসে বেলিকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ফাঁসি হবে। তারপর তার বাবা কী করে বাঁচবে একলা একলা?

বেলি লোকটা পা ধরে টানতে টানতে দাওয়া থেকে নামাল উঠোনে, তারপর ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। কত দূর যাচ্ছে বেলি জানে না, জঙ্গলে তার এখন ভয়ও করছে না। এক জায়গায় একটা বড় পুকুর দেখে তার মধ্যে লোকটাকে ফেলে দেবে ঠিক করল।

তখনই সে শুনতে পেল একটা কুকুরের ডাক। খুব কাছেই।

জঙ্গলের মধ্যে কুকুর এল কী করে? বেলি শুনেছে, গ্রামের কুকুর কখনও কখনও শিয়াল তাড়া করে ঢুকে পড়ে বনের মধ্যে। শিয়াল-কুকুরে ঝগড়া হয় চিরকাল।

কুকুরটার রং কালো আর বেশ বড়। সে কয়েকবার ঘুরল বেলি আর মৃতদেহটার চারপাশে। কুকুররা জ্যান্ত আর মরা মানুষের তফাত ঠিক বুঝতে পারে। সে বেলিকে কিছু বলল না, ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিল মৃতদেহটাকে।

এবারে বেলি আর দাঁড়াল না। দেহটা ছেড়ে দিয়ে সে প্রাণপণে দৌড়ল উলটো দিকে।

বাড়িতে এসে দেখল, বাবা এখনও ফেরেনি হাট থেকে। বৃষ্টির তেজ আরও বেড়েছে। রান্না ঘরের মাটির দাওয়ায়-রক্তের দাগ যা ছিল, বৃষ্টির ছাঁটে তা ধুয়ে যাচ্ছে, বেলি মুছেও দিল ভালো করে।

তারপর একটু সুস্থ হয়ে বসতে গিয়ে দেখল, সে কিছুতেই সুস্থ হতে পারছে না। তারা সারা শরীর কাঁপছে, কেঁপেই চলেছে। গলা দিয়েও একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে গোঙানির মতন।

খানিকবাদে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

হরিমাধব ফিরল ভোররাতে। সঙ্গে একটা গরু। হাটের ওদিকটায় বৃষ্টি অনেক প্রবল ছিল, ঘন ঘন বাজ পড়ছিল, তাই এর মধ্যে গরুটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসতে সে ভরসা পায়নি। হাটেই থেকে গিয়েছিল।

বাপের হাঁকডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বেলি। গরুটাকে দেখে এমন একটা আনন্দ ছলাৎ করে উঠল যে, থেমে গেল তার শরীরের কাঁপুনি। ভুলে গেল গত রাতের কথা।

কিন্তু অমন একটা ঘটনা কি সত্যি ভোলা যায়? মানুষ খুন বলে কথা! গরুট্যাকে নিয়ে কিছুক্ষণ আদিখ্যেতা করার পর আবার সেই চিন্তা ফিরে এল। বাবাকে সে বলবে, না বলবে না? বলা উচিতই তো? না বললেও চলে? সে কিছু বলল না।

গরুটা আসার পর এ-সংসারের ছিরিই বদলে গেল। সারাদিন কত কাজ। সেই সব কাজের মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে বেলির মনে পড়ে, যে-কোনো সময় থানা-পুলিশ আসবে, তাকে ধরে নিয়ে যাবে।

সে আর জঙ্গলের দিকে একবারও তাকায় না।

কয়েকদিন পর, বেলি গরুটার দুধ দুইছে, হঠাৎ শুনতে পেল একটা কুকুরের ডাক। একটা অশুভ লক্ষণে বুক কেঁপে উঠল বেলির। গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এল, দেখল, উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো কুকুরটা। হ্যাঁ, সেটাই তো, কোনো ভুল নেই।

ও কেন এসেছে? বিশ্ব সংসারে একমাত্র ওই কুকুরটা শুধু জানে। কুকুর কথা বলতে পারে না। কিন্তু অন্য কোনোভাবে কি ধরিয়ে দিতে পারে?

কুকুরটা এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। একটা চ্যালা কাঠ এনে ওকে তাড়াবে বেলি? তার সে সাহসও হল না। কুকুরটা দাঁড়িয়েই আছে, রান্নাঘর থেকে খানিকটা পান্ত ভাত একটা ভাঙা শানকিতে এনে কুকুরটার কাছে রাখল সে। কুকুরটা অমনিই আগ্রহের সঙ্গে চকাস চকাস করে চেটেপুটে খেয়ে ফেলল সবটা।

এর পর কেটে গেল একটা মাস। থানা-পুলিশ আর এল না, কুকুরটা ছাড়া আর কেউ জানল না সে কথা। কুকুরটা থেকে গেছে এ-বাড়িতেই। সারাক্ষণ সে বেলির পায়ে পায়ে ঘোরে। যা দেওয়া হয় তাই খায়। রাত্তিরে কুকুরটা উঠোনে শুয়ে থাকে বলে বেলির আর ভয় করে না। এমনকী, একদিন একটা সাপ এসে পড়েছিল বেলির পায়ের কাছে, আর একটু হলেই সাপটার গায়ে পা পড়ত, আর নির্ঘাত সাপটা কামড়ে দিত। সাক্ষাৎ গোক্ষুর, মারাত্মক বিষ। কুকুরটা প্রায় শেষ মুহূর্তে ডেকে উঠে বেলিকে সাবধান করে দিল, তারপর সেই-ই ডাকতে ডাকতে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিল সাপটাকে।

সেই সাঙ্ঘাতিক রাত্তিরের স্মৃতি খানিকটা ফিকে হয়ে এলেও তা কি পুরোপুরি মুছে যাওয়া সম্ভব? এক এক সময় বড় বেশি মনে পড়ে যায়।

আজও বাবা গেছে হাটে। গরুটার ঘরে মশা তাড়াবার জন্য ধুনো দিতে

গেল বেলি। ওর গলায় একটু হাত বুলিয়ে আদর করলে খুব খুশিতে মাথা নাড়ে। যেমন কুকুরটার ঘাড় একটু চুলকে দিলেই ল্যাজ নাড়ে আনন্দে।

সন্ধে নামার একটু দেরি আছে। দাওয়ায় বসে বহুবার পড়া মহাভারতখানা চোখের সামনে খুলে ধরেছে বেলি। ঠিক পায়ের কাছে শুয়ে আছে কুকুরটা। ভারি একটা শান্ত সুখের আমেজ বোধ করছে বেলি। যেন পৃথিবীতে কোথাও কোনো অশান্তি নেই। স্নিগ্ধ বাতাস বইছে, কলকল শব্দে বাসায় ফিরছে পাখিরা।

তবু এক সময় তার দু'চোখে দিয়ে গড়াতে লাগল জলের ধারা। আর কেউ না জানুক, সে তো একজন জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করেছে, তা ঠিক। সে যে কত বড় পাপ!

এই কুকুরটা তাকে কত ভালোবাসে। গরুটাও তাকে দেখলে কত খুশি হয়। আর সেই মানুষটা যদি তার সঙ্গে দুটো-একটা ভালো কথা বলত, যদি তার পাশে বসে গল্প করত, তা হলে কি আর বেলি অমনি ভাবে...

গান বন্ধ হলেই অন্ধকার

সূর্য বিদায়ের পরেই চাঁদ উঠে গেল, এ রকম খুব কম দিনই হয়। আকাশের মেঘের লাল রং মুছে যেতে না যেতেই ধপধপ করছে জ্যোৎস্না। শহরের মানুষের তো এমন জ্যোৎস্না দেখার সৌভাগ্যও হয় না। চাঁদ এই সব অঞ্চলে বেশি বেশি দরাজ। এক সময় এখানে পূর্ণিমার রাতে রাস্তার আলো জ্বলত না, জ্যোৎস্নাতেও দিব্যি চলাফেরা করা যেত।

পরপর দুটো ছাতিম গাছ। কয়েকটা সোনাঝুরি আর একটা ইউক্যালিপটাস যেন মাধ্যাকর্ষণকে অস্বীকার করে লম্বা হতে হতে প্রায় আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে। এখানে একটা সিমেন্টের বাঁধানো গোল টেবিল, সেটি ঘিরে গোটা কতক চেয়ার, বিকেলবেলা থেকে এখানেই চায়ের আড্ডা বসে। তিন রমণী ও চার জন পুরুষ, এক জন হঠাৎ একটা গান গেয়ে উঠতেই অন্যদের কথা থেমে গেল।

আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে। যদিও এটা বাগান, তবু অনায়াসে এখন বন বলে কল্পনা করে নেওয়া যায়। কাছাকাছি অন্য বাড়ি নেই। একটু দূরের বাড়িগুলোও জনশূন্য। এ-দিককার কোনো বাড়িতেই স্থায়ী বাসিন্দা নেই, মাঝে মাঝে শহর থেকে আসে। মাসের পর মাস জানলা-দরজা খোলা হয় না, আলো জ্বলে না। চার দিকে তাকালে শুধু গাছপালাই চোখে পড়ে।

জীবন যাপনের সব কিছু নিয়েই গান লিখেছেন কবি, তবু চাঁদের প্রতি

যেন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল তাঁর। জ্যোৎস্নার গান অনেক। সব কবিই বুঝি চন্দ্রাহত হয়, অর্থাৎ পাগল।

আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে, কী জানি সে আসবে কবে, কী জানি সে আসবে কবে... তার পর কী যেন?

মৌসুমির বেশ তৈরি, সুরেলা গলা, কিন্তু সে গানের বাণী মনে রাখতে পারে না। আবার গাইতে পারে না এমন অনেকেরই এ সব গান মুখস্ত থাকে। দু'তিন জন একসঙ্গে বলে উঠলেন এই নিরালায়, এই নিরালায়...

সে গানটি শেষ হওয়ার পর একটা প্রতিযোগিতা শুরু হল। কে ক'টা চাঁদ কিংবা জ্যোৎস্না বিষয়ে গান জানে। চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে...পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে...ও চাঁদ, চোখের জলে লাগল জোয়ার...

এর মধ্যে শংকর গেয়ে উঠল, চাঁদ চাঁদ চাঁদ, হিঞ্চে বনের শশী, এই এক চাঁদ, ওই এক চাঁদ চাঁদে মেশামেশি।

কয়েকজন বলে উঠল, এই, এই, এটা তো রবীন্দ্রসংগীত নয়!

শংকর পাকা সিগারেট খেয়ে।

কথাবার্তায় কিছুটা রুক্ষ, সে গান থামিয়ে বলল, চাঁদ সম্পর্কে গানে শুধু রবীন্দ্রসংগীতই গাইতে হবে, এমন কোনো শর্ত আছে নাকি?

শ্রীলেখা নামের মেয়েটির স্বভাব খুব নরম। তার গৌরবর্ণ তনুটি দেখলে মনে হয় বেশিক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়ালে গলে যাবে, কথা বলে আধো আধো ভাবে, টমাটোকে বলে তোমাতো আর বৃষ্টিকে বলে বৃশ্‌তি। সে বলল, রবীন্দ্রসংগীতের মাঝখানে অন্য গান শুনলে আমার না, আমার কেমন যেন লাগে।

শংকর বলল, খারাপ লাগে?

শ্রীলেখা বলল, ঠিক জানি না, হ্যাঁ, খারাপই লাগে বোধ হয়!

শংকর বলল, ঠিক আছে, আমি আর গাইব না!

এক জায়গায় তিনটি রমণী থাকলে তারা কদাচিৎ একমত হয়।

অপর তরুণীটি, যে বোধ হয় জীবনেই কখনও শাড়ি পরেনি, শালোয়ার-কামিজও না, সব সময় জিন্‌স আর টপ পরিধানেই যাকে দেখা যায়, পিংকি যার নাম, সে বলল, আমার কিন্তু ফোক সং বেশ ভালো লাগে, সেই একটা বাউল সং আছে না, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে

করব কী, শংকর, তুমি সেটা জানো?

শংকর বলল, জানতাম, ভুলে গেছি।

পিংকি বলল, যেটুকু মনে আছে, ফার্স্ট টু থ্রি লাইনস, শোনাও প্লিজ।

শংকর বলল, একটুও মনে নেই।

পিংকি বলল, ইউ মাস্ট বি কিডিং।

শ্রীলেখা বলল, এই, তোমরা কেউ এই গানটা জানো? আজ গন্ধবিধুর সমীরণে, কার সন্ধানে—

মৌসুমি জিজ্ঞেস করল, এটা কি চাঁদের গান নাকি?

শ্রীলেখা বলল, জোছনার গান। শেষের দিকে আছে না, আজি আম্রমুকুল সৌগন্ধে, নব পল্লব মর্মর ছন্দে, চন্দ্রকিরণ সুধাসিঞ্চিত অম্বরে...

শংকর বলল, বাঃ। শক্ত শক্ত কথাও তো বেশ উচ্চারণ করতে পারো।

শ্রীলেখা বলল, কেন, আমার উচ্চারণ খারাপ? অনেকেই সৌগন্ধে-কে সুগন্ধে বলে।

শিলাজিৎ গৃহস্বামী। সে অধিকাংশ আলোচনাতেই শুধু শ্রোতার ভূমিকা নেয়, তবে বন্ধুবান্ধবীদের মধ্যে কখনও সূক্ষ্ম খোঁচাখুঁচির সম্ভাবনা দেখলেই সে প্রসঙ্গ বদলায়।

শংকর কিছু বলতে যাচ্ছিল, শিলাজিৎ হাত তুলে বলল, এই শোনো, শোনো, চাঁদের আলো খুব ভালো। জোছনা নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতও ভালো, কিন্তু এখন এই জায়গাটায় বড্ড মশা, তোমাদের কামড়াচ্ছে না?

কেউ এক জন চটাস করে নিজের গালে একটা চাঁটি মারল।

যার নাম অরুণোদয়, যে একেবারেই গান জানে না, সন্ধে হলেই ঘুম নয়, অন্য কারণে যার হাই ওঠে, সে বলল, হ্যাঁ বড্ড মশা ভনভন করছে, চলো, ভেতরে যাই।

শ্রীলেখা ছাড়া সবাই উঠে দাঁড়াল।

মৌসুমি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কী রে, ভেতরে যাবি না? তোকে বুঝি মশা কামড়ায় না?

শ্রীলেখা টেবিলটার ওপর কনুই এলিয়ে দিয়ে বলল, আমি আর একটু বসি। মশা তো কামড়াবেই। না হলে ওরা খাবে কী, ওরা বাঁচবে কী করে?

কয়েক জন হেসে উঠল।

শংকর বলল, হ্যাঁ, মশারা বেঁচে থাকার জন্য রক্ত খাবে, তার বদলে

ম্যালেরিয়া আর হেপাটাইটিসের বিষ ঢেলে দেবে।

মৌসুমি বলল, অ্যাই, এখানে ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া কিছু নেই।

শিলাজিৎ শ্রীলেখাকে বলল, একা বসে থাকতে চাও থাকো। তবে খেয়াল রেখো, মাঝে মাঝে ওপর থেকে টপ টপ করে মাকড়সা খসে পড়ে।

শ্রীলেখা সঙ্গে সঙ্গে উঠে তড়িৎগতিতে ছুটে সকলের আগে পৌঁছে গেল বাড়ির সামনের ঢাকা বারান্দায়।

বারান্দার বদলে এটাকে ড্রয়িং রুমও বলা যেতে পারে, সেই ভাবেই সাজানো একটা লম্বা ঘরের মতন, শুধু তিন দিকের দেওয়াল নেই। এক দিকে, কাছেই বাঁশবাগান। হ্যাঁ, সত্যিই একগুচ্ছ বাঁশ গাছ, আর সেই বিখ্যাত কবিতার মতন, সেই বাঁশবাগানের মাথার ওপরেই দুলছে চাঁদ।

সেখানে এসে বসতে না বসতেই অরুণোদয় বলল, তা হলে কয়েকটা গেলাস-টেলাস...

মৌসুমি বলল, আসছে রে বাবা আসছে।

সে কাজের লোকেরা নাম ধরে ডাকল। নাম বীরু। আপাতত তার স্ত্রী-পুত্র দেশের বাড়িতে গেছে, সে একাই সব দিক সামলায়।

মৌসুমি ও শিলাজিৎ দু'জনেই অ্যালকোহল বর্জিত, কিন্তু অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য সব ব্যবস্থা রাখে। আজকাল যে সব বাড়িতে সুরাপানের ব্যবস্থা থাকে না, সেই সব বাড়ির সান্ধ্য আমন্ত্রণে অনেকে যেতেই চায় না।

দু'তিন চুমুকের পর পিংকি বলল, আলোগুলো নিভিয়ে দাও।

শংকর বলল, কেন?

শ্রীলেখাও বলল, হ্যাঁ, আলোগুলো বড্ড চোখে লাগে। কোনো দরকার নেই।

শিলাজিৎ সঙ্গে সঙ্গে দুটো সুইচ অফ করে দিল।

শংকর তার পাশে বসা সুজয়কে বলল, সব মেয়েই অন্ধকার ভালোবাসে, তাই না।

সুজয় বলল, ইয়া। স্ট্রেঞ্জ, ইজ নট ইট? আমরা বাড়ি থেকে বেরোবার সময় চট করে শার্ট-প্যান্ট গলিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি। আর মেয়েরা কতক্ষণ-ধরে সাজগোজ করে। তার পর পার্টিতে এসে অন্ধকারে বসতে চায়। কেউ যদি না-ই দেখতে পেল, তা হলে অত সাজগোজের মানে কী?

শংকর বলল, মুখ না দেখতে পেলে কথাবার্তা ঠিক জমে না।

শ্রীলেখা বলল, কথা না, গান জমে। আলো না থাকলে গান বেশি ভালো লাগে!

সুজয় বলল, আহা হয়, তোমরা ক'জন খাতা না দেখে গান গাইতে পারো? দু'তিন লাইনের পরেই তো ল্যাল লা ল্যা ল্যাল আ। এই তো মৌসুমি।

অরুণোদয় এর মধ্যে গেলাস শেষ করে ফেলেছে। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বোতল থেকে নিজের গেলাসে ঢালতে গিয়ে অনেকটা ফেলে দিল বাইরে।

সে বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, কী অন্ধকারে ভূতের মতন বসে থাকো। আমি ঢালব কী করে? শিলাজিৎ একটা আলো অন্তত...

শিলাজিৎ সঙ্গে সঙ্গে একটা সুইচ টিপে দিল।

অরুণোদয় বলল, ড্রিংকিং একটা এনজয়মেন্টের ব্যাপার। সেটা আলোতেই...

শংকর বলল, অন্ধকারেও এনজয়মেন্ট হয়। সেটা অন্য রকম।

মৌসুমি তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলল, অ্যাই, অ্যাই, ও-সব কী কথা!

শংকর আবার বলল, ডার্ক ডিডস আর বেটার ডান ইন দা ডার্ক।

পিংকি বলল, তার মানে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডার্ক ডিডস? সে তো চুরি-ডাকাতি। তুমি যে অন্য এনজয়মেন্টের কথা বললে, আমার সেটা আলো জ্বেলেও বেশ ভালো লাগে। বেশি ভালো লাগে দিনের বেলা।

শ্রীলেখার এ সব কথা পছন্দ হচ্ছে না। সে বলল, পুরোপুরি অন্ধকার কোথায়, বাইরেই তো চাঁদের আলো!

কিন্তু চাঁদের আলো তো আর নেই। না নেই।

কোথা থেকে একটা গভীর কালো মেঘ এসে পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছে চাঁদ। সেই মেঘ ফুঁড়ে একটুও জ্যোৎস্না বেরুতে পারছে না। কত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল আকাশ!

মৌসুমি বলল, আমি বাবা তেমন সাজগোজ করিনি। কারুকে কিছু দেখাতেও চাই না। তবে আমার আলো ভালোই লাগে।

শিলাজিৎ এ বার জ্বেলে দিল দুটো আলোই।

আর সবই ব্যবস্থা আছে। বাদাম-চানাচুর-ফিশ চপ, শুধু সোডা নেই। সুজয়ের সোডা ছাড়া চলে না। তার অনুরোধে বীরুকে সাইকেলে পাঠানো হল। শ্যামবাটির মোড় ছাড়া সোডা পাওয়া যায় না, কিছুটা দূর আছে।

মৌসুমি বলল, গীতবিতানটা নিয়ে আসব?

পিংকি বলল, না, শংকর একটা বাউল গান ধরুক।

শ্রীলেখা হাতের গেলাসটা নিয়েই উঠে গেল বাইরের দিকে।

শংকর বলল, আমার গানের মুড নেই। তুমি কী বললে, দিনের বেলাই তোমার...

মৌসুমি বলল, অ্যাই, অ্যাই, ও-সব কথা না...

হঠাৎ দুটো আলোই নিভে গেল একসঙ্গে।

এটা শিলাজিতের খেলা ভেবে অনেকে ফিরে তাকাল। না। শিলাজিৎ সুইচের পাশে নেই। লোডশেডিং।

শ্রীলেখা বলল, বেশ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল মেঘের গর্জন।

শংকর জিজ্ঞেস করল, জেনারেটর নেই?

শিলাজিৎ বলল, ইনভার্টার আছে। বীরু চালিয়ে দেবে। ও, বীরু তো বাইরে গেল, আমি দেখছি।

শিলাজিৎ ভেতরে গিয়ে একটু খুটখাট করার পর চালু হল ইনভার্টার। আলো দুটো জ্বলল, কিন্তু পাখা ঘুরল না।

পিংকি বলল, দুটো আলোর কী দরকার। পাখা চালাও। পাখা না চালালে আবার মশা কামড়াবে।

অরুণোদয় বলল, হ্যাঁ, পাখা চাই।

শিলাজিৎ আবার খুটখাট করতে গেল। কিন্তু ইনভার্টার অবাধ্যপনা করতে লাগল। আলো জ্বলবে, পাখা ঘুরবে না। অন্য দিন দুটো পাখাও চলে।

শিলাজিৎ অঙ্কবিদ, এস্রাজ বাজায় আবার যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটির দিকেও ঝোঁক আছে। একটুক্ষণ সে ইনভার্টার নিয়ে নাড়াচাড়ার পর চিড়িক করে একটা শব্দ হল। তারপর আলো দুটোও গেল।

এ কী ব্যাপার! শিলাজিৎ?

শিলাজিৎ বলল, টর্চ লাগবে। মৌসুমি আমাদের টর্চটা...

অন্ধকারেই বেশ সাবলীলভাবে ভেতরে চলে গেল মৌসুমি। ফিরে এল জ্বলন্ত টর্চ নিয়ে।

শিলাজিৎ সেটা হাতে নিতেই সেটা নিস্তেজ হবে নিভে গেল। ব্যাটারির শক্তি ফুরিয়ে গেল? এই মাত্র?

মোম, মোম আছে?

একতলার অতিথি-ঘরের বাথরুমে একটা মোম ছিল। সেটা মনে পড়ল মৌসুমির। একটা মোম অন্তত না থাকলে শিলাজিৎ ইনভার্টারের কী গণ্ডগোল তা দেখতে পারছে না।

মোম এল, দেশলাই? রান্নাঘরের মৌসুমি যত দূর সম্ভব খুঁজেও দেশলাই পেলে না। রীরু কোথায় রেখেছে কে জানে।

এই দলে দু'জন ধূমপায়ীই দেশলাইয়ের বদলে লাইটার ব্যবহার করে। সুজয় তার লাইটার আজই বিকেলে সুবর্ণরেখার বইয়ের দোকানে ফেলে এসেছে। সে শংকরের লাইটার চেয়ে চেয়ে ব্যবহার করছিল।

শংকর তার লাইটার নিয়ে এল শিলাজিতের কাছে। পাঁচ বার ক্লিক করেও জ্বলল না মোম। ষষ্ঠ বার আর শিখাই হল না। পাথরটা আটকে গেছে, ঘুরছে না। অনেক চেষ্টা হল। হাত বদল করে করে অন্যরাও চেষ্টা করে দেখল। কিছুতেই সে লাইটারে আর কিছু হতে চাইল না। গ্যাস শেষ! স্টোনটা ক্ষয়ে গেছে!

মোট কথা সে লাইটার এখন অকেজো। ইনভার্টার অনড়। মোমবাতিরও শিখা নেই। চাঁদ ঢেকে গেছে আরও এক প্রস্থ মেঘে। অন্য কোনো বাড়িতে এখন লোকবসতি নেই। আলোও নেই। পুরোপুরি অন্ধকার। বাঁশবাগান অদৃশ্য।

সবাই হতবাক।

এরই মধ্যে ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি। শুধু শব্দ, দেখা যাচ্ছে না কিছু। কে যেন আপন মনে হেসে উঠল।

অলৌকিক কিছু না। সাত লক্ষ বছর আগে মানুষ তো সন্ধের পর এই ভাবেই বসে থাকত। তখনও কেউ আচমকা হেসে উঠত এই ভাবে। প্রমিথিউসের আগমনেরও আগে।